সিদ্ধজীবনী

(ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার
জীবন বৃত্তান্ত ও তদীয় ব্রহ্মবিদ্যার পরিচিতি)

শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ ভারতী
প্রণীত

শ্রীদিগিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী
২৪বি যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ
কলিকাতা - ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

সোদরপ্রতিম সুধীজন পরিচিত

শ্রীমান মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী বি.এ.

পরম কল্যাণবরেষু,

ভাই মথুর, এই দ্বিতীয় সংস্করণ সিদ্ধজীবনী যে পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিল, ইহা সম্পূর্ণ তোমারই উদ্যোগের ফল। কারণ তুমি আমার নিকট বিশেষভাবে প্রশ্ন না করিলে আমা হইতে শাস্ত্রীয় গূঢ় ভাবসকল বিশদভাবে প্রকাশিত হইত না। এজন্য অন্তরের আশীর্ব্বাদসহ পুস্তকখানি তোমাকেই উৎসর্গ করিলাম।

আশীর্ব্বাদক—

ব্রহ্মানন্দ

তৃতীয় সংস্করণ

"সিদ্ধজীবনী"র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার সময় শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয় ইহজগতে নাই। তাঁহার ১৩৩৩ সনের ৬ই আষাঢ় সোমবার তারিখে সজ্ঞানে কাশী-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। দেহ ত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করে নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার উপর দিয়া গিয়াছেন। আমি সামান্য ভাবে কিছু পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও ভূল সংশোধন করিয়া এই সংস্করণ বাহির করিলাম। এই অমূল্য গ্রন্থ পাইবার জন্য অনেক ভক্ত পিপাসু আমাদিগকে সর্ব্বদা জানাইয়াছেন। কিন্তু "সিদ্ধজীবনী" মুদ্রিত ছিল না বলিয়া তাহাদিগকে এই গ্রন্থ পাঠাইতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছি। এখন এই গ্রন্থ পাইতে কোন অসুবিধা হইবে না।

"শক্তি ঔষধালয়ের" সকল ব্রাঞ্চেই এই গ্রন্থ রাখা হইল। এই অমূল্যরত্ন পাইতে কাহাকেও বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। কারণ ভারতের অনেক স্থলেই শক্তি ঔষধালয়ের ব্রাঞ্চ প্রতিষ্ঠিত আছে; একটু চেষ্টা করিলেই সর্ব্বত্র সকলে অনায়াসে পাইতে পারিবেন। অলমতি বিস্তরেন।

ইতি—

মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী বি.এ.

ঢাকা লোকনাথ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
হইতে প্রকাশিত
১৩৪৬ সন

'সিদ্ধজীবনী' আজ প্রায় ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানি বহুদিন হইল পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন ছিল। কারণ অনেকেই অনেক সময় আমার নিকট এই অমূল্য গ্রন্থ পাইবার জন্য আসেন এবং না পাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া যান। পিতৃদেব ও ভারতী মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে আমি অমূল্যরত্ন সিদ্ধজীবনী পুনঃ প্রকাশ করিলাম। এই গ্রন্থ যাহাতে সবাই সব ভাল পুস্তকের দোকানে পেতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করিব।

ইতি—
শ্রীদিগিন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

সূচীপত্র

(বারদীর) শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

ওঁ শ্রীশ্রীলোকনাথ জয়তি

"ত্বয়া হৃষিকেষ হৃদিস্থিতে যথা নিযুক্তঽস্মি তথা করোমি"

শ্রীমদব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয়ের "সিদ্ধজীবনী" একটি সিদ্ধ মহাপুরুষের শ্রীমুখ নির্গত ব্যবহারিক ও পারমার্থিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী নামে এই মহাপুরুষ পরিচিত। ঢাকা জেলাস্থিত বারদীগ্রামে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর জীবিত থাকিয়া তাহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতী মহাশয় শ্রীশ্রীলোকনাথের পূর্ব্বজন্মের গুরু ছিলেন এবং তাঁর তখনকার নাম ছিল ভগবান গাঙ্গুলী। পরজন্মে তারাকান্ত গাঙ্গুলী হইয়া তিনি শ্রীশ্রীলোকনাথের শিষ্যত্ব লাভ করেন। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের দরুণ তাঁহাদের ভিতর কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রীতি ও ভালবাসা ছিল। তাহারবলে তাঁহাদের ভিতর ভাবের আদান-প্রদান খুবই সহজ ও গভীর ছিল। শ্রীশ্রীলোকনাথের ধারাবাহিক জীবনী বলিতে গেলে যা বুঝায় এই সিদ্ধজীবনীতে তাহা নেই। এই জীবনীতে শুধু আছে জাগতিক ও পরমার্থিক কথাপ্রসঙ্গ। কি কর্ম্ম কি বিকর্ম্ম, কি বিদ্যা কি অবিদ্যা, কি জ্ঞান, কি বিজ্ঞান, কি সিদ্ধি কি বাজে সিদ্ধি। "কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের নাশ করিয়া একক থাকার কথা।" শ্রীশ্রীলোকনাথ মাত্র নয় বৎসর বয়সে উপনয়নের পর শ্রীশ্রী৺ভগবান গাঙ্গুলীর হস্তে তাঁহার পিতৃদেব রামাকানাই ঘোষাল মহাশয়ের দ্বারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অবস্থায় চিরদিনের জন্য অর্পিত হন এবং চিরদিনের জন্য গুরুর আদেশমত সাধন মার্গে চালিত হন। এই সব কথা গ্রন্থের মধ্যে সুন্দর ভাবেই লিখিত আছে। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীভারতী মহাশয় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম কাকে বলে এই প্রসঙ্গই প্রথম তুলেছেন।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও সদাচার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ভিত অর্থাৎ ব্রাহ্মনোচিত সংস্কারই ব্রাহ্মণের পরিচয়। এই সংস্কার হতেই কেনর উৎপত্তি—অর্থাৎ জিজ্ঞাসা আসে। যত বেশী জিজ্ঞাসা তাহা তত নেতিবাচক। অর্থাৎ সত্যকে জানতে গেলে মনের ধর্ম্মকে বাদ দিতে হবে। এইরূপ প্রত্যাহার বা Elimination দ্বারাই সংস্কারমুক্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যে শুধু "জিজ্ঞাসার" ধর্ম্ম এই সত্য ভুলে গিয়ে আমরা আমাদিগকে "হিন্দু" বলি। সংস্কার মুক্তিই আমাদের ধর্ম্ম। আমরা পারমার্থিক হিসাবে না হিন্দু, না বৌদ্ধ, না মুসলমান বা খৃষ্টান। যেটুকু গোলমাল সেটুকু হলো সংস্কার ভেদে জাতিভেদ। প্রকৃতির নিয়মে তাহা আসিয়াছে। সেটাকে সম্মান দিতে আমাদের স্বভাবচিত কর্ম্ম নিষ্কামভাবে ও নিষ্ঠার সহিত করিয়া যাইতে হইবে। শ্রীশ্রীলোকনাথ এই সত্যকে সব সময় তাঁহার আশ্রিতদের বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নেতিবাচক। বাদ দিয়ে দিয়ে চলিতে পারিলে মুক্তির পথ পাওয়ার ধর্ম্ম। বেদ বিহিত ধর্ম্মের উৎপত্তি নাদ। এই নাদকে ব্রহ্ম বলা হয়। আর যেসব মত বা ধর্ম্ম আছে তাহা অবতারদের ধর্ম্ম। অবতারগণ মানুষবই নয়। তাই তাদের মতে বা ধর্ম্মে সম্পূর্ণ মুক্তির পথ নাই। সংস্কারের উর্দ্ধে বা দ্বন্দ্বের হাত থেকে রেহাই নাই। সেখানে দ্বৈত দর্শন থাকবেই। কাজেই ভয় আছে। গীতাতে তিনগুণের সাম্য অবস্থাই প্রলয় অবস্থা বা সুষুপ্তি অবস্থা বা গুণাতীত ঈশ্বর অবস্থা।

শ্রীশ্রীলোকনাথ ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। কারণ কিছু আছে স্বীকার করিলে তাহার নাশও আছে। তিনি জানিতেন আমি আছি আর আমার কর্ম্ম আছে। যখন প্রকৃতির নিয়মে কর্ম্ম থাকিবে না তখন আমি "একক" থাকিব অর্থাৎ পূর্ণের সহিত লয় হইয়া যাইব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই সাধনমার্গের সাধককে "আত্মযাজী" হইবার জন্য যোগ বা কর্ম্ম করিতে আদেশ দিয়াছেন। আত্মযাজী

হইলে ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যাইবে। তখন জাত্যাভীমান থাকিবে না। সবাই চেতন স্বরূপ ব্রহ্ম হইবে। যেমন শরীরে যেকোন অংশের কষ্ট—তা মাথারই হউক বা পায়েরই হউক সমস্ত শরীরে কষ্ট হয়, সেইরূপ সমাজের যে কোন স্তরের জাতিই হউক বা মানুষই হউক যদি সংস্কার বিরুদ্ধ কর্ম্ম বা আচরণ করেন তাহা হইলে সমষ্টিগতভাবে সমগ্র জাতি বা মানুষের কষ্ট হইবে। অর্থাৎ জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হইবার জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে চতুরবর্ণ এবং আশ্রম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম জিজ্ঞাসায় ধর্ম্ম। শ্রীশ্রীলোকনাথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নাদ ব্রহ্মর দ্বারাই একক থাকা যায়। তাহাই সাধনমার্গে শ্রবণ, মনন নিধিধ্যাশনের কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের নাশে সক্ষম হইয়া পূর্ণ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কারভেদে জাতিভেদ এবং জাত্যানুযায়ী কর্ম্ম করিলে সমাজ সুষ্ঠ থাকে—এই উপলব্ধি তাঁহার হইয়াছিল এবং সেই আদর্শে সকলকে চলিতে বলিতেন। গীতার আদেশও তাহাই—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ।" এখন রাষ্ট্রিয় ও সমাজ ব্যবস্থায় উদারতার নামে সংস্কার বিরুদ্ধ কাজ করাটাই প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহাতেই এই বিশৃঋলা ও অরাজকতার সৃষ্টি। কোন কাজই প্রকৃতির নিয়মে চলিতেছে না। ভেদাভেদ বুদ্ধি প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। তাই ঠাকুর আমাদের মঙ্গলের জন্য গীতার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিয়াছেন,

"সদাসদ্‌মহমর্জ্জুন"

ভারতী মহাশয় এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীলোকনাথের কয়েকটি গুহ্য কথার উপর নির্ভর করিয়া ইহলৌকিক পারলৌকিক, শ্রেয় প্রিয়, জন্ম মৃত্যু, জরা ব্যাধি, ভয় অভয়, প্রকৃতি পুরুষ, জ্ঞান বিজ্ঞান, নিমিত্তকারণ উপাদানকারণ প্রভৃতির বেদবিহিত বিচার করিয়া সিদ্ধজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার ভিতর তুলনামূলক ভাবে কে বেশী বড় সিদ্ধ পুরুষ বা কে বেশী বড় যোগী ইত্যাদি আখ্যান বা অলৌকিক ঘটনার ভীড় নাই। প্রত্যেক মানুষই নিজ স্বভাব বা প্রকৃতি লইয়া আসিয়াছে।

কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই একমাত্র চৈতন্য সত্ত্বা ছাড়া। আমাদের অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুঞ্জিভূত সংস্কারই সৃষ্টির কারণ। যখন উহা সাম্য অবস্থায় আসে তখন প্রলয় হয়। আবার প্রকৃতির নিয়মে সৃষ্টি হয়। ইহাই মহাকালের নিয়ম। তাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। ইহাই মহাকালের সাক্ষী—অনাদি অনন্ত। বিচারে পাওয়া সম্ভব নয়। অন্তরমুখী হয়ে সুষুম্না নাড়ীর ভিতর মনবুদ্ধি অহঙ্কারাদিকে লয় করার অভ্যাসই যোগ। এই যোগ একদিনে বা এক জন্মে বা বহু জন্মেও হয় না। তবে যে সব লোক অন্তরমুখী সংস্কার নিয়ে, জন্ম নিয়ে সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণোচিত পিতৃমাতৃর গর্ভে জন্ম নেন, তাহারা দৈব অনুগ্রহে সাধনমার্গে প্রকৃতির প্রেরণাতে অগ্রসর হন। "তত্ত্বমোসি" উপলব্ধি করেন। "বহুনাং জন্মনান্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদন্তে" এইরূপ বহু জন্মের কর্ম্মের সুফল শ্রীশ্রীলোকনাথের ছিল। তাই তাহার মাতা কমলাদেবী তাহার চতুর্থ পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই স্বামীকে ডাকিয়া লোকনাথকে গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর হাতে চিরদিনের জন্য সমর্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। গুরুর শাসন ও আদেশ ভৃত্যের মত পালন করিয়া সাধনের ফল কৈবল্যমুক্তি কর্ম্মের দ্বারা লাভ করিলেন।

শ্রীশ্রীলোকনাথ বলিয়াছিলেন যে অধুনা বেদ যদিও লুপ্ত তথাপি বেদের অংশ গায়ত্রী এখনও জাগ্রত। ব্রাহ্মণের এই অধিকার আবার ব্রাহ্মণদের ভিতর ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাই আমি চাই। কারণ ব্রাহ্মণদের অধীনেই দেবতা। এখন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা ও শাসন যেমন Portfolio অনুযায়ী চলে তেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও মহেশ্বর মন্ত্রের অধীনে চলেন। আবার এই সব মন্ত্র কেবল সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণের অধীন। এর প্রমাণ উদ্দেশ্যেই ভারতী মহাশয়ের সিদ্ধজীবনী লেখার কারণ। তাহার উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয় তাহার জন্য তিনি আমার পিতৃদেব ৺মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীলোকনাথ দীক্ষিত, শেষ ও কনিষ্ঠ শিষ্যকে আদেশ দেন মুদ্রিত

করিবার জন্য। আমার বাবার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বা কি প্রকারে ৺ঠাকুরের দর্শন ও কৃপালাভ করিলেন তাহা পাঠকদের না শুনাইলে আমার মন তৃপ্ত হইতেছে না—হইতেও পারে না। সংস্কারই প্রধান, আমি ছেলেবেলা হইতেই আমার বাবার সহিত তাহার জীবিত অবস্থায় ছায়ার মত অনুসরণ করিয়াছি। বাবার মুখে কিভাবে তাঁহার ৺ঠাকুরের কৃপা বা দর্শন লাভ হইল তাহা শুনিয়াছি। বহুলোকে বলে যে ৺ঠাকুর বাবাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন আয়ুর্বেদের ব্যবসা করার জন্য। এটি কল্পিত কথা মোটেই সত্য নয়। আমার ঠাকুরদাদা ৺গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে ও দৈবদুর্ঘটনায় পদ্মা নদীর গর্ভে সমস্ত সম্পত্তি ও বিষয় আষয় বিলীন হইয়াছিল।

আমার বাবা ও কাকারা তিন ভাই ও পাঁচ বোন ছিলেন। বাবা মেজ, ৺ললিত মোহন বড় এবং ৺লাল মোহন ছোট। বাবা খুবই সুপুরুষ ছিলেন। আমার ঠাকুরমা ৺ব্রহ্মময়ী দেবী খুবই সুন্দরী ছিলেন। যেমন তেজী তেমনী বুদ্ধিমতী। ঠাকুরমা সর্ব্বস্বান্ত হইবার পর সংসারের হাল খুবই শক্ত করে ধরে ছিলেন। সব পিসিদের বিয়ে দেওয়া এবং মেজ ও ছোট ছেলেকে শিক্ষা দেওয়ার ভার নিয়াছিলেন। বাবা অল্প বয়সেই B.A. পাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পড়াশুনার সময় বাবা ভগন্দর অসুখে মরণাপন্ন হন। জ্বালা ও যন্ত্রণার জন্য পড়াশুনার আশা একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বাবার সব সময় মনে হইত দৈবকৃপা ভিন্ন তাহার বাঁচার ও পরীক্ষায় পাশ করার কোন আশা নাই। তাই ঢাকাতে (অধুনা বাংলাদেশ) লক্ষ্মীবাজারের ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ বাড়ীতে রোজ সকাল বিকাল ধর্না দিয়া থাকিতেন। বেশ কিছুদিন এইভাবে থাকার পর হঠাৎ একদিন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার সময়

বাবা উপলব্ধি করিলেন যে ওঁ নারায়ণের দেহের ভিতর হইতে এক তেজময় জ্যোতি শরীরের ভিতর প্রবেশ করিল এবং আদেশ হইল বারদী যাও। ওখানে শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী আছেন। ওনার কৃপায় তোমার মঙ্গল হইবে। তখন বাবার বয়স ১৭।১৮ বৎসর। অনেক চেষ্টায় খোঁজখবর নিয়ে বেশ কিছুদিন বাদে ভয়ে ভয়ে বারদী গ্রাম কোথায় তাহার হদিস মিলিল। বৈদ্যবাজার মেঘনা নদীর পাড় সেখান হতে বারদী গ্রাম নৌকায় যাত্রা করলেন। যেদিন বারদী আশ্রমে বাবা উপস্থিত হইলেন তখন ভোর হয় নাই। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত।

বাবা আশ্রমের নিকট যাইয়া আশ্রমের মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ বাদে ৺ঠাকুর বাল্যভোগ সমাপন করিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। বাবা সেই বিশাল আজানুলম্বিত জটাজুট শিবমূর্ত্তি দর্শনে হতবম্ভ হইয়া গিয়াছিলেন। কিছুই মুখ হইতে বাহির হইল না। ৺ঠাকুর দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন এসেছ, নাম কি? ব্রাহ্মণ? গোত্র কি? বাবা কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। অন্তর্যামীই সব জানেন। ভাঁরি গলায় একপ্রকার রাগতঃ ভাবে বললেন "আমি ডাক্তার নই, বৈদ্যও নই। ঢাকা হইতে আসিলে কেন? ওখানে ডাক্তার কবিরাজ দিয়ে কিছু হইল না আর আমাকে বিরক্ত করিতে কেন আসিয়াছ? যাও যাও, এখানে কিছুই হবে না।" বাবার মুখ হইতে কিছুই বাহির হইল না। ৺ঠাকুর ঘরে ঢুকে গেলেন। বাবা ৺ঠাকুরের বাল্যভোগ আহার করিয়া কুলকুচি করিয়া যে জল ৺ঠাকুর ফেলিয়া গিয়াছিলেন তাহার এক গণ্ডুষ সেবন করিলেন। চার-পাঁচ ঘন্টা বাহিরে অপেক্ষা করিয়া বাজার হইতে খাইবার মত কিছু দই চিড়া ও বাতাসা কিনিয়া খাইলেন। তারপর সেইদিন আর ঢাকায় ফিরিয়া যাইবার উপায় না থাকায় রাত্রে কোন এক নাগ বাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন ও রাত্রি কাটাইলেন। পরের দিন ভোর না হইতেই ৺ঠাকুর ৺জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার নিত্য সেবককে ডাকিয়া বলিলেন "হাঁরে সেই সুন্দর

ব্রাহ্মণ যুবকটি কোথায় গেল ?" ছাখতো, ডেকে আন। জানকী বলিল সেকি ? তাকে তো তুমি গাল মন্দ দিয়ে গতকাল তাড়িয়ে দিয়েছ। সে কোথায় আছে কি করিয়া বলিব। ছাখ গিয়ে নাগেদের বাড়ীতে আছে। ডেকে নিয়ে আয়। তাহাই হইল। বাবা আসা মাত্র পুত্রসুলভ কথাপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। তাও প্রায় ঘণ্টা দুই। বাড়ীর সব কথা, কি অবস্থা, কি করা হয়, সন্ধ্যাপূজা করা হয় কি না, গায়ত্রী পাঠ বিধিমত করা হয় কি না ইত্যাদি। তারপর কি পড়া-শুনা করা হয়। বাবা উত্তরে বলিলেন F.A. পড়ি। ৺ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন কি কি বিষয় নিয়া পড়। বাবা বলিলেন ইংরাজী, ফিলোজফি ও সংস্কৃত। ৺ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন "গীতা পড়ান হয় কি"? বাবা বলিলেন—হাঁ। "বিশ্বরূপ অধ্যায় পড়েছ?" বাবা বলিলেন—হাঁ।

৺ঠাকুর বিশ্বরূপ দর্শনের মাহাত্ম্য বুঝাইলেন। কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ বুঝাইলেন। তারপর জ্ঞানযোগ যখন সুরু করিবেন, তখন বাঁধা পড়িল। ৺ঠাকুর বলিলেন এজন্মে যা শুনলে তাই নিয়ে চল—মঙ্গল হবে। তারপর বাবাকে দীক্ষা দিলেন। যে মন্ত্র উনি নয় বৎসর বয়সে ভগবান গাঙ্গুলী দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন সেই মন্ত্র। বাবা আমাদেরও ঐ মন্ত্রে আমার তের বৎসর বয়সে উপনয়ণের দুই বৎসর পরে ৺কাশীধামে দিক্ষীত করেন। আমার দাদাকেও দীক্ষা দিয়াছিলেন। দাদা ১৯৬৫ সনে গত হন। ৺ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করার পর বাবার পুনর্জন্ম লাভ হয়। প্যাকাটির মত চেহারা ক্রমে ক্রমে মেদবহুল, সৌম্যমুর্ত্তি হইয়াছিল। দিব্য-জ্যোতি আসে। অমানুষিক কার্য্যশক্তি আসে। প্রতিদিন ১৭।১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতেন। ওনার পরিশ্রম আমরা ভাবতে পারিনা। দারিদ্র্যতা গায়ে মাখিতেন না। মাষ্টারী করিয়া বাঁধা ৬০৲ টাকায় সংসারের ১৭।১৮ জন লোকের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাতেন। তারপর প্রকৃতির প্রেরণায় সংসারের এটা সেটাও অসুখ বিসুকের জন্য অল্প

পয়সায় যাহাতে ঔষধ ব্যবস্থা করা যায় তাহার জন্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পড়াশুনা করেন এবং ১৩০৮ সনে (ইংরাজী ১৯০১) অধ্যক্ষ মথুরবাবুর শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রীতি, ভালবাসা ও নৈষ্ঠিক ব্যবহারের জন্য তাহার ছাত্ররা খুব উৎসাহ লইয়া ৪।৫টি ঔষধ—চ্যবনপ্রাশ ও মকরধ্বজ প্রচার আরম্ভ করে। অল্পমূল্যে খাঁটি ঔষধ প্রচারে প্রতিষ্ঠা লাভও করিতে থাকে। ক্রমে ঐ শক্তি ঔষধালয় বিরাট আকার ধারণ করে। সমস্ত ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে উহার শাখাপ্রশাখা স্থাপিত হয়। বহু গণ্যমান্য দেশনায়ক, গভর্ণর ও ভাইসরয় এই শক্তি ঔষধালয়ে বাবার দ্বারা আনিত হন এবং তাঁহাদের প্রশংসা লাভ করেন।

এই কথা এখন গল্প মনে হয়। তাঁহার উক্ত প্রতিষ্ঠান এখন ভারতে প্রায় লুপ্ত। কিন্তু ৺ঠাকুরের কৃপায় এখনও বাংলাদেশে বিশাল আকার ধারণ করিয়া চলিতেছে। এখনও ওখানকার মুসলমান সম্প্রদায় অধ্যক্ষ মথুরবাবুর শক্তি ঔষধালয়কে মনেপ্রাণে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। বাবার প্রতিষ্ঠিত "শক্তি ব্রহ্মচার্য্য" আশ্রমও তাহারা সুন্দর মত চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই প্রতিষ্ঠানকে চালাবার ভার আমাদের প্রাক্তন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত অনিল কুমার মুখোপাধ্যায়ই বাংলাদেশে রাষ্ট্রও জনগণকে নিয়ে গত ১৯৬৫ হইতে চালাইয়া যাইতেছে। Bangladesh Government অদল বদল হয় কিন্তু শ্রীশ্রীলোকনাথের কারবার বা আশ্রম সুন্দরমত পূর্ব্বের সবরকম ব্যবস্থা করিয়া চলিতেছে। ৺ঠাকুর দয়াগঞ্জে মনে হয় তাহার কৃপাদৃষ্টি অটুট রাখিয়াছেন। এবং তাই মনে হয় যে বাবা মৃত হইয়াও বাংলাদেশে অমর হইয়া থাকিবেন। সেই শক্তি ব্রহ্মচার্য্য আশ্রমের শক্তিপ্রেস হইতে মুদ্রিত সিদ্ধজীবনীর তৃতীয় সংস্করণ বহুদিন হইল শেষ হইয়া গিয়াছে। ৺ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় আমি তাহার চতুর্থ সংস্করণে হাত দিয়াছি। আমার কিছু বলার ছিল তাই আপনাদের জানাইলাম।

প্রত্যেক মানুষের জীবনই একটি ছোটখাটো মহাভারত। জীবনটাও full of contradiction পিছনে তাকাইয়া লাভ নাই। সাথে কিছুই যাইবে না। এই অমূল্য গ্রন্থখানা যদি থাকে, তবে কিছু মত ও পথ ভবিষ্যতের জন্য খোলা থাকিবে। আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান জয়ন্ত সেও প্রায় ২০।২২ বৎসর যাবৎ বিদেশে। ৺ঠাকুরের কি ইচ্ছা তাহা জানি না। মনে হয় আমার সাথেই তাঁহার সহিত দুই পুরুষের আদান প্রদান শেষ হইতে চলিল। আমি ৺ঠাকুরের ভক্ত কিনা জানি না কিন্তু আমি তাহার দ্বারা ভুক্ত, এটা বেশ জানিয়াছি। এই সিদ্ধজীবনী যাহাতে গীতার মত প্রত্যেক সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তি রোজ ২।৪ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া তৃপ্তি পান তাই ৺ঠাকুরের কাছে একমাত্র নিবেদন। ৺ঠাকুরের এই পুস্তক ও তাঁহার ছবি যে গৃহে থাকিবে যদি তাঁহাকে দিনের ভিতর একবারও মনের কথা জানান তবে অবশ্যই মনে বল পাইবেন ও গৃহের ও গৃহস্থের মঙ্গল হইবে। ভয় শূন্য হওয়া সংসার পার পাবার একমাত্র পথ। ভাল দিনও চলিয়া যায়, মন্দ দিনও চলিয়া যায়।

জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি সবই সত্য। ভেবে ভয় পেয়ে কোন লাভ নাই। তবে জরাগ্রস্ত হয়ে না থাকি এটাই আমার একমাত্র ৺ঠাকুরের কাছে নিবেদন। অনেকবার বাঁচিয়েছেন। পঙ্গু হইয়া থাকিতাম। কিন্তু উনি আমার সেবা না পাইলে অভিমান করেন, তাই এখনও ৬৮ বৎসর বয়সে সবদিক হইতে ভাল রাখিয়াছেন। মনে হয় শেষ পর্য্যন্ত আমার সেবা উনি ভাল মতনই নিবেন। সেটাই কাম্য। ভারতী মহাশয়ের কোলে পিঠে মানুষ হইয়াছি। তাই তাঁর কাজটা উনি করাইয়া লইলেন। আমার বাবার আত্মাও তৃপ্তি লাভ করিবে। বাবা ইং ১৯৪২ সালে সজ্ঞানে ৺কাশীলাভ করিয়াছেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে বাবা বলিলেন ৺ঠাকুরকে রাখিয়া গেলাম, ওঁকেই ধরে থাকিবে। কাহাকেও সন্দেহ বা অবজ্ঞা করিবে না।

আমার মাতৃদেবীও স্বপ্নে ৺ঠাকুরের বীজমন্ত্র পাইয়াছিলেন। তাঁহার ৺ঠাকুরগত প্রাণ ছিল। সব সময়ই প্রায় জপ করিতেন ও সংসারের সবরকম কাজ করিতেন। আমি ছেলেবেলা হইতেই বাবার কাছেই আশ্রম ও কারখানায় থাকিতাম। সেই সময় তাঁহার কাছেই তাহার গুরুভাইরা প্রায় সকলেই আসিতেন। তাঁহাদের সৎপ্রসঙ্গ ও আচার ব্যবহার আমার খুব ভাল লাগিত। বাবার শেষ বয়সে কলিকাতা Central Avenue বাড়ী করেন। ইং ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতাতেই কাটাইয়াছেন। সেই সময় এক অতি সুপুরুষ ভদ্রলোক বাবার কাছে মাঝে মাঝে আসিতেন। ওনাকে আমি সবসময় বাবার নিকট লইয়া যাইতাম। কিছুক্ষণ কাটাইয়া তিনি চলিয়া যাইতেন। বাবাকে ঐ ভদ্রলোকের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ওনার নাম ডাঃ নিশীকান্ত বসু। বারদীর লোক এবং ৺ঠাকুরের খুব ভক্ত। ৺ঠাকুর প্রসঙ্গ নিয়ে ওনাদের ভিতর গভীর আলোচনা হইত। পরে উনি গত হইলে জানিলাম ওনার ছেলের নাম জ্যোতি বসু। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। কাজেই আশা করা যায় যে তিনি নীতিগতভাবে দক্ষতার সহিত রাষ্ট্রীয় কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন।

৺ঠাকুর আমাকে কিছু এমন সব সৎজনের সহিত যোগাযোগ করাইয়া দিয়াছেন যে তাঁহাদের সংশ্রবে না আসিলে আমার কি গতি হইত তাহা বলিতে পারিনা। তাহাদের কয়েকজনের নাম দিতেছি যাহারা মোটামুটী কিছুটা সংস্কার মুক্ত ছিলেন। কারণ তাহাদের আচার ব্যবহার খুবই নৈষ্ঠিক ও নিরহংকারী। আমাদের দারোয়ানজী ৺লোকনাথ সিং তাহার স্বভাবটা আমি ঠিকমত বলিতে বা লিখিতে পারিব না। আমার কাছে উনি একটা মূর্ত্তিমান গীতা। সে আমার জীবনের সঙ্গে এত জড়িত যে তাহার ভালবাসা ও শাসন না পেলে যৌবনের চণ্ডালোচিত কাজ করিয়া বসিতাম। যখন অভাব অভিযোগ

ও স্বার্থের দ্বন্দের ভিতর সব দিক হইতে বিভ্রান্ত। সেইদিনে আমার আশ্রিত সাধারণ একজন আমার সংসারের হাল ধরিয়াছিলেন। তাহার আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যে কতটা ছিল তাহা বুঝাইতে পারিব না, তাহার শাসন ও আদেশ, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মানিতে বাধ্য হইতাম। ১৯৬৮ সনে উনি গত হন। তাহার মৃত্যুটাও একটি বিরাট রহস্য। ব্যবসার ক্ষেত্রে ৺ঠাকুর দয়ালাল বাবুর সহিত আমার পূর্ব্বজন্ম পরিচয়ের ফলে যোগাযোগ করাইয়া দেন। ১৯৫৬ সন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত তিনি আমাকে পরম বন্ধু ও আত্মীয় হিসাবে দেখিয়া আসিতেছেন। তিনি জাতিতে গুজরাটি হইয়াও যেইভাবে আমার ও আমার সংসারের সহিত ব্যবহার রাখিয়া চলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে পূর্ব্বজন্মে ওনার সহিত আদান প্রদান খুবই গাঢ় ছিল, তাই এখনও পাইতেছি। আমার বন্ধু শ্রীসুবোধ কুমার দত্তর কথা বলিতে গেলে বন্ধুকে ছোটো করা হয়। তার স্বভাবটা বাস্তবিকই স্বভাবেই রহিয়াছে। কখনই তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ সে করেনা। বংশমর্য্যদায় আমার বন্ধুটি ৩০০ বছরের বিখ্যাত হাটখোলার দত্তপরিবারের ছেলে। ওর ভালবাসা ও বন্ধুত্ব পেয়ে আমি ধন্য। আমার কাছে ওকে সংস্কার মুক্ত পুরুষই মনে হয়। ওর সান্নিধ্যে যারা আসে তারা আনন্দ পেতেই আসে, কারণ ভেদাভেদ বুদ্ধি আমার বন্ধুটির মধ্যে একেবারেই নেই। আমার আর একটি বন্ধুর ৺অনিল ঘোষের কথা বলিব, উনি মাত্র ৫২ বছর বয়সে ১৯৬৮ সালে মারা যান। অতি সুপুরুষ ছিলেন। স্বভাবও আকর্ষণীয় ছিল। আমার বাবা, মা, ছেলেমেয়ে ও দাদা এবং স্ত্রী সবাই ওকে খুব আদর করিত ও ভালবাসিত। সংসারের সব কিছু ঝামেলাই ওর দ্বারা সমাধান করিবার চেষ্টা হইত। এককথায় বলা যায় একটি বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুর মত। ঘরে ও বাইরে সবাই ওকে ঘিরিয়া থাকিতে ভালবাসিতাম। খুব আনন্দময় পুরুষ ছিল। বালক সুলভ স্বভাব নিয়া আসিয়াছিল এবং সেইভাবেই চলিয়া গিয়াছে। আর একজন

বন্ধু ৺গৌরাঙ্গলাল ব্যানার্জীর কথা বলিব। সে বাস্তবিকই খুব নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্ট হেলথ্ অফিসারের সিনিয়র পদ থেকে অবসর নেওয়ার মাত্র ২।১ বছর পরে হঠাৎ মারা যায়। বন্ধুটি অকৃতদার ছিল। কিন্তু এককথায় বলতে গেলে সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে মায়া মমতা দিয়ে একটি সংসার সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল। ১৯৭৪ সালে আমি যখন spinal cordsএ cox হয়ে শয্যাশায়ী এবং rectum-এর কাছে বৃহৎ bed sore হয়ে আমি যখন মৃত্যু আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন আমার এই বন্ধু সব কিছু ভুলিয়া আমাকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত ছিল এবং তাহার দক্ষ চিকিৎসার ফলে আমি আরোগ্য হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিলাম। এইরকম বন্ধু ভাগ্যে না থাকিলে আমার কি হইত বলিতে পারি না। শুধু আমি নয় অনেকেই ওর দ্বারা চিকিৎসা ও অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছিল। আমার আর এক বন্ধু বৈদ্যনাথ দত্ত। তাহার কথা না বলিলে আমার বন্ধুভাগ্যের কথা সম্পূর্ণ হয় না। আমার এই বন্ধুটির মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার যাহা লইয়া সংসার ওর স্বভাবে ও আচার ব্যবহারেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এখন আমার কর্মজীবনে যেসব সদাশয় ও সৎলোক দৈব অনুগ্রহে জুটিয়াছে তাহাদের দুই চার জনের কথাও বলা প্রয়োজন মনে করি। তাহাদের মধ্যে শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমার ঔষুধের ব্যবসায় যখন আমি নানা দিক হইতে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম তখন ১৯৪৯ সালে ঠাকুরের কৃপায় ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কেমিষ্ট হিসাবে ওনার Scientific guidence দ্বারা আমি আমার বর্ত্তমান ওষুধ ব্যবসায়ে (Embiar Laboratory) মোটামুটি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি এবং ওনার দ্বারাই বর্ত্তমান আমার ব্যবসায়ের কর্ণধার শ্রীনয়নরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচয় এবং ওনার উপর সমস্ত factory-র দায়িত্ব দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। অন্যান্য যাহারা আমার সহিত কার্য্য উপলক্ষ্যে জড়িত

ও পরিচিত তাহাদের যেরূপ আচার ব্যবহার পাইতেছি তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই সব ব্যক্তিদের সাথে আমার নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মের কোন আদান প্রদান ও আত্মীয়তা ও পরিচিতি ছিল। তাহা না হইলে আমি কর্ম্মজীবনে নিশ্চিন্ত হইয়া কাজকারবারের হাল ছাড়িয়া ঠাকুরের সেবা ও পূজা করিতে পারিতাম না। ঠাকুরের সেবা ও পূজা আমার কাছে নিত্যকর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। আমি ৭ বছর বয়সে যাহা ছিলাম এখনও সেইভাবেই চলিতেছি। এই ভাগ্য নিশ্চয় আমি ঠাকুরের কৃপায় পাইয়াছি। আমার মা ৺শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেবী ৺ঠাকুরের (৺লোকনাথের) অসীম কৃপা স্বপ্নে লাভ করিয়াছিলেন। আমার মায় মত ঠাকুরগত প্রাণ মনে হয় বাবারও ছিল না। যৌথ পরিবারের দায়িত্ব তিনি একলাই বহন করিতেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও সব সময় ঠাকুরের নাম নেওয়া যোগাভ্যাস-এর মত হইয়া গিয়াছিল। আমরা ভাইবোনেরা আচার ব্যবহার ও শিক্ষা দীক্ষা মার কাছেই পাইয়াছি কারণ বাবা আমাদের দেখা শুনা কিছুই করিতে পারেন নাই। বাবা সব সময় ঠাকুরের আশ্রম (শক্তি ব্রহ্মচার্য্য আশ্রম) ও শক্তি ঔষাধালয়ের ব্যবসা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। সংসারে কি ঘটিতেছে দেখিবার মত সময় তাহার ছিল না।

আমার স্ত্রী শ্রীমতী অপর্ণা মুখোপাধ্যায় ১৩ বছর বয়সে আমাদের সংসারে আসেন। ওর পিত্রালয় পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগর হাটখোলায়। আমার শ্বশুর মহাশয়েরা তেলেনীপাড়ায় কয়েক পুরুষের বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। আমার শ্বশুর মহাশয় এখনও জীবিত। নাম শ্রীযুক্ত সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। অতি সদাশয় ও দেবতুল্য লোক। আমার স্ত্রীভাগ্য ঠাকুরের কৃপায় ভালই বলিব। সংসারের কোন ঝামেলাই আমাকে ২৩ বছর বয়স হইতে অদ্যাবধি দেখিতে হয় নাই। আমার মনে হয় আর হবেও না। ভয় বলে কোন জিনিস ওর মধ্যে নেই। সব কিছুর মধ্যে থেকেও নিজেকে একক রাখিতে পারে। ওর

স্বভাবে নিজস্ব চাহিদা বলে কোন কিছুই নেই। আমার বোনেদেরও ঠাকুরগত প্রাণ এবং তাহার কৃপায় সবাই মোটামুটি সুখে শান্তিতেই আছে। বিশেষত আমার ছোট বোন গীতা গঙ্গোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রকার আপদবিপদে ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পন করিয়া সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতেছে। ওর ঠাকুরনিষ্ঠা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আমি ভাবি গুরুবল থাকিলে পাহাড় পর্ব্বত ও মাঠে ঘাটে গিয়া সৎসঙ্গ করার কোন দরকারই নাই। জন্মান্তরবাদ মানিলে সংসারেই এমন সব লোক আত্মীয় ও অনাত্মীয়র সঙ্গ লাভ হইবে যে তাহারা বাস্তবিকই সৎ ও আনন্দময় পুরুষ। সেই হিসাবে আমার সুরেশ-দার কথা ও পরিচয় দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করিব। সুরেশদার পুরা নাম সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উনি ওনার মাতামহ পণ্ডিত রজনী আমিন মহাশয়ের সাথে অতি শৈশব হইতেই শক্তি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে থাকিয়া সংস্কৃত শিক্ষা ও স্কুল কলেজের শিক্ষা B.A. ও B.L. পাশ করিয়া সমাপন করেন। আমার বাবা ও মা প্রত্যেকেই ওনাকে নিজ সন্তানের মত লালন পালন করিয়া থাকিতেন। আমাদের প্রথম বয়সে আমরা ভাই ও বোনেরা সবাই জানিতাম সুরেশদা সত্যি আমাদের নিজেদের বড়দা। কাজ কারবার ও বৈষয়িক ব্যাপারে এবং আমার ও দাদার শিক্ষার ব্যাপারে উনিই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন কারণ আমার বাবা খুব আত্মভোলা ও নিস্বার্থ মানুষ ছিলেন। বৈষয়িক ব্যাপারে কিছুই নজর ছিলনা। আমাদের যৌথ পরিবারের বৈষয়িক ব্যাপারে উনি যদি হাল না ধরিতেন, তাহা হইলে বিরাট অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও আমরা পথে বসিতাম। ওনার বৈষয়িক দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার জন্য আমার বাবা এই সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন এবং আমাদের শিক্ষা দীক্ষার ভিতর দিয়া যে সদাচার ও ব্যাবহার মনে গাথিয়া দিয়া গিয়াছেন সেই সম্বল লইয়াই আমরা এখন পর্য্যন্ত নির্ভীক ভাবে চলিতেছি। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাসে আমাদেরই দোষে আমরা ওনার সান্নিধ্য হারাইয়াছি।

কিন্তু ওনার আশীর্ব্বাদ আমরা এখনও হারাই নাই। উনি এখনও গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করিতেছেন। আমি জানি যে যাহা লিখিলাম তাহা পাঠকের কাছে আদর পেতেও পারে অথবা নাও পেতে পারে কিন্তু সংসারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সবকিছুই প্রকৃতির নিয়মে চলিতেছে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরই ভাল ও মন্দ এবং অন্যান্য দ্বন্দ্ব আছে কাজেই আমরা যখন সব সময়ই ভাল বা মন্দ নই, ভাল মন্দের বিচার করিয়া অভিমান করা যুক্তি সঙ্গত নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ন অহমসৎ ন অসৎ অর্জ্জুন।

এই যদি সত্য হয় তাহলে আমরা কেন সমাজ সংসারে সমস্ত লোকের আদান প্রদানের ভিতর আনন্দ পাইব না? সেই কথাই মনে করিয়া আমি আমার বন্ধু-বান্ধব, ভাই-বোন ও আশ্রিত অনাশ্রিত এবং আত্মীয় অনাত্মীয় সবার কথা আমার জীবনে যেরূপ দাগ কাটিয়াছে তাহা জানালাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মানুষ সর্ব্বদা আনন্দের মধ্যেই থাকতে পারে এবং দ্বৈত দর্শন হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। তাই ভগবান রসবৈশঃ—রসময়।

গুরু কৃপাহি কেবলম
পাপ নাশ হেতু রেশনতু বিচার বাক্‌বলম

ওঁ তৎসৎ

শ্রীশ্রীসদাশিবোজয়তি

সিদ্ধ জীবনী

ভূমিকা

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও তৎসহ জীবনী লেখকের সম্বন্ধ

হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম প্রভৃতি কথা এখনকার পুস্তকাদিতে পাঠ করা যায়; কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকথাটি বঙ্গভাষাতে একরূপ নূতন। তাহা হইলেও আমরা এই ধর্ম্ম আবিষ্কার করিতে বসি নাই; ইহা নূতনও নহে।

শ্রুতি, স্মৃতি ও তাহার অবিরুদ্ধ পুরাণ এবং সদাচার, এই চারিটী উপায়দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নির্ণীত হইতে পারে।

শ্রুতি,—' এই কথাতে পূর্ব্বে বেদ বুঝাইত; এখনকার কথিত বেদ, শ্রুতি নহে,—লিপি। এজন্য অধুনা বেদ বিলুপ্ত,—বলা হয়। ব্রহ্ম নিরূপণের জন্য জ্ঞানকাণ্ডে বেদান্ত নামক বৈদিক লিপিগুলির ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডে লিপিকরা বেদমন্ত্র কোন কার্য্যকর হয় না। বর্ত্তমান সময়ে কেবল গায়ত্রী মন্ত্র, (কোন কোন স্থলে—ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাও) শ্রুতিস্বরূপ পাওয়া যায়। এখানে প্রাচীন প্রথা অনুসারে শ্রুতিকে প্রথমোপায় বলা হইল বটে, কিন্তু কার্য্যকালে শ্রুতি-প্রমাণ প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইতে পারে না।

স্মৃতি,—মনু প্রভৃতি বিংশতি সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিকে স্মৃতি শাস্ত্র বলা যায়।

পুরাণ,—অষ্টাদশ মহাপুরাণই প্রমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে। অধুনা পুরাণ মধ্যে বিস্তর কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে। এজন্য বিশেষ বিচারপূর্ব্বক পুরাণবাচন গ্রহণ করা আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে।

সদাচার,—প্রাচীন মুনিঋষিগণ, বেদস্মৃতির অনুশীলন করিয়া নিজেরা যে আচরণ করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী বংশপরম্পরাতে তাহাই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। তাহাই সদাচার। নতুবা অমুকে সৎব্যক্তি বলিয়া লোকমধ্যে খ্যাতিলাভ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি হইলেন সৎ। তাঁহার আচরণ, সদাচার ধরা যাইতে পারে না; কারণ বর্ত্তমান সময়ে চতুরতার বলে, অসৎ লোকও সৎ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারে।

স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায়, কল্পারম্ভে সকল মনুষ্যই ব্রাহ্মণ ছিল। কালধর্ম্মে সেই ব্রাহ্মণদিগের বংশে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভাবাপন্ন জন্মগ্রহণ করিতে থাকিলে, চতুর্ব্বর্ণ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ক্রমে তাহাদের মধ্য হইতে বিবিধ সঙ্কর বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে। এই সমস্ত বর্ণই ব্রাহ্মণদ্বারা চালিত। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও সদাচার অনুসারেই এই সকল বর্ণের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মকার্য্য স্থির করা যায়। কাল সহকারে উহাদের মধ্য হইতে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুপযুক্ত বহুসংখ্যক মনুষ্যকে নির্ব্বাসন করা হইয়াছিল। তাহারা চীন, হূন, প্রভৃতি নামে দূরতর ও প্রান্তভূ‌র্ভাগে বাস্তব্য করে। এই সকল লোক, ধর্ম্মহীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এখনকার 'ধর্ম্ম' কথার অর্থ অন্যরূপ হইয়াছে,—যথা—সম্প্রদায়বিশেষে যাহা পরকালের উদ্দেশে অনুষ্ঠান করে তাহাকে ধর্ম্ম বলিতে হয়। এসকলের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পরিচায়ক।

এতকাল চতুর্ব্বর্ণ ও সঙ্করবর্ণ সমূহের মূলধর্ম্ম ছিল সেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম।

কলিযুগের প্রাবল্যবশতঃ বিবিধ নাস্তিকমত সকল ধীরে ধীরে ঐ সকল বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। শূদ্র রাজাদিগের অধিকারকালে, এতদ্দেশে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি নাস্তিক মতের বাহুল্য প্রচলন ঘটে। নাস্তিক ও আস্তিক মতের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমশঃ নানা সাম্প্রদায়িক মত সকল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সে সকল মতকে বিবিধ তন্ত্র বলিয়া ধরা যায়।

মুসলমানাধিকার কাল হইতে মুসলমান ভিন্ন এতদ্দেশীয়গণ, হিন্দুনামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে আস্তিক-নাস্তিক, শাক্ত-শৈব, বৌদ্ধ-বৈষ্ণব-জৈন সকলেই হিন্দুপদবাচ্য হইয়াছে; এইরূপে চাউলে-ডাইলে মিশ্রিত হইয়া মোটা মিহি-বালাম ভূসি, সকল প্রকার চাউল, মুগ-মসূর-মাষ প্রভৃতি সমস্ত ডাইল একত্র করা হইয়াছে। সেই অপক্ক খিচুড়ী ইংরাজ অধিকারে পাশ্চাত্য শিক্ষানলে সুপক্ক হইয়া বিলাতি চালচলনের মসল্লাতে রং-বেরং হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মের সরস খিচুড়ী বনিয়াছে।

এখন আর হিন্দুধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রহে নাই। শূদ্রেরা গলায় সূতা বান্ধিয়া, গুরুগিরি, পুরোহিতগিরি আরম্ভ করিয়াছে। শূদ্র-রাজাদের সময়ে, বৌদ্ধদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের অনুকরণে প্রধান বৌদ্ধেরা "শ্রমণ" নাম ধারণ করিয়াছিল। অধুনা শূদ্রেরা সেইরূপ ব্রাহ্মণের "দেবশর্ম্মা"র অনুকরণে "দেববর্ম্মা" উপাধি লইতে আরম্ভ করিয়াছে। মহর্ষি, রাজর্ষি, পরমহংস, স্বামী প্রভৃতির ত ছড়াছড়িই ঘটিয়াছে। বিলাত ফেরত মিষ্টারগণ, দেশোদ্ধারক বাবুগণ, দেশ-হিতৈষীতার দর্ব্বী হাতে লইয়া জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া দিয়া খিচুড়ীর মণ্ড প্রস্তুত করিতেছেন। এখন আর তেমন ভাব নাই। উচ্চ শিক্ষার তীব্র উত্তাপে সে রস শুকাইয়া গিয়া খিচুড়ী পোড়া লাগিয়াছে। নাসিকারন্ধ্র জ্বলিয়া যাইতেছে। চারিদিক্ হইতে 'সামাল সামাল' ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মটা যে কিরূপ জিনিস, এক্ষেত্রে তাহার আলোচনার সময় হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ভাব ব্যক্ত হওয়ার আশা করা যায় না। ব্রাহ্মণ কে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য হাল আইন অনুসারে ভোট সংগ্রহ করিতে হয়। শাস্ত্রসমূহ কিন্তু তেমন কথা বলে না।

স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণীর গর্ভে, ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তানই ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের জন্যই স্মৃতিশাস্ত্র রচিত। ইহা হইল

ব্রাহ্মণ নির্ণয়ের সাধারণ বিধি। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র উৎপত্তি সময়ে যেমন ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র প্রকৃতির মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এখন একাচার প্রবর্ত্তক ঘোর কলিতে সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী হইতে একাচারপ্রিয় লোকের উৎপন্ন হওয়ার কথা। কেবল সম্ভাবনা নহে, আমরা অহরহঃ ইহারই অভিনয় দেখিয়া আসিতেছি। এজন্য বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণদিগের গৃহে জাত ব্যক্তিমাত্রের প্রতি সেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নির্ণয়ের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। আসল ব্রাহ্মণ বাছিয়া লওয়ার জন্য আরও কিছু লক্ষণ থাকা চাই। সেই লক্ষণটির নাম,—আস্তিকতা। ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে চতুর্ব্বর্ণের মনুষ্যদিগের স্বভাবজাত কর্ম্ম বা গুণ অথবা ধর্ম্ম ইহার যাহাই বল,—নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে যথা।—

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্॥

অর্থাৎ শম, দম, তপঃ, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও আস্তিক্য এই নয়টী ব্রাহ্মণের জন্মগত গুণ। তন্মধ্যে এই একমাত্র আস্তিকতাকেই অন্য আটটী গুণের প্রসূতি ধরা যায়। অতএব ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাতদিগের মধ্যে অন্ততঃ একমাত্র আস্তিকতা দেখিয়া তাহাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে। ইহাও বড় সহজ লক্ষণ হইল না। নিজে আস্তিক না হইলে, অন্যকে আস্তিক বলিয়া চেনা যাইতে পারে না। আমি আমাকে আস্তিক ব্রাহ্মণ বলিয়া স্থির করিতে পারিয়াছি।

তাহাতেই আমাকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আলোচনার অধিকারী মনে করি। এবং তাহাতেই একটী সিদ্ধব্রাহ্মণের সাধারণ জীবনী প্রচারে প্রবৃত্তি ও সাহস জন্মিয়াছে।

স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণের দেহধারণ ব্যাপারটি অপর সাধারণের ন্যায় ক্ষুদ্র কামনাভোগের জন্য নহে। ব্রাহ্মণ কৃচ্ছ্র করিবে, তপস্যা করিবে এবং মরণান্তে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে। অতএব রেলগাড়ী, বেলুনযন্ত্র, তারহীন তড়িৎ বার্ত্তাবহ প্রভৃতির আবিষ্কারের প্রযত্ন করা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উপযুক্ত নহে; পরকালের জন্য উপযুক্ত হওয়াই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে আস্তিক ব্রাহ্মণদিগের কার্য্য দুই প্রকার—

১। যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জ্জন করিতে না পারেন, তাঁহাদের স্বর্গজনক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান ও প্রাজাপত্যাদি লোক ভোগ করিতে হয়।

২। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথাবলম্বী অস্তিকদিগের ভাব অন্যরূপ: তাঁহারা ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মে পরিণত হইয়া থাকেন। তথাচ মনু—

"উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্দ্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে॥"

আমরা যাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিখিতেছি, তাঁহাকে এতাদৃশ বিপ্র বলিয়া স্থির করিয়াছি।

তাঁহারই অনুগ্রহে ইহলোক হইতে পরলোক পর্য্যন্ত প্রসারিত কোন পথের পরিচয় পাইয়াছি। তাহা বহিস্থ রাস্তা নহে,—দেহগত সুষুম্না নামক নাড়ীবিশেষ। আমরা সাধারণ পাঠককে সেই নাড়ী দেখাইয়া দিতে পারি না। উক্ত সিদ্ধব্রাহ্মণের জীবনীর সঙ্গে সঙ্গে ঐ নাড়ীর পরিচয় বুঝিয়া লইতে হইবে। এই নাড়ী-বিজ্ঞান কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। আমরা গ্রন্থ লিখিয়া জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারি, উক্ত নাড়ী-পথ-নির্ণয় সাধন সাপেক্ষ; এজন্য পুস্তকাদিতে কর্ম্মযোগের কথাতে অগ্রসর হইতে চাই না।

কলির যুগধর্ম্মে যখন আস্তিক-নাস্তিক মিশাইয়া হিন্দুধর্ম্মের খিচুড়ী হইয়াছে এবং অধুনা মণ্ড প্রস্তুত হইতে চলিল, তখন

আস্তিক ব্রাহ্মণ, আর আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ব্যস্ত না হইয়া পারেন না। যাহারা চাউল-ডাইলের জাতি ভাঙ্গিয়া মণ্ড বানাইতেছেন, তাহাদের প্রতি আস্তিকদিগের কথা এই যে—তোমরা পৈতা ফেল, আর বিভিন্ন জাতীয় লোকের সহিত খাইয়া উন্নত হও, বিধবা-বিবাহ দিয়া রিফর্ম্মার (Reformer) হও, সমাজভ্রষ্টদিগকে সমাজে উঠাও, তোমাদের মত দশজনকে মজাও,—আমরা কিন্তু মজিতেছি না। তোমাদের নৃত্য দেখিয়া আমরা নাচিব না। এতদিন চুপ করিয়াছিলাম, এখন একথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে! এসকল কথা শুনিবার মনুষ্যও রহিয়াছে। এতদিন ইহারা তোমাদের সঙ্গে গোলে হরিবোলের মধ্যে ছিলেন, এখন আপনাদের স্বতন্ত্র থাকার আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন, আমরাও সময় বুঝিয়া কিছু বলিতেছি।

স্কুলে পড়িয়াছি,—"ইণ্ডিয়া অর্দ্ধসভ্য।" ইণ্ডিয়া শব্দের বঙ্গানুবাদে এখন ভারতবর্ষ লেখার ব্যবহার দেখা যায়; ভারতবর্ষের বর্ণনা, শাস্ত্রে যেমন পাওয়া যায়, তাহাতে এখনকার সভ্য সমাজের জ্ঞাত সমস্ত পৃথিবীই ভারতবর্ষের এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। এজন্য আমি ইণ্ডিয়া কথাতে হিন্দুস্থান বলিতে চাই। "ইণ্ডিয়া অৰ্দ্ধসভ্য" কথাতে হিন্দুগণ অর্দ্ধসভ্য বুঝায়। ইংরেজী শিক্ষিত বাবুগণের অস্তিত্ব দ্বারাই, হিন্দু, অর্দ্ধসভ্য সংজ্ঞাভুক্ত হইতে পারিয়াছে। ভাবতঃ বুঝিতে হয়, দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে আমরা অসভ্য ছিলাম।

শ্রেষ্ঠ জীব

নব্যদিগের ' লিখিত পুস্তকাদিমতে পরমার্থপরায়ণ শ্রেষ্ঠ লোকদিগের নাম যথা;—বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি। ইঁহারা নাকি জগতের হিত করিয়া এই মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন।

আমাদের ভাব অন্যরূপ। আমরা জানি, জগতের হিত করার পরিবর্ত্তে আত্মহিত করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিতে হয়। সেইভাবে যাঁহারা আত্মহিত কার্য্যে ব্রতী হন, তাঁহাদের আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়। শ্রুতিতে চতুর্থাশ্রমস্থ সেই লোক-দিগের এই ব্যবহারটি কথিত আছে যে তাঁহারা পুত্রের হিত, বিত্তের হিত ও লোকের হিতের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া ভিক্ষাচর্য্য করেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধ, প্রভৃতিকে যথার্থ জগতের হিতৈষী বলিয়া ধরিলেও, তাঁহাদিগকে ঐ আত্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বহুদূরবর্ত্তী বুঝিতে হইবে।

আমরা ঐ সকল আত্মজ্ঞানীদিগকেই জগতের শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া জানি। তাঁহাদিগকে লক্ষণদ্বারা চিনিয়া উঠা সুকঠিন ব্যাপার। তাঁহাদের একটি বিশেষ লক্ষণ আমাদের জানা আছে। যথা,—"কর্ত্তব্য-মস্তিচেৎ তত্ত্ববিন্ন সঃ"—যাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু থাকে তাঁহারা তত্ত্ববিদ্ নহে।

সেই তত্ত্ববিদ্দিগের মধ্যে কয়েকজনের নাম নির্দ্দেশ করা চাই। নব্যেরা যেমন বৈদিক যুগাদির বিভাগ করেন, আমাদের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। বশিষ্ঠ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাস, শুক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বহুসংখ্যক তত্ত্ববিদ্গণ, মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে উদ্ভূত; অতঃপর আমরা তাহার পরবর্ত্তী ব্রহ্মবিদ্গণের নাম করিব। সেই পরবর্ত্তী কালটির পরিমাণ যথা; বর্ত্তমান ৫০১৪ কল্যব্দ হইতে, পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক বা যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান অথবা শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ পর্য্যন্ত কল্যব্দ ৬৫৩ বৎসর বাদ দিলে বক্রী ৪৩৬১ বৎসর মনে করিতে হইবে। ইহাই প্রবল কলির বয়ঃক্রম। এই কালের ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের নাম করিতে হইলে শঙ্করাচার্য্য ছাড়া আর কাহারও নাম সাধারণের জ্ঞাত নাই। শঙ্করাচার্য্যের গুরু, গোবিন্দানন্দ ও তাঁহার গুরু গৌড়পদ আচার্য্য (যিনি শুকের শিষ্য বলিয়া খ্যাত) এবং হস্তামলক, শঙ্করাচার্য্যের সহিত এই চারিজনের নাম লইতে পারি।

ইহাদিগকে বর্ত্তমান সময়ের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহাদের পরে যোগবাশিষ্ঠ প্রণেতা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবেন। যোগবাশিষ্ঠে যে ভাবে মহাভারতীয় কথার উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতে উহা মহাভারতের পরবর্ত্তী সময়ে রচিত বুঝা যায়। শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থে যোগবাশিষ্ঠের নাম না পাওয়াতে তাহা শঙ্করাচার্য্যের পরে রচিত অনুমান করিতেছি। ফলতঃ এই সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত মত প্রকাশ করিতে পারি না। 'পরমার্থসার'-প্রণেতা শেষনাগ, এবং পঞ্চদশীকার ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য মোটে চারিজনকে শঙ্করাচার্য্যের পরে ও মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত ধরিতে হয়। যে বিদ্যাদ্বারা উহাদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহা বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়।

বেদ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, যথা—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ঝাড়া, ফুকা লৌকিক মন্ত্রগুলির যেমন কোন অর্থ করিতে হয় না—মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হয়, বৈদিক মন্ত্রও সেইরূপ। যাগাদি বিশেষ বিশেষ ব্যাপার সাধনে মন্ত্রের বিনিযোগ দেখা যায়। সভ্যেরা সেই সকল মন্ত্রের কুব্যাখ্যা করতঃ বেদের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, আবার তিনভাগে বিভক্ত যথা—বিধি, অর্থবাদ ও উপনিষৎ বা বেদান্ত।

যজ্ঞাদি সাধনের জন্য মন্ত্রগুলি ও মন্ত্র ব্যবহারের উপযুক্ত দ্রব্যাদি যেভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, ব্রাহ্মণের বিধিভাগে তাহার ব্যবস্থা থাকে। ব্রাহ্মণের অর্থবাদ ভাগের বিশেষ মূল্য নাই, উহা কেবল প্রশংসাদিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন পশ্চিমাঞ্চলে মূর্খ ও নির্ধন ব্রাহ্মণকেও "পণ্ডিত" বা "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করা হয়। তাহার পাণ্ডিত্যের বা রাজত্বের সহিত দেখাই নাই, অথচ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠত্ববাচক পণ্ডিত বা মহারাজ শব্দদ্বারা সম্মান করা মন্দকর্ম্ম নহে। বেদের অর্থবাদও সেইরূপ উপযুক্তার্থে প্রযুক্ত হয় না। উপনিষৎ বা বেদান্ত নামক ব্রাহ্মণের তৃতীয় অংশ

দ্বারা ব্রহ্ম নির্ণয় হইয়া থাকে, এজন্য উহাকে বেদের শিরঃ অথবা বেদের চরম এই অর্থে বেদান্ত বলে। মাণ্ডুক্য, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষৎগুলি বেদান্ত নামে খ্যাত। বেদব্যাস কতিপয় সূত্রদ্বারা উপনিষৎগুলির সূচনা করতঃ বেদান্ত দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহার নাম বেদান্তদর্শন, ব্রহ্মমীমাংসা বা উত্তর-মীমাংসা। শঙ্করাচার্য্য উহার যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা শারীরক ভাষ্য বলিয়া খ্যাত। বেদান্ত বলিতে, বেদের অন্তর্গত উপনিষৎ ভাগ বুঝিতে হয়। এতদ্ভিন্ন, বেদ নয় অথচ ঐ উপনিষদের ভাবাপন্ন স্মৃতিবাক্যগুলিও উপনিষৎ বলিয়া কথিত হয়। যথা মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতা, কূর্ম্ম-পুরাণের অন্তর্গত ঈশ্বরগীতা প্রভৃতি বেদান্তশাস্ত্রের অন্তর্গত তেমন শঙ্করাচার্য্যকৃত অপরোক্ষানুভূতি প্রভৃতি, যোগবাশিষ্ঠ, পঞ্চদশী এসকলও বেদান্তশাস্ত্রের অন্তর্গত।

এখন দেখিতে হইবে, শঙ্করাচার্য্যের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানে (ইণ্ডিয়াতে) তেমন ব্রহ্মবিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা? দিন দিন সাধু-সন্ন্যাসীর যেরূপ আধিক্য দেখা যাইতেছে, গৃহীদিগের মধ্যে তেমন মনুষ্য না পাইলেও—সাধু-সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে তেমন আত্মজ্ঞানীর বিলক্ষণ সম্ভাব থাকার আশা করা যায়। সদানন্দ যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার ও তাহার সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী নামক টীকাদ্বয় ঐসকল সাধু সন্ন্যাসীর দল হইতে উদ্ভূত। অন্ততঃ ঐ সদানন্দ যোগীন্দ্র ও টীকাকারদ্বয়কে তত্ত্ববিৎ বলিয়া ধরিতে বাধা নাই, এমন মনে হইতে পারে।

সাধু-মহলের ব্রহ্মজ্ঞান

লোকগণনাতে পাওয়া গিয়াছে, প্রায় তিনপোয়া কোটি লোক কেবল ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; ইহারা প্রায়

সকলেই ধর্ম্মের নিয়মদ্বারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে এমন ভাব দেখায়। ইহারা সাধু সংজ্ঞার অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে দণ্ডী স্বামী প্রভৃতি নামকরা সাধুরা লেখাপড়া জানে। সেই লেখাপড়া জানা সাধুদের প্রধান অবলম্বন, বেদান্তসার নামক পুস্তক। বেদান্তসার, সদানন্দ কৃত। ১৬০০ শকে তাহার একখানা টীকা হইয়াছে, এইরূপ টীকা অন্য একখানও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে অন্ততঃ তিনশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বেদান্তসার প্রচলিত ও সাধুমহলে পূজিত ধরা যাইতে পারে।

এখন বেদান্তসারের লেখাদ্বারা যদি তাহা ব্রহ্মবিদের রচিত নয় বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে সেই বেদান্তসারের অনুগত সাধুমহলের বিদ্যার দৌড় পরিমাণ করা যাইতে পারে। এজন্য এখানে বেদান্তসারের ৭২ ও ৭৩ প্রকরণে গুরুর নিকট হইতে যে ভাবে শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শিষ্যের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান সংক্রামিত হওয়ার প্রক্রিয়াটীর আলোচনা করা যাইতেছে।

উক্ত ৭২।৭৩ সংখ্যক কথার ভাব এই যে—

আমিই ব্রহ্ম এইপ্রকার ব্রহ্মানুভব ব্যাপারটি বলা যাইতেছে; এইরূপে গুরু তৎ ও ত্বং পদার্থ শোধনপূর্ব্বক মহাবাক্যদ্বারা অখণ্ডার্থকে বুঝাইয়া দিলে উপযুক্ত অধিকারী শিষ্যের, আমি নিত্য-শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাব, পরমানন্দ, অনন্ত, অদ্বয়-ব্রহ্ম, এইরূপ অখণ্ডাকারাকারিত একটী বিশেষ চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই চিত্তবৃত্তির মধ্যে চিৎপ্রতিবিম্ব নিপতিত বা সংযুক্ত থাকে। চিৎপ্রতিবিম্বযুক্ত সেই চিত্তবৃত্তি, প্রত্যগভিন্ন অজ্ঞাত পরব্রহ্মের অভিমুখ হইয়া, ব্রহ্মগত অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া ফেলে। তখন মূল অজ্ঞান নষ্ট হইলে সমস্ত কার্য্যকারণও নষ্ট হইয়া যায়। কাপড়ের সূতাগুলি পোড়াইতে পারিলে যেমন কাপড়ও পোড়ান হয়, সেইরূপ মূল অজ্ঞান ধ্বংসকরণদ্বারা

অজ্ঞানজাত সমস্ত প্রপঞ্চই নষ্ট হইয়া যায়। ইহার সঙ্গে ঐ যে নূতন চিত্তবৃত্তিটী উৎপন্ন হইয়াছিল তাহারও বিনাশ ঘটে তখন অবশিষ্ট থাকিল, উহাতে যে নূতন চিৎপ্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল তাহা মাত্র। সেই চিৎপ্রতিবিম্বও একক থাকিতে পারে না, রৌদ্রমধ্যেস্থিত প্রদীপপ্রভা যেমন রৌদ্রদ্বারা অভিভূত হইয়া বিনষ্ট হয়, তেমন ঘটে; বিশেষতঃ সেই চিৎপ্রতিবিম্ব যে নূতন চিত্তবৃত্তির মধ্যে প্রতিভাত ছিল, ঐ নূতন চিত্তবৃত্তি বিনষ্ট হওয়াতে সে থাকে কোথায়? দর্পণে যে মুখপ্রতিবিম্ব পড়ে, দর্পণ নষ্ট হইলে যেমন প্রতিবিম্বও থাকে না, মুখমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তেমন মূল অজ্ঞাননাশের সহিত চিত্তবৃত্তি, তাহাতে প্রতিভাত চিৎপ্রতিবিম্ব প্রভৃতি কিছুই থাকিতে পারে না এইভাবে, গুরুর নিকট হইতে শিষ্য মহাবাক্যোপদিষ্ট হইলে শিষ্যের মূল অজ্ঞান ও অজ্ঞানপ্রসূত সকলই বিলীন হইয়া যায়। তখন অজ্ঞানবিহীন ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাই শিষ্যের সত্তা হয়।

বুঝিলাম আমাদের দণ্ডী, স্বামী প্রভৃতিরা এই ভাবে "আমি নারায়ণ" অথবা "আমি শিব" এইরূপ হইয়া থাকেন। এইত হইল, সাধুমহলের ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি।

এখন আমাক বলিতে হইতেছে বেদান্তসার-রচয়িতা সদানন্দ অবশ্য এইরূপ ব্রহ্মবিদ্ হইয়াই বেদান্তসার প্রণয়ন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হন নাই; তিনিও ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, এবং তাঁহার মতানুযায়ী সমস্ত সাধু, সন্ন্যাসী, স্বামী প্রভৃতি সকলেই ভাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী বই নহেন। হেতু—

১। যোগবাশিষ্ট প্রভৃতি বেদান্তগ্রন্থে যে ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকে ও সেই অজ্ঞানই ব্রহ্মশক্তি, এবং তাহা হইতে জগৎপ্রপঞ্চ রচিত হয়, প্রভৃতি কথা বর্ণিত দেখা যায়, তাহার ভাব অন্যরূপ; ফলকথা ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। সদানন্দ উল্টা বুঝিয়াছেন।

২। ঐ যে নূতন চিত্তবৃত্তি উদিত হইয়া ব্রহ্মগত মূল অজ্ঞানকে বিনাশ করে বলেন, বেদান্তসারের টীকাকারেরা বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন, নূতন চিত্তবৃত্তিও সেই মূল অজ্ঞানেরই কার্য্য; অতএব কার্য্য হইয়া কারণকে নষ্ট করিবে কিরূপে? এজন্য তাঁহারা বুঝাইলেন ঐ নূতন চিত্তবৃত্তিত একা নষ্ট করিতে পারে না, তাহার সহিত যে চিৎপ্রতিবিম্ব থাকে, এই দুইয়ে একত্র হইয়া মূল অজ্ঞান নাশ করে। আমি বলি দুইয়ে একত্র হইয়াও পারে না। ঐ নূতন চিত্তবৃত্তি উদিত হওয়ার পূর্ব্বেও ত অন্যান্যের মধ্যে চিৎবিম্ব ছিল, সেত তখন মূল অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে পারে নাই, আর এই নূতন চিত্তবৃত্তিও নষ্ট করিতে অসমর্থা, ইহা তোমাদেরই স্বীকৃত। এখন ঐ দুটী অসমর্থ পদার্থ একত্র হইয়া যে পারিবে একথা বলিবার জন্য তোমাদের কি আছে?

৩। ধরিয়া লইলাম, ঐ নূতন চিত্তবৃত্তিও তৎস্থ চিৎপ্রতিবিম্ব যেন মূল অজ্ঞান নাশ করিতে পারে! তাহা হইলে, সদানন্দ যখন গুরুপদেশ পাইয়াছিলেন ও তাঁহার মধ্যে ঐ চিত্তবৃত্তি উদিত হইয়াছিল তখন অবশ্য সদানন্দের মূল অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল ও তৎসহ "তৎকার্য্যস্যাখিলস্য বাধিতত্বাৎ" অজ্ঞানের সমস্ত কার্য্য নষ্ট হওয়াতে সদানন্দের দেহও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে বস্ত্রের কারণ সূতা দগ্ধ হইলে তৎসহ যেমন কার্য্য বস্ত্রও নষ্ট হইয়া যায়, তেমন দেহাদিকার্য্য সদ্ভাবে মূল কারণ অজ্ঞান নষ্ট হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যদেহাদি নষ্ট না হইয়া পারে না। যদি বল, সদানন্দেরও দেহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তিনি ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত থাকিয়া দেহাদি কিছুই অনুভব করিতেন না, লোকে দেখিত তাহার দেহ বিদ্যমান রহিয়াছে। আচ্ছা; তাহা হইলে, সেই জড়বৎ উন্মত্তবৎ জীবিত দেহদ্বারা এই বেদান্তসার রচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সদানন্দ যখন বেদান্তসার রচনা করিয়াছেন "তৎকার্য্যস্য অখিলস্য বাধিতত্বাৎ"

(অর্থাৎ অজ্ঞানের সমস্ত কার্য্য নষ্ট হওয়াতে) তখন বুঝিতে হইবে সদানন্দ আসল কথা বুঝেন নাই।

যাজ্ঞবল্ক্যাদির ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হওয়ার পরেও যে তাঁহারা শিষ্যোপদেশ প্রভৃতি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের অজ্ঞানের সকলগুলি কার্য্য নষ্ট হইয়াছিল এমন কথা স্বীকৃত হয় না। সদানন্দের প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ঘটিলেও তিনি বেদান্তসার লিখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে এমন অজ্ঞোচিত কথা থাকিতে পারিত না।

আমরা শঙ্করাচার্য্য, বিদ্যারণ্য প্রভৃতির রচিত গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্ বলি, আর সদানন্দের বেদান্তসার পড়িয়া তাঁহাকে ভাক্ত ব্রহ্মবিৎ বলিতেছি কেন? ইঁহাদের কেইবা আমাদের মিত্র, কেইবা আমাদের শত্রু? সেইরূপ ইদানীন্তন বাবুরা যে ভাক্ত ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া কেহ মহর্ষি, কেহ পরমহংস, কেহ স্বামী উপাধি জারি করিতেছেন, কেহ বা "ব্রহ্মবিদ্যা" নাম দিয়া মস্ত মস্ত কেতাব বাহির করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কিছুমাত্র শত্রুতা নাই। তাঁহাদের প্রতি আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে তোমরা আপনারা ত মজিয়াছ—জগৎকে আর মজাও কেন? তোমাদের এই বিকট ব্রহ্মজ্ঞান লইয়া চুপ করিয়া থাকিতে কি পারিতেছ না?

সাধু মহালের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির আশা না করা সম্বন্ধে আমি আরও কিছু বলিতে পারি।

আমার পরিচিত ৺সোমনাথ ভট্টাচার্য্য নামক কোন ব্রাহ্মণ, পাটনা—বাঁকিপুরে অবস্থান করিতেন; তিনি দীর্ঘকাল নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া সাধু-সন্ন্যাসীর দলে ঘুরিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিস্তর কথা সংগ্রহ করতঃ আপন খাতাতে লিখিয়া লইয়াছিলেন। তাহা হইতে "সংজ্ঞা প্রকরণ" নামক প্রবন্ধ আমি নকল করিয়া লইয়াছি। তাহাতে জ্ঞানের সপ্তভূমির বর্ণনা রহিয়াছে। তন্মধ্যে

৪র্থ ভূমিকাতে উপনীত হইলে, ব্রহ্মবিৎ সংজ্ঞা হয়। ৫ম ভূমিতে ব্রহ্মবিদ্বর, ৬ষ্ঠ ভূমিতে ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান্ আর যিনি সপ্তম ভূমিতে পহুঁছিতে পারেন, তিনি যোগের চরমাবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহার আর ব্যুত্থান ঘটে না সুতরাং নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ পরমহংস হইয়া থাকেন। তাহাতেই তাঁহার সংজ্ঞা হয় ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ। এখানে বুঝিতে হয়, ব্রহ্মজ্ঞদিগের উৎকর্ষতা কিসে? উত্তর—যিনি যত দ্বৈতদর্শন হীন, তিনিই তত ব্রহ্মিষ্ঠ। শ্রুতিতে "এষব্রহ্মবিদাংবরিষ্ঠঃ" বলিয়া যে ভাবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা অন্যরূপ। "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।" শ্রুতি। আত্মাতে খেলা, আত্মাতে রতি অর্থাৎ সুখ, যাহার চলিতেছে, তাহাকে যথার্থ ক্রিয়াবান্ বলা যায়। ঈদৃশ আত্মজ্ঞই ব্রহ্মবিদ্দিগের বরিষ্ঠ। তিনি কাষ্ঠ প্রস্তরবৎ নিশ্চলই থাকুন অথবা উন্মত্তবৎ চলাফেরাই করুন, তথাপি তিনি ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠই থাকেন। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞদিগের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিই লক্ষ্য থাকে। সংজ্ঞা প্রকরণের লক্ষ্য—দ্বৈতদর্শনবিহীনতার প্রতি। এই ভাবটি সাধুদল হইতে সংক্রামিত হইয়া সাধারণ দলেও প্রবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে যদি বলা হয়, অমুক ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন, তাহা হইলে চতুর্দ্দিক হইতে প্রশ্ন উঠিবে,—তাঁহার কি বিষ্ঠা চন্দনে সমানভাব হইয়াছে? তিনি কি যার-তার অন্ন খাইতে পারেন? অথবা তিনি কি পাষাণবৎ অচল হইয়া চিরকালের জন্য রহিয়াছেন? ইত্যাদি। তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ? একথা কেহই জানিতে চাহিবে না; সকলেই দ্বৈতদর্শনাভাবের প্রতি লক্ষ্য করিবে। এসকল বাহ্য লক্ষণদ্বারা যে ব্রহ্মবিৎ চেনা যাইতে পারে না, আধুনিক সমাজে একথা বুঝে না।

শঙ্করাচার্য্যের পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যে হিন্দুস্থানে একজন ব্রহ্মবিৎ আবির্ভূত হ'ন নাই, এমন নির্দ্দেশ করাও উচিত হইবে না। আমি তেমন ২৩ জন লোকের দর্শন পাইয়াছি। তাহার একজন এই পুস্তকের উদ্দিষ্ট বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী।

পাঠকের আপত্তি

প্রথমবারের মুদ্রিত সিদ্ধ জীবনীতে "সিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কোন কোন পাঠক এই সমস্যা উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, লোকনাথ ব্রহ্মচারী যখন সিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন, তখন তদীয় গুরুর জন্য এই ভাবিয়া ক্রন্দন করিয়া ছিলেন "হে গুরো! আমি পার হইয়া আসিলাম, তুমিত পার হইতে পারিলে না, ইত্যাদি।" এতদ্দারা তদীয় গুরু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে কৃতকার্য্য হন নাই, বুঝিতে হয়। আর গুরু নিজে ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে শিষ্যকে জ্ঞানী করিতে সমর্থ কিরূপে হইবেন? ইহাতে ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া বুঝা যায়। প্রসঙ্গক্রমে ভূমিকার এই স্থলেই আমাদের একথার উত্তর দিতে হইতেছে।

সাধারণের ধারণা আছে, প্রায় সকলেই আস্তিক, কদাচিৎ দুই একজন নাস্তিক জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে; শাস্ত্রীয় ভাব ইহার বিপরীত। আস্তিকতা একমাত্র ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক গুণ; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের স্বভাবজাত গুণের মধ্যে আস্তিকতার নাম নাই। অতএব বুঝিতে হয়, এখন যে সকলেই সকলকে আস্তিক মনে করে, তাহা ঠিক নহে। যে ব্রাহ্মণবর্ণের জন্য আস্তিকতা স্বাভাবিক বলা হইল, কলির যুগধর্ম্ম এখনকার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও সেই আস্তিকতার বিকাশ দেখা যায় না। যাহাদের মধ্যে আস্তিকত্ব নিহিত রহিয়াছে, সদ্‌গুরুর সাহাযো সেই আস্তিকতা ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হইতে পারে। অন্যদিগের পক্ষে তেমন আশারও স্থল নাই। তাহারা গভীর গবেষণা করিয়াও আস্তিকতা লাভ করিতে পারে না,—ব্রহ্মজ্ঞান ত দূরের কথা। ব্যক্তিগত বুদ্ধির পরিচালনে সমস্তই নশ্বর দেখা যায়। যাহাদের মধ্যে আস্তিকতা নিহিত থাকে, তাহারা, ক্ষয় বৃদ্ধিরূপে বা অন্যভাবে অপরিবর্ত্তনীয় সত্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে। তাহার পরে যদি

জগতের সমস্তই অনিত্য বা অসৎ এবং সেই একটী বস্তু মাত্র নিত্য বা সৎ, এই তত্বটী বিশ্লেষণ (Analyse) করিয়া লইতে সমর্থ হয়, তবে তাহার নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বা সদসৎ বস্তু বিবেক হইয়াছে বলা যায়। তখন তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী গুরুর অনুগ্রহে সেই আস্তিকতাপ্রসূত নিভাজ সত্য বস্তুটী ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে সমর্থ হয়। এতাদৃশ বোদ্ধাকে জ্ঞানী অর্থাৎ পরোক্ষ ব্রহ্মবিৎ বলা যায়। গুরুর সাহায্যে শিষ্য এতদূর পঁহুছিতে পারে। বর্ণিত পরোক্ষজ্ঞানী ব্যক্তি, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন নামক ব্যাপার বিশেষের বলে সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্য বস্তুকে যদি **আমি** বলিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইল বলা যায়। এখানে আস্তিকতা, জ্ঞান বা পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান এবং বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান এই তিনটী কথার ব্যাখ্যা করা হইল। সাধারণ বুদ্ধিতে এই ভাবের বিজ্ঞানী বা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানীকেই চরম বুঝা যায়। কারণ, জীব যখন সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্য বস্তুকে **আমি** করিল, তখন আর তাহার কি অবশিষ্ট থাকিবে? এজন্যে সাধারণে মনে করে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ এবং বিষ্ঠা-চন্দন সমান; এক কথাতে বলিলে ব্রহ্মজ্ঞানীরা কাষ্ঠ ও পাষাণ সদৃশ। ব্রহ্মজ্ঞ-দিগের সম্বন্ধে এতাদৃশ ধারণা সাধারণেরা পোষণ করিলেও আমরা অন্যরূপ জানি। শাস্ত্রের সহ মিলাইয়া বুঝিতেছি যে অপরোক্ষ ব্রহ্মবিৎ সর্ব্বদা "আমি ব্রহ্ম" এই ভাবে থাকেন না; ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাকে পূর্ব্বাবস্থাতে ফিরিয়া আসিতে হয়। তাহাতেই কথিত আছে—

"বহুজন্ম দৃঢ়াভ্যাসাৎ দেহাদিষ্বাত্মধীক্ষণে।
পুনঃ পুনরুদেত্যেব জগৎ সত্যত্বধীরপি॥"

পঞ্চদশী।

অনাদিকালযাবৎ জন্মে জন্মে যে আমি দেহ ও জগৎ সত্য এই বুদ্ধিতে চলা হইয়াছিল, সেই অভ্যাসের বলে ক্ষণে ক্ষণে দেহ ও জগৎ ভাব উদিত হইয়া থাকে।

তাহাতেই ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার পরেও দেহাদি ভাবে প্রত্যাগত হইতে এবং অনেককে জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিতে দেখা যায়। এ সকল কথা সাধারণদিগের বোধগম্য হইবার নহে। যদি অপরোক্ষ জ্ঞানেই সকল শেষ হইত, তাহা হইলে অপরোক্ষ জ্ঞানের ভাব জগতে প্রচারিত থাকিত না; তেমন জ্ঞানী আচার্য্যও হইত না, অপরোক্ষ জ্ঞানের তত্ত্ব সেই জ্ঞানীর সঙ্গেই জগতের বহির্ভূত হইত। তাদৃশ জ্ঞানীদের পুনঃ পুনঃ দেহ ও জগদ্ ভাব সংঘটিত হওয়াতেই তাঁহারা গুরুগিরি করিতে ও শিষ্যের জ্ঞানলাভ করাইতে সমর্থ হন। মীমাংসকেরা বলেন ব্রহ্মজ্ঞান হইলে যে মুক্তি এক সময়ে হইবে তাহা অবধারিত হয়; কিন্তু কতকাল কতজন্ম পরে তাঁহার নির্ব্বাণ ঘটিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর গুরু সাংখ্য বিচার সহকারে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, লোকনাথ কর্ম্মযোগ দ্বারা সেই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া দেখিলেন, গুরুদেব শিষ্যোপদেশাদি উপলক্ষে ব্রহ্মভাব হইতে নামিয়া আসিয়া অনেক সময় দেহভাবে অবস্থান করেন; নিজে নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার আস্বাদে এত বিভোর হইয়াছিলেন যে গুরুর তাদৃশ বহির্ম্মুখতা তাঁহার তৎকালে অসহনীয় হইয়াছিল। তাহাতেই গুরুর জন্য কান্দিয়া ফেলিলেন। ইহাতে গুরুর যে জ্ঞান ছিল না এমন মনে করা পাঠকের উচিত নহে।

একশ্রেণীর পাঠকেরা বলেন—পুস্তকে ব্রহ্মচারীর ব্যবহার যতদূর বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কোন কোনটাকে সাধুজনানুষ্ঠিত মনে করা যায় না। তেমন কার্য্য করিতে ধর্ম্মভীরু সাধারণ মনুষ্যও কুণ্ঠিত হন। আমরা একথা স্বীকার করিয়া বলি, তাহাতে পাঠকের ক্ষতি কি?

অবশ্য উত্তর পাইব যে লোকে মহতের চরিত্রের অনুবর্ত্তন করিবে, এই পুস্তকের লিখিত ব্রহ্মাচারী চরিত্রের অনুকরণ করিতে গেলে সমাজ নষ্ট হইয়া যায়। এখনকার সভ্যেরা নাটক নভেল লিখিয়া লোকের চরিত্র গঠন জন্য আদর্শ চরিত্র প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাহা পাঠ করিয়া সভ্য ও সভ্যারা আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হয়। লোকের অনুসরণ করার জন্য ব্রহ্মচারীর চরিত্র বর্ণিত হয় নাই। শাস্ত্রে উন্মত্ত মহাদেবের বিকট ব্যবহার ও বিষ্ণুর ছলাচরণ বিবৃত রহিয়াছে। মনুষ্যেরা তেমন অভিনয় করুক, শাস্ত্রের এ উদ্দেশ্য নহে। তবে জ্ঞানবানেরা অনেক সময়ে বিরুদ্ধাচরণ করেন কেন, একথার উত্তর আমরা দিতে পারি। এখনকার মনুষ্যদিগের মধ্যে নাস্তিকতা ও অবৈদিক ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের দৃষ্টি পরকাল পর্য্যন্ত যায় না; তাহারা ঐহিক সুখ ও উন্নতিকেই চরম জানে, কাজেই তাহারা পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গঠন করতঃ আত্মতৃপ্তি করিতে চায়। প্রকৃত ধার্ম্মিক হিন্দু, ইহকালের কার্য্যদ্বারা পরকাল গঠন করার অভিলাষী। তাহারা ঐহিক স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া স্বর্গলাভের যত্ন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারীর মত জ্ঞানীরা ইহার কিছুই চাহেনা। অথচ পূর্ব্বসংস্কারদ্বারা প্রারব্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, কর্ম্মফলের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ নাই। এজন্য জ্ঞানবান্‌দিগের কর্ম্ম—পুণ্য বা পাপ বা উভয় মিশ্রিত হয় না। জ্ঞানবানেরা সেই কর্ম্মের ফল ভোগও করেন না। "কর্ম্মাশুক্লকৃষ্ণং যোগিণাম্ ত্রিবিধ-মিতরেষাম্।" পাতঞ্জলযোগসূত্রং। যোগীদিগের কর্ম্ম পাপ ও পুণ্যের বহির্ভূত কিন্তু অন্যেরা যে সকল কার্য্য করে তাহা পাপ, পুণ্য ও উভয় মিশ্রিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মচারীর ন্যায় জ্ঞানী পুরুষদিগের চরিত্র যেমন সাধারণের অনুকরণীয় নহে, তেমন তাঁহারা একজনকে যে কথা উপদেশ করিয়াছেন, অন্যের তাহা গ্রহণীয় নয়। তিনি এক সময়ে আমার

সম্বন্ধে কাহাকে জানি বলিতেছিলেন,—"পাত কাটিয়া ভাত খাইও বাসন করিও না; করিলে নিত্য মাজিতে হয় ও চোরের ভয়ে আশঙ্কিত থাকিতে হয়।" আমি এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমার এই উপদেশ পাওয়ার পূর্ব্বে যাহারা বিবাহ করিয়া বসিয়াছে, তাহারা কি বিবাহ ফেরত দিবে? তিনি বলিলেন—"তাহাদের জন্য এই উপদেশ নহে।" আমি বুঝিলাম, কেবল তাহাদের জন্য কেন, সাধারণের জন্যও এই উপদেশ নহে; তাহা হইলে যে বিবাহ নামক পবিত্র সংস্কার সমাজ হইতে উঠিয়া যায়। যাঁহারা সাধুদিগের কথা বা উপদেশ সংগ্রহ করিয়া লোক মধ্যে উপদেশামৃত বর্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ত্তৃক এই সকলের বাহুল্য প্রচারকে বিষ বর্ষণ বলা যায়। সমুদ্র মন্থনে কালকূট বিষ উত্থিত হয়। তদ্দারা জগদ্ দগ্ধ হইতেছিল। কেহই সেই দাহ নিবারণ করিতে পারেন নাই; রুদ্র সেই বিষ পান করিয়া লোক রক্ষা করিয়াছিলেন। কেহ মহাদেবের এই কার্য্য উল্লেখ করিয়া স্তব করাতে রুদ্র বলিলেন—"ন বিষংবিষমিত্যাহুঃ সংসারোবিষ মুচ্যতে।" বিষ, বিষ নহে, সংসারই বিষ। তাই বলিয়া কি সকলের পক্ষে সংসার ছাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ান উচিত? রুদ্র জ্ঞানী বা যোগী; তিনি সংসারকে বিষ মনে করিয়া শ্মশানবাসী হইয়াছেন, তুমি আমি কি তাঁহার চরিত্রের অনুসরণ করিতে পারি? আমরা মুক্ত পুরুষদিগের চরিত্র অনুসরণ করিয়া বা কথা শুনিয়া সেইরূপ হইতে পারিনা; তথাপি তাহা আলোচনা করতঃ আপনাদের উপযোগী পন্থা রচনা করার সুবিধা পাইতে পারি।

আর এক শ্রেণীর পাঠকেরা বলেন, ব্রহ্মচারীর বিবরণ যেভাবে লেখা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার গুরুত্বের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। এই শ্রেণীর লোকেরা বোধ হয় ব্রহ্মচারীকে একজন অবতার দাঁড়া করিয়া নিজেরা পারিষদ সাজিয়া সমাজে পূজা পাইতে চান। আমি পুস্তক লিখিয়া তাঁহাদের সহায়তা করি নাই বলিয়া খেদ হইয়া থাকিবে।

ব্রহ্মচারীকে যাঁহারা বড় করিয়া তুলিতে যত্ন করিয়া ছিলেন তাঁহাদের প্রতি তিনি যে উক্তি করিতেন এখানে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে। আমরা যেমন দশজনের মধ্যে মান্যগণ্য ও আদৃত হওয়ার জন্য লালায়িত, ব্রহ্মচারীর মত মনুষ্যেরা, জগতের বহিভূ´ত নিত্য সত্য নির্ব্বিকার সেই বস্তুকে **আমি** করাতে বিক্ষেপ অবস্থাতেও এসকল ভাল বাসিতে পারেন না। তাঁহারা সেইদিকের কথা পাইলে তুষ্ট হন। রোগ মুক্ত হওয়ার জন্য একজন ব্রহ্মচারীকে বিশেষ ত্যক্ত করাতে তিনি বলিলেন—"আমি ডাক্তার কবিরাজ নহি,—ভবরোগের বৈদ্য; কই ভবরোগ দূর করিতে ত কেহ আমার নিকট আইসে না?"

অন্য একজন অর্থী ব্যক্তিকে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি যে আসিয়া আমাকে এত করিয়া ধরিলে, কে তোমাকে আমার প্রতি এইভাবে লেলাইয়া দিয়াছে? লোকটা উত্তর করিল—"আমি ঢাকাতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গিয়াছিলাম, তিনি আপনার জহুরার কথা (অমানুষিক ক্ষমতার কথা) বর্ণনা করতঃ আপনার নিকট আসিতে উপদেশ দিয়াছেন।" তচ্ছ্রবণে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তিনি যে আমাকে বড় করিতেছেন, ইহার মতলব জান কি? না বুঝিয়া থাকিলে শুন,—আমাকে জহর করিয়া তুলিতে পারিলেই তিনি জহরি হইতে পারেন।" জহর অর্থ মণি মাণিক্য। জহরি অর্থ রত্ন ব্যবসায়ী। গোস্বামী যদি আমাকে (ব্রহ্ম-চারীকে) রত্ন করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে, নিজে রত্ন পরীক্ষকের পদ পাইতে সমর্থ হন। অধুনা অমুক ব্যক্তি অবতার, অমুক ব্যক্তি মহাপুরুষ, এই কথা প্রচার করার জন্য শত শত মনুষ্য দলবদ্ধ হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য কি? জগদুদ্ধার; না, নিজেরা মহাপুরুষের সমকক্ষ তাই সেই অবতারকে চিনিতে পারিয়াছেন, অতএব লোকে আমাদিকে ঐ অবতারের পারিষদ্ বলিয়া পূজা করুক? এই সকল কথা আলোচনা করিলে বুঝা

যায়, লোকনাথ ব্রহ্মচারী এইভাবে পূজা পাওয়া ভাল বাসিতেন না। আমরাও পুস্তক লিখিয়া ব্রহ্মচারীকে সাধারণের পূজ্য করতঃ তৎসঙ্গে নিজেরা পূজা পাইব এমন আশা করিনা।

এখনকার সমাজ, যাহা ভাল, উন্নতি ও ধর্ম্ম বলিয়া জানে, শাস্ত্রদৃষ্টিতে তাহা— মন্দ, অবনতি এবং অধর্ম্ম। আমরা সেই সমাজের নিকটে ব্রহ্মচারীকে উপস্থাপিত করিয়া দেখাইতে চাই, যে তোমরা যাদৃশ লোকের আস্তিত্বের ও সম্ভাবনা কর না, তেমন লোকও দুনিয়াতে পাওয়া যায়। তোমাদের বুদ্ধির দৌড় যতদূর যাইতে পারে, তাহার মধ্যে ব্রহ্মচারীর মত জ্ঞানীপুরুষের স্থান নাই। তাহাতেই তোমরা এই শ্রেণীর লোককে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছে এবং ইহাদের ব্যবহারে সায় দিতে পারিতেছ না। তোমরা আপনাদের অবস্থাকে যতই উন্নত মনে করনা কেন, তাহাদ্বারা শাস্ত্রীয় জ্ঞানীরা তোমাদের অনুসরণ করিতে পারে না। তোমরা যে ইঁহাদের কার্য্যকলাপে আপত্তি করিবে, তাহা নূতনও অস্বাভাবিক নহে ;—তোমরা দেখিতেছ জগৎকে ; ইঁহারা দেখিতেছেন, জগৎ ছাড়া সেই অবিকৃত নিত্য সত্য বস্তুকে। এজন্য কথিত আছে—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাংজাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ ॥

গীতা।

সমস্ত প্রাণীর দৃষ্টি যেখানে যায় না, সংযমী তাহাই দর্শন করিতেছেন সেই চক্ষুষ্মান্ মুনি যাহা উপেক্ষা করেন সুতরাং যেদিকে তাকান না অর্থাৎ যাহা তাঁহার নিকট রাত্রিস্বরূপ, তাহাতে প্রাণিগণ বিচরণ করিতেছে। সাধারণ জীবের ও যথার্থ দর্শনশীল জ্ঞানীর ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ।

আমরা শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া সাধারণ মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত অথচ শাস্ত্রচক্ষুষ্মান্ মুনির গম্য, কোন অবস্থার অস্তিত্ব

জানিতে পারি। যাঁহাদের শাস্ত্র-চক্ষু নাই কেবল চর্ম্ম-চক্ষুদ্বারা তথ্য নিরূপণ করিতে হয়, তাহারা সেই অবস্থা সম্বন্ধে অন্ধ। সেই অন্ধেরা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ঈশ্বর বা ভগবান্ নামক জগৎপিতা, সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উপাস্য বিশেষের কল্পনা করিতে পারে ; তত্ত্ব নির্ণয় করা ইহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। এজন্য সাধারণ মনুষ্যরা পরমার্থ তত্ত্বের অনুপযুক্ত। শত চেষ্টা করিয়াও কেহ পরমার্থকে সাধারণের গম্য করিতে পারে না। সাধারণ বুদ্ধিতে পারমার্থিক ব্যাপারের প্রতি চিরকাল আপত্তি চলিবে।

আমাদের অভিপ্রায়

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেশশুদ্ধ মনুষ্য লোকনাথ ব্রহ্মচারী হউক অথবা পরোপকারের বাহানাতে চাঁদা আদায় করিতে থাকুক, কিম্বা বেদান্ত পড়িয়া স্বামীজী সন্ন্যাসী ঠাকুর সাজুক, আর না হয়, লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নামে কোন নূতন দল সৃষ্টি হউক, ইহার কিছুই আমাদের অভিপ্রেত নহে।

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের দিনাবধি কলিযুগ প্রবল হয়ে উঠে; তদ্দর্শনে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্য ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। তাহারও সহস্রাধিক বৎসর পরে বর্ত্তমান সময়ের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিয়া কলির যুগধর্ম্ম একাচার প্রচারের জন্য বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নাস্তিক মত প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে তর্কের ছড়াছড়ি ঘটিত। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি দার্শনিক তর্ক যুক্তির প্রভাবে হিন্দুস্থান হইতে ঐ নাস্তিক মত বিদূরিত করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর মায়ামোহ অংশ, কলিযুগে বুদ্ধাদি নামে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম লোপ করিয়া থাকে, একথা শাস্ত্র পাঠে জানা যায়। এখন সেই বুদ্ধাবতারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি লোক সমাজে অবতীর্ণ

হইয়া কলিচররূপে নানা কৌশলে নানা বৈদিক ধর্ম্ম ঢাকিয়া কলিধর্ম্ম (নাস্তিকতা) প্রচার করিতেছে। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে ইহারাই ভিন্ন ভিন্ন নামে জন্মগ্রহণ করতঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বৈষ্ণব মত সকল প্রবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে। ইহারা যে উপায়ে শঙ্করাচার্য্যাদি কর্ত্তৃক দৃঢ়কৃত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ঢাকিবার যত্ন করিয়াছে, তাহার নাম অন্ধভক্তি। তর্কযুক্তি ও জ্ঞানের পথগুলি অন্ধভক্তির বিরোধী। এজন্য ভক্ত-বিটলেরা জ্ঞান তর্ক প্রভৃতির কথা শুনিলে দুই হাতে কাণ ঢাকিয়া প্রস্থান করে। তাহাদের অভিনয় দেখিয়া অজ্ঞেরা ধরিয়া লয় ধর্ম্ম করিতে হইলে কোনরূপ তর্ক যুক্তি শুনিতে নাই, নিরীহ অধম নাচার (passive) ভাবে পড়িয়া থাকিলেই আপনা আপনি ধর্ম্ম হইবে। সেইজন্য শাস্ত্রানুসন্ধান বা নিত্য নৈমিত্তিকাদি ধর্ম্মকার্য্য করা অনাবশ্যক। তাহারা মনে করে আমি যাহা বিশ্বাস কল্পনা বা ধারণা করিয়া চলিব, আমার মনঃকল্পিত সেই বিশ্বাসই আমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। এজন্য এখনকার প্রত্যেক ধার্ম্মিক মনে মনে এক একটী ধারণা পোষণ করতঃ তাহারই সেবা করিয়া পরকালের জন্য নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। উহারা যাহাদের কথা শুনিয়া বা বই পড়িয়া এইরূপ বিশ্বাস গঠন করে, তাহারা যে উল্টা বুঝিয়াছে একথা টের পায়না। তাহারা এখনও মনে করে ধর্ম জগতে যেন স্বাভাবিক ভাবই চলিতেছে। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রস্থানের পর হইতে ধর্মরাজ্যে যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, অধর্ম্ম যে ধর্ম্মের আসনে বসিয়াছে, কলি যে আমাদের মতিভ্রম ঘটাইয়া আমাদিগকে পাপ পথে পরিচালিত করিতেছে, অসত্যের জয় ও সত্যের যে ক্ষয় ঘটিতেছে, ইহা অন্যেরা না দেখিলেও আমরা দেখিতেছি। কলিযুগের ইহাই নিয়ম, এবং আরও ৩/৪ লক্ষ বৎসরকাল কলি যে জগত শাসন করিবে, ইহাই আমরা জানি। অথাপি আমরা হাল ছাড়িতে, ঢেউ দেখে কুলে নাও ডুবাইতে চাইনা।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সহস্র বৎসর পরে কলি, শূদ্রকুলে নন্দরাজা নামে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে পরশুরামের ন্যায় নিঃক্ষত্রিয়া করতঃ শূদ্ররাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী অশোক প্রভৃতি শূদ্র রাজারা, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বৌদ্ধাদি নাস্তিক মতের পক্ষপাতী হইয়া নাস্তিক মত প্রচারের সহায় হইয়াছিল; তথাপি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিলোপ করিতে পারে নাই। কলির অধিকার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকিবেন এবং কলির হীনপ্রভ ব্রাহ্মণগনই আগামী সত্যযুগের প্রভাশালী ব্রাহ্মণদিগের জন্মদাতা হইবেন; ইহাও শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। এজন্য আমরা কলির সহিত যুঝিয়া আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে চাই। যে সকল মনুষ্য কলির বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা যে আমাদের কথা গ্রহণ করিতে পারিবে না, ইহা আমাদের জানা আছে। লোকগুলি কলিচরদিগের প্ররোচনাতে ভুলিয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া লইতেছে দেখিয়া আমরা চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

এইক্ষেত্রে আমরা লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দেখাইতে চাই যে, তোমরা মনঃকল্পিত যে এক এক রূপ ধারণা পোষণ করিয়া পার পাইতে চাও, তাহা ত হইবে না। অন্ধভক্তির ফাঁকি হইতে অন্ততঃ ব্রাহ্মণদিগের আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

আমরা যে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, পরোক্ষ ব্রাহ্মজ্ঞান, অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলির অবতারণ করিলাম, তাহা সাধারণ লোকেরা অনুষ্ঠান করুক, এই অভিপ্রায়ে নহে;—লোকেরা বুঝুক ঈশ্বর ভগবান বলিয়া অন্ধভক্ত (passive) হইয়া পড়িয়া থাকা অপেক্ষা খুব উচ্চ কিছু রহিয়াছে। সেইদিকে লক্ষ্য করা প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের কার্য্য ছিল। এখনকার ব্রাহ্মণাদির সেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া উচিৎ নহে।

সেই লক্ষ্যকে অবলম্বন করিতে পারিলে কালে নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকলই লাভ করা যায়। আমরা চাই, এই সকল আলোচনা করিয়া লোকের মতিগতি ফিরিয়া যাউক। হিন্দুরা বুঝুক, যাহারা শস্তাতে ও প্রেমেতে ধর্ম্মপথে চালাইতে চায় তাহারা প্রান্তরমধ্যস্থ কাণাহুলার ন্যায় আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করার জন্য দিগ্‌ভ্রম ঘটাইতেছে।

যাহারা আমাদের এই মারাত্মক দুরবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে, তাহারা "যে বলে রাম, তার সাথে যাম", করিতে পারিবে না। বুঝিয়া শুনিয়া নিজের গন্তব্য স্থির করিতে যত্ন করিবে। তাহাদের বিবেচনা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার একটা ছবি আঁকিয়া দেওয়া হইতেছে।

১। আমি (সাধক) আস্তিকতা সহকারে মাতৃগর্ভে আগমন করিয়াছি কি না? কলিতে আস্তিকতার ভাণকারী নাস্তিকের সংখ্যাই অধিক; তাহাদের মধ্য হইতে যথার্থ আস্তিকদিগকে বাছিয়া লইতে হইবে। আমার অন্তর্নিহিত জন্মগত লুক্কায়িত ভাবটী যথার্থ আস্তিকতা কি না, ইহা আস্তিকতার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার সহিত মিলাইয়া স্থির করা যাইতে পারে। অতএব তেমন করিয়া আমি স্বভাবতঃ আস্তিক কি নাস্তিক, ইহার একপক্ষ নির্দ্ধারণ করিব।

২। বুঝিলাম যেন আমি আস্তিক। এখন দেখিতে হইবে আমার অন্তরের বল কিরূপ রহিয়াছে। তদ্দ্বারা আমার নিষ্ঠা কোন্ পথে ধাবিত, তাহা স্থির করিতে হইবে। "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা, পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।" গীতা। কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠা, এই দুয়ের মধ্যে আমি কর্ম্মনিষ্ঠ কি জ্ঞাননিষ্ঠ? কর্ম্মনিষ্ঠ যখন প্রবল বুঝিতেছি, তখন জ্ঞানালোচনা করিয়া আমার বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নহে। কলিযুগে অল্প মাত্রাতে কর্ম্ম করিয়া অধিক ফললাভ করা যায়। সেই অল্প মাত্রাটা

কিরূপ তাহা অবধারণ করার জন্য প্রথমে ড্রীল করার মত নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিতকর্ম্ম আরম্ভ করা যাউক। যদি বুঝা যায়, কর্ম্ম করিতে অপ্রবৃত্তি আসিয়া পড়ে, জ্ঞান বিচারই আমার ভাল লাগে, তদ্দারা আমাকে সাংখ্য-নিষ্ঠ স্থির করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কপিল সাংখ্যাদি দর্শনের আলোচনা করিতে হইবে, কিন্তু বেদান্ত পাঠ বা বিচার প্রথমে কখনই উচিত নহে।

৩। স্থির করিতে হইবে, আমার কর্ম্মনিষ্ঠা কি জ্ঞাননিষ্ঠা রহিয়াছে। একথা স্থির করার জন্য সজ্জনদিগের সঙ্গ ও সিদ্ধমহাপুরুষদিগের জীবনচরিত পাঠ করিতে হইবে। সৎ কে? অধুনা সকলেই ত আপনাকে সৎ বলিয়া লোক মধ্যে প্রচার করিতে যত্ন করিতেছে। সৎ চিনিব কি করিয়া? উত্তর,—আমার নিকট, আমার পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ সৎ। তাঁহারা পুরুষ-পরম্পরার অনুসরণে যে সকল আচরণ করিয়াছেন, তাহাই আমার পক্ষে সদাচার। সেই সদাচার ধরিয়া চলিলে আমার দোষ হইবে না, তাহাই সজ্জনের সঙ্গজনিত ফলস্বরূপ ধরিতে হইবে। শাস্ত্রেও ইহা পাওয়া যায়, যথা—"যেনাস্য পিতরোযাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্নদুষ্যতি।" যে পথে পিতারা গিয়াছেন, যে পথে পিতা পিতামহেরা চলিয়াছেন, তাহা ধরিয়াই সৎদিগের পথ অনুসরণ করিতে হয়; তেমন করিলে কোন দোষের আশঙ্কা নাই।

৪। ধর্ম্মপথে চালাইবার জন্য যাহারা আমাকে বিশেষ টানাটানি করিতেছে, উত্তম প্রলোভন দেখাইতেছে, তাহাদিগকে কলিচর বুঝিতে হয়। লোকদিগকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া কলির পাপপথে পরিচালিত করার জন্য কলিচরেরা ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া কুলি সংগ্রাহক আরকাটি বা বীমা কোম্পানীর এজেন্ট কিম্বা মোকদ্দমা জুটাইবার টর্নিদিগের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া

থাকে। তাহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা চাই।'

৫। ব্রহ্মচারীর জীবনবৃত্তান্তে দেখা যায়, লোকনাথ জন্মান্তরীয় সুকৃতিসহকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার মাতা অন্যান্য পুত্রদিগকে ব্রহ্মচারী করার বেলায় আপত্তি করিলেন, কেবল লোকনাথেরই জন্মমাত্র তাঁহাকে ব্রহ্মচারী করিয়া দিতে কহিলেন। ব্রহ্মচারীর ভাবী জীবন সম্বন্ধে অনেক সূচনা যেমন পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছিল, আমি জন্মান্তরীয় সুকৃতিশালী হইলে তেমন কোন না কোন লক্ষণ আমাতে ও পাওয়া অসম্ভব নহে; সেই দিকে ভালরূপ খেয়াল করিয়া বুঝিতে হইবে; তবে ত আমি সহজে পুণ্যের পথে চলিতে পারিব।

৬। প্রথমেই ধর্ম্মের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করার যত্ন করিতে হইবে না। অনেক দল, এক লম্ফে বৃক্ষের চূড়ায় আরোহণের ন্যায় প্রথমেই ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া বসাতে যে দশায় পড়িয়াছে, আমার যেন তেমন না ঘটে। অতি অল্পধর্ম্ম হইলেও ধর্ম্মের যে অঙ্গ আমার সহজসাধ্য, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব। লোকের দেখাদেখি ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ কথা লইয়া নাড়াচাড়ি করিতে যাইব না। ধর্ম্ম খামখেয়ালি বস্তু নহে; ধর্ম্মের তত্ত্ব চিরকাল গুপ্ত রহিয়াছে।

ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রচার

কলিচরেরা সমাজ মধ্যে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছে তাহা যে অধর্ম্ম একথা বুঝিতে পারিলে মনুষ্য, সতর্ক হইয়া হিসাব করিয়া পাদ-ক্ষেপ করিতে পারিত। ধর্ম্ম বলিয়া যদি বাঁধা কতকগুলি বিষয় থাকিত তাহা হইলে এত গোলযোগ হইতে পারিত না। সেই ধর্ম্মের মূল, এই ভাবে কথিত হয়—"বেদ প্রণিহিতোধর্ম্মোহধর্ম্মস্তদ্‌বিপর্য্যয়ঃ।" অর্থাৎ যাহা বেদে বিহিত হইয়াছে তাহাই ধর্ম্ম, তাহার বিপর্য্যয় অধর্ম্ম।

এখন বেদ বিলুপ্ত, স্মৃতি অনাদৃত; ধর্ম্ম বুঝিবার তৃতীয় পন্থা সদাচার। ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে প্রাচীন পুরুষদিগের পুরুষ পরম্পরাগত বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান গুলিকে সদাচার বুঝিতে হয়। আমাদের পক্ষে তাহাই ধর্ম্মের নিদর্শন। এখন ভাবিয়া দেখ, সেই প্রাচীন সদাচারের বিপরীত করা এখনকার ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিনা? পুরিতে গিয়া জগন্নাথ দর্শন ও বার জাতিতে মিলিয়া প্রসাদ ভক্ষণ, একটী প্রধান ধর্ম্মকার্য্য হইয়া উঠিয়াছে; তাহার পরে তথাকার ভাত শুকাইয়া আনিয়া পাণ্ডারা আমাদের মুখে গুঁজিয়া দিতেছেন। ইহাও নাকি ধর্ম্ম? জগন্নাথ যে বুদ্ধাবতার সুতরাং নাস্তিক, একথাই বা কে না জানে। এতকাল ভাল ব্রাহ্মণেরা জগন্নাথের প্রসাদ খাইতেন না। নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গদেব তথায় গিয়া ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতকে ভুলাইয়া সেই প্রসাদ খাওয়াইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে কত বাহবা রহিয়াছে।

ভগবদ্‌গীতাতে সাংখ্য বা জ্ঞান এবং কর্ম্মযোগে বা যোগ মোটে এই দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা বর্ণিত হইয়াছে। ভজ্‌ধাতু হইতে ভক্তি শব্দ হইয়াছে। জ্ঞানের নাম পরাভক্তি বলিয়া গীতায় পাওয়া যায়; তদ্দারা কর্ম্মযোগকে অপরা ভক্তি বুঝিতে হয়। কলিচরেরা এ সকল ঢাকিবার জন্য ভক্তিযোগ বলিয়া বিচার বিরহিত অন্ধভাবকে লোক মধ্যে প্রচার করিতেছে। না বুঝিয়া, না জানিয়া, খামখেয়ালি রকম নাম বিশেষ লইয়া মাতামাতি করা সেই ভক্তির লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। দলবদ্ধ হইয়া এরূপ অনুষ্ঠান করিতে বেশ মজা লাগে, লোকগুলি তাহাতেই মত্ত হইতেছে, ইহাও নাকি ধর্ম্ম। শাস্ত্র বিচার করিলে এসকল কার্য্যকে স্পষ্ট অধর্ম্ম বলিয়া ধরা যায়। শাস্ত্র মতে লৌকিক ভাষাতে দেবতার স্তব করিতে নাই; সংকীর্ত্তনে সেই নিষিদ্ধ ভাবেই বিষ্ণুর স্তব করা হইয়া থাকে। আধুনিকেরা সংকীর্ত্তনের

দল বাঁধিয়া তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছে। এতদূর তলাইয়া কে দেখে? জগন্নাথের প্রসাদ বার জাতিতে মিলিয়া ভক্ষণ করা, আর সংকীর্ত্তনে বঙ্গভাষাতে বিষ্ণুর স্তব ও নৃত্যগীতাদি করা, এই দুইটী অনেক কাল হইতে ধর্ম্ম বলিয়া প্রবর্ত্তিত। ইংরেজ রাজত্বকালে যে অধর্ম্মটী ধর্ম্ম বলিয়া চলিতেছে, এখানে তাহা বলিতেছি। খৃষ্টান্, বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভৃতিতে পার্থক্য নাই, তিনেরই এক মত; তিনে একজন স্বষ্টি-কর্ত্তারই উপাসনা করে। সেই একই উপাস্যকে কেহ গড, কেহ ঈশ্বর, কেহ বা ভগবান্ বলিয়া ডাকে। যে, যে নাম ধরিয়া ডাকুক না কেন, তাহাতে সেই স্বষ্টিকর্ত্তার সমান দয়া। যথা:—

> জানিগো জানিগো তারা, তুমি কেবল ভোজের বাজি।
> যে নামে যে তোমায় ভজে, তাইতে তুমি হওমা রাজি॥
> মগে বলে ফরাতারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গি যারা,
>
> ইত্যাদি
>
> রামদুলাল।

এসকল, একাচার প্রবর্ত্তকদের কর্ম্ম বলিতেছি। ইহাই নাম "ধর্ম্মে নামে অধর্ম্ম প্রচার।" ইহার মধ্যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ লোকনাথের কাহিনী প্রকাশ করিতে পারিলে আস্তিকদিগের চমক্ ভাঙ্গিতে পারে।

বিশেষ নিবেদন

অনেকেই অনুরোধ করিতেছেন, এই পুস্তকে যেন কাহাকেও আক্রমণ করা না হয়। নব্য সভ্যদিগের মধ্যে অনেকে আকার পুস্তক দেখিয়া সেই আক্রমণ ঘটিয়াছে বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেবল এই পুস্তকে নহে আমার লিখিত অন্যান্য পুস্তকে প্রবন্ধাদিতেও এই দোষ বিদ্যমান থাকে শুনা যায়। তথাপি

আমি ইহা পরিহার করিতে পারিতেছিনা কেন এখানে বিশেষ নিবেদনে সেকথা প্রকাশ করিতে চাই ॥

আমি দেখিতেছি ঘোর কলি উপস্থিত। এই যুগে ধর্ম্ম সঙ্কুচিত, অধর্ম্ম উদ্বেলিত হইয়া থাকে। এখন অধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মের এইরূপ দুর্দ্দশা ও নাস্তিকতার প্লাবন ঘটিয়াছিল। তখন সহরে বন্দরে রাজদরবারের সর্ব্বত্র এখনকার ন্যায় ধর্ম্মহীনতার (বৌদ্ধতার) প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ নগণ্য পল্লী প্রভৃতি নিভৃত স্থানে লুকায়িত থাকিতেন। তখনকার জনসাধারণেরা সেই নাস্তিকতার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ধরিয়া লইত। এখন সেই নাস্তিকতা, নির্ব্বুদ্ধিতার সহিত মিশ্রিত হইয়া ভক্তি (অন্ধভক্তি), বিশ্বাস (স্বেচ্ছা), কল্পিতধারণা, ঈশ্বর বা ভগবান্ (গড্) এই সকল কথা পুস্তক, পত্রিকা ও বক্তৃতার সাহায্যে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আড়াইহাজার বৎসর পূর্ব্বে কুমারিলভট্ট নামক পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া রাজাধিরাজ সুধন্বাকে বুঝাইতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার সভাসদ্, পারিষদ, কর্ম্মচারী ও প্রজাগণ, সকলেই নাস্তিকদ্বারা পরিচালিত। তাহার ফলে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যেখানে যত বৌদ্ধ ছিল সকলেরই রাজসৈন্যদিগের অক্রমণে নিহত ও নির্ব্বাসিত হইতে হইল। তাহার পরে শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন।

এখন যে নির্ব্বুদ্ধিতা সঞ্জাত নাস্তিকতাদ্বারা দেশ প্লাবিত হইয়াছে ও লোকে তাহা পবিত্র ধর্ম্মমত বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, এই অবস্থা নব্যশিক্ষার আলোকবিহীন সেকেলে অসভ্যভাবাপন্ন কতিপয় হিন্দু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। অত্রাবস্থাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি দুই এক কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে দেশপ্লাবক দলসংগ্রাহকদিগের ভিতরকার ব্যাপারটা ধরিয়া কথা না বলিলে কিরূপে পারা যায়? এখন চোরকে চোর বলিলে যে অন্যায় হয়

একথা অনেকেই জানে এবং কেহ বলিতেও চাহেনা। তাহার কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিলেই মুস্কিল হইয়া থাকে। একথা ত প্রকাশ্যে বলা যায় না যে আমরা ফাঁকিবাজ, কেহ আমাদের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করিও না। সভ্যতার ভাষাতে বলিতে হয়—"আমাদিগকে আক্রমণ করিও না।"

আমরা ব্রাহ্মণ, তোমরা তাহা নও; শাস্ত্রে তোমাদের প্রবেশ নাই, তথাপি তোমরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া নানারূপ অভিনয় করতঃ ভাব ভঙ্গীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লোপ করিতে থাকিবে; সবেগে আসিয়া আমাদের গায়ে পড়িবে, আমরা আত্মরক্ষা করিতে গেলেই চীৎকার দিয়া উঠিবে—"খবরদার কাহারও প্রতি যেন আক্রমণ করা না হয়।"

তোমরা সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় করিবে, অদ্বৈতবাদ ঢাকিয়া অন্ধ-ভক্তির বৈষ্ণবমত চালাইবে, পৈতা ছিড়িয়া ব্রাহ্ম হইবে এবং সেখানে সুবিধা না পাইয়া ভক্ত বা স্বামী কিম্বা ব্রহ্মচারী উপাধি লইয়া হিন্দুদিগের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ বর্ষণ করিতে থাকিবে। আমি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কথা বলিতে গেলেই তোমাদের ক্ষতি। তোমাদের ততটুকু অনিষ্ট না করিয়া আমি কিরূপে পারিয়া উঠি? তাহা যদি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে আমার কোনই আপত্তি নাই।

মনু বলেন—"যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মংবেদ নেতরঃ।" অর্থাৎ যিনি তর্কদ্বারা অনুসন্ধান করেন তিনিই ধর্ম্ম জানিতে পারেন, অন্যেরা কিছুতেই ধর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হয় না।

তুমি বল—"বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

তোমরা যে বিষকুম্ভ পয়োমুখের ন্যায় শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের অহিতকারী, একথা বলিতে গেলেই ত তোমাদিগকে আক্রমণ করা হইবে;

শাস্ত্রীয় উপদেশ এই যে ব্রহ্মবিৎকে বাহ্য লক্ষণ দ্বারা ধরিবার

উপায় নাই। তুমি, অমুক ব্রহ্মবিৎ নয়, অমুকে ব্রহ্মজ্ঞ, এইরূপ গলাবাজি করিতেছ; বলদেখি ভাই, তোমাকে আক্রমণ না করিয়া আমি দাঁড়াই কোথায়? তোমরা কি আমার দাঁড়াইবার স্থল রাখিয়াছ যে, আমি তোমাদের সহিত অবিরোধে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কথা লোকের নিকট বলিতে পারি?

ভক্তি

ভজনা প্রবর্ত্তক ভাব বিশেষকে ভক্তি বলা যায় ভগবদ্গীতাতে কথিত আছে,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃসুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো-জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভারতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে।"

অর্থাৎ জন্মান্তরীয় সুকৃতিশালী ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করে। তাহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত,—কতকগুলি লোক পীড়াদিতে আর্ত্ত হইয়া ঔষধাদির ভজনা ত্যাগ করতঃ আমার শরণ লয়, অন্য কতক মনুষ্য সুখাদি স্বার্থের আকাঙ্খাতে আমার ভজনা করিয়া থাকে। এই হইল আর্ত্ত ও অথার্থী ভক্তের কথা; এতদ্ভিন্ন এক শ্রেণীর ভক্ত আছে, তাহারা দুঃখ নিবারণ বা সুখ লাভের জন্য আমাকে চাহেনা, কিন্তু জগতের ব্যাপারখানা কি, এই রহস্য ভেদ করার জন্য কেবল জানিতে চায়। এইভাবে তন্ন তন্ন করিয়া জগদ্ব্যাপার উদ্ঘাটন করাও আমার ভজনা বিশেষ। সুতরাং তাহাও ভক্তির কার্য্য। এই শ্রেণীর জিজ্ঞাসুদিগের জিজ্ঞাসাপ্রবর্ত্তক ভক্তি বিদ্যমান থাকাতে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসু ভক্ত বলে। তাহারা এই পরিবর্ত্তণশীল জগদ্ব্যাপার জানিতে জানিতে জগতের অতীত শূন্যকে জানিতে পারে, এবং সেই শূন্যের অতীত সত্য বস্তুকেও স্বাভাবিক আস্তিকতার বলে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার জিজ্ঞাসার

সমাপ্তি ঘটে। জিজ্ঞাসু ভক্ত যখন এই ভাবে জানিবার চরমসীমাতে উপনীত হয়, তখন তাহার জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকেনা, তাদৃশ জিজ্ঞাসুর সেই চরমাবস্থার নাম জ্ঞান। এমন জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটিলে তাহাকে তখন জিজ্ঞাসু শ্রেণী হইতে উন্নত করিয়া 'জ্ঞানীভক্ত' নাম দেওয়া যায়।

আর্ত্ত ভক্তের দুঃখ নিবারণ কামনা থাকে, অর্থার্থীর সুখ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে। জিজ্ঞাসু ভক্তের তেমন কোন বাসনা না থাকিলেও জানিবার ইচ্ছা দ্বারা চালিত হয় বলিয়া তাহার ভাবকে সকাম ভাব বলা যায়। জ্ঞানী হইলে সেই জানিবার বাসনাও ফুরাইয়া যায় সুতরাং তখন সে কামনার দাস নহে। এজন্য গীতাতে কথিত হইল,—"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।" অর্থাৎ সেই চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানী ভক্তই আমাতে নিত্য যুক্ত হয়; এজন্য তাঁহাকে একভক্ত বলিতে হইবে এবং অন্য তিন ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বলিতে হইবে। এই ভাবে জ্ঞানীর ভক্তি পরাভক্তি নামে অভিহিত; আর্ত্ত জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ভাবে ভজনাশীলদিগের ভক্তিকে অপরা ভক্তি বুঝিতে হয়। ইহাদের উদাহরণ; মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডী পাঠে যে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের ভগবতীর আরাধনায় ইতিহাস পাওয়া যায়, তাঁহারা শত্রুকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া ভজন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তাঁহাদের এই ভজন প্রবর্ত্তক ভক্তিকে আর্ত্ত ভক্তি বলিতে হইবে। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করা, তেমন কোন আর্ত্ততামূলক নহে; তাঁহারা ইন্দ্রলোকাদি প্রাপ্তিরূপ অর্থার্থী হইয়া বিবিধ যজ্ঞাদি দ্বারা ভজন করিয়াছেন; তাঁহারা অর্থার্থী ভক্তের উদাহরণ স্থল।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখা যায়, ভৃগু পিতা বরুণের উপদেশ মতে কোথা হইতে এই প্রাণীপুঞ্জ জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও কি প্রকারে তাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে এবং কিসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

তাহারা মিলাইয়া যায়, এই সকল জানার জন্য অন্ন, প্রাণ, মনঃ, বিজ্ঞান ও আনন্দ লইয়া বিচার করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষৎ পাঠে জানা যায়, শ্বেতকেতু, পিতা উদ্দালক আরুণিক উপদেশ মতে একটুক্রা লৌহকে জানিলে যেমন লৌহজাত সমস্ত পদার্থের ভাব জানা যাইতে পারে, তেমন ভাবে সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ভৃগুর ও শ্বেতকেতুর মধ্যে যাদৃষ ভক্তি বিগুমান থাকাতে তাঁহারা আর্ত্ত বা অর্থার্থী ভক্ত না হইয়াও এভাবে জানিবার জন্য যত্ন করিতে পারিয়াছিলেন সেই ভক্তির নাম জিজ্ঞাসু ভক্তি।

মহাভারতের শাস্তিপর্ব্বে লিখিত রহিয়াছে যে ব্যাস ও জনকের উপদেপ মতে শুক সেই চরম সত্যকে জানিয়া জিজ্ঞাসা পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উনিষদে পাওয়া যায় দেবকীনন্দন কৃষ্ণ, ঘোর নামক ঋষির উপদেশমতে বাহিরে সুখের সম্ভাবনা না দেখিয়া বাহ্য বিষয়ের আশা ছাড়িয়া দিয়া আত্মনিরত হইতে পারিয়াছিলেন। এই শুক ও কৃষ্ণ, যাদৃশ ভক্তির প্রভাবে জিজ্ঞাসুতা হইতে উন্নীত হইয়া জ্ঞানী সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, ইহাদের এই জ্ঞান নামক ভক্তিই পরাভক্তি।

উপরোক্ত সুরথ, সমাধি, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, ভৃগু, শ্বেতকেতু, শুক ও কৃষ্ণ এই আট জনকেই জন্মান্তরীয় সুকৃতিসম্পন্ন জানা যায়। কেবল তাহাই নহে, তন্মধ্যে শুক রুদ্রাংশ হইতে উৎপন্ন ও কৃষ্ণ নারায়ণ নামক ঋষিজন্ম অতিবাহন করিয়া ক্ষত্রিয় যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন; এই সকল ইতিহাস মহাভারতে প্রসিদ্ধ। ইহাদের ভক্তি এবং বর্ত্তমানকালীয় ভক্তির মধ্যে তফাৎ এই যে, সুরথরাজা ও সমাধি বৈশ্য রাজ্যসম্পদ্ হারাইয়া সুকৃতি বশতঃ তিন বৎসরকাল সমাহিত চিত্তে নদী পুলিনে গিয়া মৃন্ময়ী প্রতিমাতে নিজ শরীরের রুধির উপহারে দেবীর আরাধনা করতঃ অভিলষিত বর লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালীয় ভক্তদিগের

কোনরূপ কায়ক্লেশ করিতে হয়না বরং চর্ব্বচোষ্যদ্বারা শরীরটী পুষ্ট করিতে হয়। নৃত্য গীত অশ্রুজল মূর্চ্ছা প্রভৃতির অভিনয় করিতে পারিলেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা হইয়া থাকে। এসকলগুলি বেদস্মৃতিমত ভক্তির লক্ষণ নহে।

বর্ত্তমান কালের লোকেরা যে অন্ধ ভক্তি ছড়াইয়া দিয়াছে, যাহা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, সেগুলি জ্ঞান নামক পরাভক্তি, অথবা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থীর অপরাভক্তি ও নহে, একথা ভগবদ্গীতার কথাদ্বারাই বুঝা যায়। গীতাদি শাস্ত্রে সুকৃতিশালীদিগের ঐ চারিপ্রকার ভক্তির মাহাত্ম্য জানা যায়। নাস্তিক প্রভৃতি দুস্কৃত মনুষ্যদিগের তাদৃশ ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই তাহারা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবাশ্রয়ে অন্ধ ভক্তির অভিনয় করিতে পারে। আস্তিক দিগের ওরূপ করিতে গেলে যে তাঁহাদের পতন ঘটে, এ কথা বর্ত্তমান অবস্থাতে সাধারণকে বুঝাই উঠা সুকঠিন ব্যাপার। আজকালকার লোকেরা হিন্দুদিগকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে যে, গীতার কথামতে কৃষ্ণ যে একজন ভক্ত ও তাঁহার ভক্তিকে পরাভক্তি বুঝিতে হয়, একথা বুঝিবার সাধ্য অতি অল্পলোকেরই রহিয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষামতে সাধারণেরা ধারণা করিয়া রাখিয়াছে, কৃষ্ণ পূর্ণ ও স্বয়ং ব্রহ্ম পদার্থ। প্রকৃত প্রস্তাবে মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে "নায়ং কেবলমানুষঃ"। কৃষ্ণ মানুষ বটেন কিন্তু কেবল মানুষ নহেন; অন্যান্য ব্রহ্মজ্ঞেরা যেমন আপনাকে পূর্ণব্রহ্ম জানেন, কৃষ্ণও তেমন আপনাকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া অবগত আছেন। তদ্ভিন্ন তিনি বিষ্ণুর অবতারও ছিলেন। কলির যুগধর্ম্মে হিন্দুরা যে এই দুর্দ্দশাতে উপনীত হইয়াছে তাহা আমাদের জানা আছে। সাধারণ হিন্দুর এই সংক্রামক ব্যাধির কথা সাধারণে না বুঝিলেও আমরা ইহা জানিয়া চুপ থাকিতে পারিতেছিনা।

বঙ্গভাষাতে ভক্তি কথাতে পদলেহন ভাবটী প্রকাশ করে; কেহই "ভক্তি" বা "পরাভক্তি" কথায় জ্ঞান বুঝিতে পারে না। এই ক্ষেত্রে কৃষ্ণ একজন ভক্ত, এরূপ কথা বঙ্গভাষায় বিকাইতে পারে না। বিদ্যা বলিতে দোভাষিয়াগিরি মাত্র বুঝায়। "অধ্যাত্ম-বিদ্যা বিদ্যানাম"। সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্ম-বিদ্যা। আমাদের মধ্যে কেহ অধ্যাত্মবিদ্যার খবর রাখেন কি? যতদিন এই অধ্যাত্মবিদ্যার কথা প্রকাশ করিতে বঙ্গভাষার সামর্থ্য না হইতেছে, ততদিন শত শত সাহিত্যিকগণের সভাসমিতি বিদ্যমান থাকিতে ও বঙ্গভাষাকে জীবনহীন ভাষা বলিতে হয়। এই জীবনহীন ভাষায় "ভক্তি" শব্দ পরসেবা, পরাধীনতা আমি, আমি কিছুই নই, এই পর্য্যন্ত বুঝাইতে পারে, কিন্তু আমি পরাৎপর, পরব্রহ্ম, আমি পূর্ণ ও সত্য ইত্যাকার কথা বলিলে বাঙ্গালির বিদ্বেষ ভাজন হইতে হয়; প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই পরাভক্তির কথা। "আত্ম-যাগ" কথার ও বাঙ্গলাতে ব্যবহার নাই। আমি আমার উপাসনা করি প্রভৃতি কথাতে বঙ্গভাষাতে কোন অর্থই প্রকাশ পায় না। এই ভাষাতে ভক্তি কথার ব্যাপকতাতে যদি জ্ঞানকে বুঝাইতে পারিত, তাহা হইলে এই সকলই সম্ভব হইত। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে উক্ত চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্ত বলিলাম। ইহাতে বুঝিতে হইবে, কৃষ্ণ আত্মযাজী,— তিনি আপনিই আপনার ভজনা করেন; অন্যান্য ব্রহ্মজ্ঞেরা ও সেইরূপ নিজে নিজের উপাসনা করিয়া থাকেন। বাঙ্গালিদের মধ্যে এইরূপ ভাব না থাকাতে, এমন ভাষাও নাই। এই সুযোগ পাইয়া আজকাল আমরা লোকদিগকে অন্ধ ভক্তির জালে ফেলিয়া কলির অনুগত করিয়া রাখিয়াছি। অন্ধ ভক্তেরা মনে করে ভৃগু, শ্বেতকেতু, শুক, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ মহাপুরুষেরা ও বুঝি কেবল "ঈশ্বর" "ঈশ্বর" "ভগবান্" "ভগবান্" করিয়া কান্দিয়া আকুল হইতেন। ইহাই বুঝি

পরমার্থ প্রাপ্তির পথ। ইহার উপরে আর মনুষ্যের গতি হইতে পারেনা। তাহাতেই আমরা শাস্ত্র বাক্যদ্বারা দেখাইতেছি, যত প্রকার ভজনা (ভক্তি) রহিয়াছে, তাহার মধ্যে আপনি আপনার ভজনাকরাই শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ পরাভক্তি। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থীরা, আমি ভিন্ন অন্য পদার্থের ভজনা করাতে তাহাকে পরাভক্তি না বলিয়া অপরা বা নিকৃষ্টা ভক্তি বলিতে হয়।

জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই পরাভক্তির বাচ্য হইতে পারে না। আমি ভিন্ন অন্য পদার্থের উপাসনা করা অজ্ঞানীর কার্য্য; তাহাতেই বেদে তাহারা পশু বলিয়া নিন্দিত। উপনিষদে দেখা যায় যাহারা আমি ভিন্ন (ঈশ্বর ভগবান্ প্রভৃতি) ভিন্ন ভিন্ন নামধারী দেবতার উপাসনা করে তাহারা প্রকৃত তত্ত্ব জানেনা; এবং তাহারা ঐ সকল উপাস্য দেবতার পশু হইয়া থাকে। এই সকল কথার ভাবে বুঝিতে হয়, ব্রহ্মজ্ঞানহীন অথচ আস্তিকতা (শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা) সম্পন্ন ব্যক্তিরা পূর্ব্বসংস্কার বশে শাস্ত্র বিধিমতে ভিন্ন ভিন্ন গুণশালী দেবতার আরাধনা করিয়া যে নূতন সংস্কার অর্জ্জন করে, তাহার বলে তাহারা স্বর্গে গিয়া সেই সকল দেবতার অনুচর ভাবে স্বর্গ-ভোগ করে। ইহাকেই "উপাস্য দেবতার পশু হইয়া থাকে" বলা হইল। যাহারা শাস্ত্রীয় বিধি অবলম্বন না করিয়া আপন আপনভাবে উপাসনা করে, তাহাদের সেই উপাসনা, তাহাদিগকে স্বর্গেও লইয়া যাইতে পারে না। কারণ স্বর্গাদি-স্থান, শাস্ত্রীয় শাসনে রচিত; অশাস্ত্রজ্ঞ মনুষ্যের জন্য নয়।

আমরা এই ভাবের কথা বলিলে ভাবপ্রবণেরা বলে,—"মহাশয় রাখিয়া দিন, ও সকল কথা। স্বর্গ বুঝি কেবল আপনাদের মত হিন্দুর জন্যই রচিত হইয়াছে; খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি অসংখ্য লোকের কেহই তথায় যাইতে পারে না?" তাহাদের এরূপ বলিবার হেতু এই যে, সকলের উপর একজন কর্ত্তা রহিয়াছেন, কেহ সেই কর্ত্তাকে ঈশ্বর বা ভগবান্ বলিয়া

উপাসনা করে, অন্যেরা গড্ বা অন্য কিছু বলে। আমরা সকলেই তাঁহার প্রজা বা পুত্র, তিনি সকলের প্রতি সমান অনুগ্রহ করেন। অতএব শাস্ত্র-বিধিমতে তাঁহারা ভজনা করিলে তিনি তাহাদিগকে যেমন স্বর্গে লইয়া যান, যেমন যাহারা বাইবেল ইত্যাদি মতে ভজনা করে তাহাদিগকে ও সেই স্বর্গে অবশ্য লইয়া যাইবেন।

আমি দেখিতেছি ইহারা যে মূলে ঈশ্বর ভগবান্ প্রভৃতি নামধারী একজন কর্ত্তাকে বসাইয়া দিয়াছে, ইহাদেব মূলেই গলদ ঘটিয়াছে। ফলতঃ তেমন একজন কর্ত্তার অস্তিত্ব, শাস্ত্র বা যুক্তিদ্বারা স্থির হয় না। আমরা "পরমার্থ কি?" শীর্ষক প্রবন্ধে যে এক সত্য বস্তুর অস্তিত্বের প্রসঙ্গ করিব, তাহা কিন্তু এই ঈশ্বর বা ভগবান্ নহে। ঈশ্বর বলিতে প্রভুত্ব যুক্ত কিছুকে বুঝায় ও ভগবান্ বলিতে ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি যুক্ত তেমন কিছুকে বুঝাইয়া থাকে। আস্তিকের সেই সত্য বস্তু শূন্যের অভ্যন্তরে স্থিত বলিয়া তাহাতে প্রভুত্ব বা ভগ নামক ঈশ্বরত্বের সংযোগ স্বীকার করা যায় না। তাহা এক ও অদ্বিতীয় বস্তু। কলিচরেরা, তোমাদের নিকট সেই আস্তিকের লক্ষ্য সত্য বস্তুটি ঢাকিবার জন্য তোমাদের হৃদয়ে ঐরূপ ঈশ্বর ভগবান্ নামধেয় কর্ত্তাকে বসাইয়া দিয়াছে। তাহার ফলে তোমরা শাস্ত্রের বিধি পালন করিতে পারিতেছ না, তৎপরিবর্ত্তে ভাবের দাস হইয়া উঠিয়াছ। তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না যে, তোমাদের মনঃ-কল্পিত ভাব তোমাদেরই অধীন, সে তোমাদের উদ্ধার করিবে কিরূপে?

প্রকৃত প্রস্তাব যদি সকলের উপরে তেমন একজন কর্ত্তা না থাকে, (আমি জানি তেমন কেহ কর্ত্তা নাই) তাহা হইলে তোমরা তেমন কর্ত্তার অস্তিত্ব কল্পনা কর বলিয়া কি নিস্তার পাইবে? আমি দৃঢ় করিয়া বলিতেছি, এইরূপ কর্ত্তা ধরিয়া লওয়া খৃষ্টান

আদির মত হইতে পারে কিন্তু প্রাচীন কোন হিন্দুই এইরূপ মত পোষণ করিতেন না। তাঁহারা জীব ও জগৎকে অনাদি জানিতেন এবং আপনাদের প্রাক্তন কর্ম্মকেই সেই কর্ত্তার স্থলবর্ত্তী বুঝিতেন।

তোমাদের এই ভাবকে যদি একরূপ ভক্তি বলিতে চাও, তাহাতে আপত্তি করিব না; তোমাদের জন্মান্তরীয় সুকৃতি থাকিলে এরূপ হইত না; এরূপ ভিত্তিহীন ঈশ্বর বা ভগবান্‌কে তোমরা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিতেনা; পূর্ব্বসংস্কার তোমাদিগকে টানিয়া লইয়া ভিত্তিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিত। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের এইরূপ সর্ব্বোপরি একজন কর্ত্তা মানিবার বুনিয়াদ কি? নিশ্চয়ই তোমরা তাহা দেখাইয়া দিতে পারিবেনা। তোমাদের যদি জন্মান্তরীয় সুকৃতি থাকিত তবে পূর্ব্ব জন্মের অস্তিত্ব সহজেই বুঝিতে পারিতে এবং নিজের মধ্যে আগত উড়া ভাবকে লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারিতেনা। এক কথায় বলিতে গেলে তোমরা তথাকথিতভক্তদের এই বেড়াজাল ছিড়িয়া আসিতে সমর্থ হইতে।

তোমাদের মত লোকদিগের এইরূপ ভাবকে আধুনিকেরা "অহৈতুকী ভক্তি" ব্যাখ্যা করতঃ ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছে। ভগবদ্গীতার কথিত পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার ভক্তি সহেতুক অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিই তাহাদের তাদৃশ ভক্তির হেতু। তোমাদের সেই জিনিষটির অভাবে তোমাদের ভাবকে হেতু সম্বন্ধ না থাকায় খামখেলি বা অহেতুক বলা যায়। তোমাদের মধ্যে তেমন সুকৃতি রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ আমরা জানি মর্ত্ত দেহধারী-দিগের মধ্যে অনেকে অবরোহিণী গতিতে স্বর্গ-ভ্রষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে; অপরেরা অবরোহিণী (The law of Evolution) গতিতে নরকভোগান্তে উদ্ভিদ্ মৎস্যাদি জন্মের পরে মানবদেহ প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্টেরা মর্ত্তলোকে মরিয়া পুনরায় মর্ত্তলোকই লাভ করে। সংস্কারের তারতম্য দ্বারা তাহা বুঝা যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে অনেকে পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম স্বীকার করে, অনেকে মানিতে

পারে না। যাহারা জন্মান্তর মানিতে পারেনা, তাহারা ক্রমোন্নতির পক্ষপাতী হয়। এতদ্বারা তাহারা ক্রমোন্নতি পথে আগত বুঝা যায়। সুতরাং তাহাদের কথার কিছুমাত্র মূল্য অন্যেরা স্বীকার করিতে পারেনা।

তোমরা যদি বল, আমাদের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বা আস্তিকতা থাকুক আর নাই থাকুক, ঈশ্বর, ভগবান্ বা শাস্ত্রীয় অন্য নাম ধরিয়া যদি আমরা কাতর প্রাণে ডাকিতে থাকি, তাহা হইলে তিনি শাস্ত্রীয় বিধিমত তোমাদের পূজা গ্রহণ করিয়া তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, আর আমাদের প্রার্থনা বিধিমত হয় নাই বলিয়া কি অগ্রাহ্য করিতে পারেন? তেমন হইলে তাহার উচ্চতা বা মহত্ব কোথায়? আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিরাও ত এমন করেনা। কোন ভিখারী কোন কিছু না বলিয়া যদি আমাদের নিকট ভাবভঙ্গি দ্বারা ভিক্ষা প্রার্থনা করে, তাহা হইলে মুখে প্রার্থনা করে নাই বলিয়া ত আমরা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে চাইনা।

এ কথার উত্তরে আমাদের বক্তব্য যে, আমাদের সহিত ভিখারী দিগের যে সম্বন্ধ, দেবতাদিগের সহিত আমাদের তেমন সম্বন্ধ নয়। কোন দেবতার সহিত কিরূপ সম্বন্ধ, তাহাও শাস্ত্র হইতে জানিতে হয়। মনে কর, বিচারালয়ের নিয়ম মতে বিধিমত কোর্টফী দিয়া আরজী দাখিল করতঃ শেষ পর্য্যন্ত আইন মত কার্য্য করিয়া ডিক্রী লাভ করা যায়। কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যদি সে পথে না চলিয়া কেবল কান্নাকাটির বলে বিচারকের দয়া উৎপাদন করতঃ ডিক্রি লাভ করিতে যত্ন করে, তাহা হইলে কি সে কৃতকার্য্য হইতে পারে? মানবে মানবে যে বিচার আচার হয় তাহাতেই বিধির এত আধিপত্য; মানবে ও দেবতাতে আদান প্রদানের ব্যাপারে সেই বিধির কতদূর প্রাধান্য হওয়া উচিত, ইহা ভাবিবার বিষয় নয় কি? আইন ব্যবসায়ী উকিল মোক্তারেরা

বিধি জানে বলিয়া বিচারালয়ে অর্থী প্রত্যর্থীর প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাদের পদ বিচারপতির পদের খুব কাছাকাছি দেখা যায়। সেইভাবে শাস্ত্রীয় বিধানবিৎ ব্রাহ্মণগণ ভূদেব বলিয়া কীর্ত্তিত হন। তথাচ স্মৃতিঃ—

দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণজ্ঞাতাস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ-দেবতা॥

সমস্ত জগৎ দেবতাদ্বারা পরিচালিত, সেই দেবতারা মন্ত্রের অধীন; সেই সকল মন্ত্র ব্রাহ্মণগণ বিদিত আছেন বলিয়া ব্রাহ্মণের দেবত্ব সঙ্ঘটিত হইয়াছে।

তোমরা জন্মে জন্মে শাস্ত্র-বিধি লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছ বলিয়া সেই সংস্কার-বশে, এই জন্মেও শাস্ত্র-বিধি পালনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না। পক্ষান্তরে বলিতে হয় যে, তোমরা যে নিতান্তই শাস্ত্রসংস্কার-বিবর্জ্জিত এমনও বলা উচিত হইবে না, তেমন হইলে এই আর্য্যদিগের ভগ্নাবশিষ্ট সমাজে জন্মগ্রহণ করিতে পারিতে না। এতটা ভাবিয়াই আমাদের এসকল কথা বলিতে হইতেছে, নতুবা "তত্রমৌনং হি শোভনম্" হইত।

আমরা এখনকার হিন্দুদিগকে বুঝাইতে চাই যে তোমরা কলির ভাটার স্রোতোবেগে গা ভাসান দিয়া ভাসিয়া যাইতেছ। শাস্ত্রতরণী ভিন্ন কুল পাইতে পারনা। নব্যেরা যে আপনাদের উপযোগী করিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা বাহির করিতেছে, তাহা কিন্তু নৌকা নহে, স্রোতেরই আবর্ত্ত। এই ভাটার টানে ভাসিয়া ব্রাহ্মণেতর বর্ণের যে সকল ব্যক্তি স্বজাতির উদ্ধার কল্পে পৈতাধারণাদি সদাচার-বিরুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা উন্নত হইয়াছে, তাহাদের আন্তরিক ভাব সহজেই ধরা পড়িতেছে। তাহাদের প্রতি কিছুই বক্তব্য নাই। কলির ব্রাহ্মণগণ, কালচক্রে দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্থ সুতরাং আচার ভ্রষ্ট হইতেছে দেখিয়াও যাহারা তাহাদের ভূদেবত্ব ভুলিতে পারেনা

বরং ব্রাহ্মণের অনুসরণ করার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। তাহারা যেন আপনাদের পূর্ব্ব-সংস্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখে। আপনাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠিগণকে নবগুণ সূত্রে জাতীয় নিশান উড়াইতে দেখিয়া ও যে নিজেদের মতিগতি সেইদিকে ধাবিত দেখেনা; ইহা কি প্রবল পূর্ব্ব সংস্কারের ফল নহে? ব্রাহ্মণ যতই অধঃ-পতিত হউক না কেন, ব্রাহ্মণেতরবর্ণদিগের উদ্ধার করার শক্তি তাহাদের মধ্যে নিয়ত নিহিত রহিয়াছে। এসম্বন্ধে একটী শ্লোক শুনা যায়—

সগুণো নির্গুণোবাপি মম সন্তাপ-হারকঃ।
উষ্ণং বা শীতলং বারি বহ্নি-বারণ-কারণম্॥

হে ব্রাহ্মণ! তুমি সগুণ অথবা নির্গুণই হও আমার সন্তাপ তোমাদ্বারাই দূর হইবে; জল শীতল থাকুক বা উষ্ণই হউক, আগুনে ঢালিয়া দিতে পারিলে, আগুণ নিবিয়া যাইবেই।

ব্রাহ্মণের পূজাকরা কেবল ব্রাহ্মণেতর বর্ণেরই কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিবেনা, এমন নহে। ব্রাহ্মণেরা যখন শ্রাদ্ধ বিবাহাদি ধর্ম্ম ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হন, তখন সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণগণের নিকট ('ব্রাহ্মণাভবন্তোহনুমোদন্ত' বলিয়া) অনুমতি গ্রহণ অদ্যাপি করিয়া থাকেন। তাহাতে আচারযুক্ত আচার বিহীন সকল প্রকার ব্রাহ্মণেরই সম্মান করিতে হয়।

"ভক্তি" বলিতে এখন সেবার ভাবে কান্দাকাটি ও নিজের অধমতাব্যঞ্জক ভাববিশেষ বুঝাযায়, ভক্তিপ্রসূত কর্ম্মের মধ্যে ভক্তিভাজনের চরণ সেবা প্রভৃতি মাত্র বুঝা যায়, শাস্ত্রানুমোদিত ভক্তি ইহা নহে; ব্রাহ্মণের জ্ঞানবিজ্ঞান আদি, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি, বৈশ্যের কৃষি গোরক্ষা ও বাণিজ্য এবং শূদ্রের ঐ তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করা, ভক্তির কার্য্য বুঝিতে হইবে। লোকেরা ঐগুলিকে সাংসারিক কার্য্য মনে করিয়া ধর্ম্মকার্য্য অন্যরূপ ধরিয়া লয়, কিন্তু চতুর্ব্বর্ণের ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যই স্মার্ত্তধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

আছে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের মনুষ্যগণ যদি ঐ সকল কার্য্য বিধিমত অনুষ্ঠান করে, অন্য কোনরূপ ধর্ম্মকার্য্য নাও করে, তথাপি তাহাদের উহাই যথেষ্ট ধর্ম্মকার্য্য করা হয় এবং তাহাই শাস্ত্রবিহিত ভক্তির ব্যবহার। আমরা অনেক দিন যাবৎ এই ভক্তিভাব হারাইয়া বসিয়াছি।

নব্যেরা আমাদের কথাগুলি গ্রহণ করিতে পারেনা কেন ?

আধুনিক শিক্ষিতদিগের মধ্যে যাঁহারা পরকাল-তত্ত্বে আস্থাশূন্য, বেদবাক্য যাঁহাদের নিকট 'কৃষকেরগান' বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, হিন্দুধর্ম্মকে যাঁহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, প্রাচীনকালীন ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলি নিজেদের অভিজ্ঞতা দ্বারা আয়ত্ত করিতে না পারিয়া, সে গুলিকে এক্ষণকার উপন্যাসের ন্যায় কাল্পনিক ব্যাপার বা প্রক্ষিপ্ত ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দুই একটী কথা বলা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। যে সকল কারণে নব্যগণ, এতাদৃশী বিকৃতবুদ্ধি সমাশ্রয় করিয়াছেন সেই সকল কারণ গুলি, একে একে তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

(ক) আত্ম-প্রতারণা নব্যশিক্ষিতগণের প্রধান দোষ। তাঁহারা দশ জনের দেখাদেখি ঈশ্বর মান্য করিয়া থাকেন। সকলেই অবগত আছেন, ঈশ্বর নির্ব্বিকার নিরাকার, ও চৈতন্য স্বরূপ। ঈশ্বর যদি নির্ব্বিকার, কোনওরূপ বিকার যদি তাহাতে নাই, সকল অবস্থায়ই অবিকৃত ভাবাপন্ন, তবে তাহাকে 'দয়াময়' 'প্রেমময় বলা চলে কি? বিকারী বস্তু মাত্রেরই রূপান্তর প্রাপণ সম্ভব। নির্ব্বিকার বস্তুতে বিকারী বস্তুর গুণ—দয়া, মায়া, প্রেমের ভাব কোথা হইতে আসিবে? ঈশ্বর নিরাকার; ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে কি যে, ঈশ্বরের কোনও না কোনও রূপ অবয়ব আছে?

তাহা যদি বুঝিতে না হয়, তবে নিরাকারে, সাকারের বিশেষণ যোজিত করা কেন? নিরাকারের যখন হাত, পা, মাথা বা অন্য কোনও অবয়ব থাকা সম্ভবপর হইতেছেনা, তখন তাহাতে জোর করিয়া হাত, পা, মাথা যুড়িয়া দেওয়া হইতেছে কেন? কেবল মাত্র চৈতন্যস্বরূপতাই ঈশ্বরের জীবন্ত প্রমাণ। সূক্ষ্মপ্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তোপদেশ দ্বারা তাঁহার ঠিকানা না করিয়া, গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায়, "ঈশ্বর আছেন" এরূপ মান্যকরা আত্ম-প্রতারণা ভিন্ন আর কি?

(খ) পরের মুখে ঝাল খাওয়া, নব্যশিক্ষিতগণের দ্বিতীয় দোষ। তাহারা, নিজে না বুঝিয়া বা না পড়িয়া, কেবল পরের মুখে শুনিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দু, খ্রীষ্টান, য়ীহুদী ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা একজনেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। সর্ব্বোপরি সংস্কার, তৎপর সংসর্গ ও শিক্ষা দ্বারা, মনুষ্য-দিগের মধ্যে পরস্পরের জ্ঞানের উৎকর্ষাপকর্ষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তর্ক বা যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া, কেহ কোনও না কোন সময়, স্বীয় মত পরিবর্ত্তন করিতে পারে, এইরূপে বহুবার বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি লোকের নিকট তর্কে হারিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মত পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা রহিয়াছে; সুতরাং যথার্থ গুহ্যতত্ত্বের সন্ধান লওয়া তাহার ভাগ্যে ঘটেনা। মনুষ্যদিগের মধ্যে মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি সকলের সমান নহে। লোকসমাজে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যদি একথা নির্ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মনোবৃত্তি ও একজন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর মনোবৃত্তি কদাচ এক হইবার কথা নাই। যদি তাহাই হয়, তবে মানিতে হইবে যে সকলেই একভাবে ঈশ্বরকে বুঝেনা, সকলেই একভাবে ঈশ্বরকে চাহেনা। সাধন রাজ্যে মনোভাবই বলবত্তর। সুতরাং সকলের জন্য এক ঈশ্বরও নহেন। অতএব কেমন করিয়া বলিতে পারি যে, বিভিন্ন

ধর্ম্মাবলম্বীরা একজনেরই উপাসনা করিয়া থাকেন? এক্ষণকার লোকেরা মনে করে ঈশ্বর একব্যক্তি, আমি অন্য ব্যক্তি, ঈশ্বর রাজা ও পিতার ন্যায়, আমি তাঁহার পুত্র ও প্রজা সদৃশ। প্রাচীন আর্য্যগণ এমন ঈশ্বর মানিতেন না, তাঁহারা জীবকে (সুতরাং আপনাকে) ঈশ্বরের অংশ অথবা ঈশ্বরই বলিয়া জানিতেন।

এখন কথা আসিতেছে যে অন্যান্য স্বার্থপরায়ণ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণ, হিন্দুধর্ম্মের ভাব গ্রহণ করিতে যাইয়া অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বেদ অনভিজ্ঞ লোকের মনোবৃত্তি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মনোবৃত্তির সহিত তুলনীয় নহে, সুতরাং অজ্ঞ ও অর্ব্বাচীনের নিকট বেদগুহ্য রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনের প্রত্যাশা বাতুলের কর্ম্ম নহে ত কি?

(গ) অবলম্বিতধর্ম্মকে, বিজ্ঞানের ভিত্তিতে না বসাইয়া, অজ্ঞতার উপর স্থাপন করতঃ "জগদ্রচয়িতা কে?"—এই তত্ত্ব নিষ্কাষণ করিতে গিয়া, যেখানে আর নিজেদের বিজ্ঞান পঁহুছিলনা, সেখানে সর্ব্বশক্তিমান্ একজন ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়া নিরস্ত থাকা নব্যদিগের তৃতীয় দোষ। লোক-কল্যাণকাম তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষেরা কিন্তু এরূপে একজনকে ঈশ্বর কল্পনা না করিয়াও সমস্ত জগৎ চলিবার বিজ্ঞান অবগত আছেন। নব্যদিগের মধ্যে এ কথার প্রচার নাই। শুদ্ধ-সত্ত্ব, অপাপবিদ্ধ, যোগিশ্রেষ্ঠ, আত্মদর্শী ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ, যখন ঈশ্বর নামক কাল্পনিক জগদ্রচয়িতাকে ধরিয়া টানাটানি না করিয়াও, জগদ্রচনার বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত আছেন, তখন ঐহিক সুখভোগ-নিরত, মলিন-চিত্ত পরলোকাস্তিত্বজ্ঞানে সন্দিগ্ধমনা, চঞ্চলমতি নব্য মহাপুরুষেরা জগতের রচয়িতা একজন ঈশ্বর কল্পনা না করিলে ঈশ্বরনামক কর্ত্তা যে নেহাৎ মাঠে মারা যান। সিদ্ধপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে কয়েকজন লোক ঈশ্বরের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—"ঈশ্বর নামক কোন পদার্থের সহিত আমার এপর্যন্ত দেখা হয় নাই, যদি পরে

কখনও দেখা হয় তাহা হইলে বলিতে পারিব।"

যাহারা অবিবেকী, যাহারা প্রমাদবিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় সুখ ভোগ ভিন্ন যাহাদের জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, পরলোকের অস্তিত্বে তাহারাই বিশ্বাস স্থাপন করিতে অসমর্থ। পরলোকের অস্তিত্বে যাহাদের নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি অভ্যস্ত নহে, শাস্ত্রদৃষ্টিতে তাহারাই নাস্তিক*। ঈশ্বর না মানিলে তাহাকে নাস্তিক বলেনা, বরং বেদকে যাহারা ঈশ্বর বা ঋষিদিগের রচিত মনে করে এবং যাহারা পূর্ব্ব ও পরজন্মে অবিশ্বাসী, শাস্ত্র তাহাদিগকে 'নাস্তিক' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

(ঘ) শাস্ত্র-বাক্যে আস্থা স্থাপনের সাহস নব্য দিগের নাই; ইহা তাহাদের চতুর্থ দোষ। এজন্য সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে ১০।১২ হাজার কি লক্ষ বৎসর পরমায়ু হওয়া, এবং অশ্বত্থমা বলি, ব্যাস, হনুমান্, বিভীষণ, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য—এই সপ্তচিরজীবিগণ, এখনও বর্ত্তমান আছেন, এবং দেবতা বলিয়া একজাতীয় উৎকৃষ্ট জীবের অস্তিত্ব ও তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা থাকা, তাঁহারা প্রত্যয় করিতে পারেন না।

(ঙ) জগতের অত্যল্পকালের ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া, এবং একদেশদর্শী হইয়া ক্রমোন্নতি (Theory of evolution) হইতেছে মনেকরা, নব্যগণের পঞ্চম দোষ। অতি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনায়, জানা যায় ' যে নব্যদিগের এই পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-বিজৃম্ভিত বিশ্বাসের মূলে কোন সত্য নাই। এবিষয় এ গ্রন্থে বিস্তারপূর্ব্বক আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং এখানে তদর্থ বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন দেখিনা।

* "আস্তিক্যং নাম বেদোক্তধর্ম্মাধর্ম্মেষু বিশ্বাসঃ। শাণ্ডিল্যোপনিষৎ॥"

ঈশ্বর ও ভগবান।

নব্যেরা যে এখন কথায় কথায় ঈশ্বর বা ভগবান্ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে আমার কিছু অন্তর্দ্দাহ হয়। এবিষয়টী লইয়া সেদিন কিছুবাদানুবাদ হইল। আমি বলিলাম 'গড্' কথাতে খ্রীষ্টানেরা যীশুর পিতা ও মনুষ্যেরা ভাল কার্য্য করুক এতাদৃশ ইচ্ছা পোষণকারী এবং শয়তানের প্রতিপক্ষ এমন কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া লয়। তোমাদের ঈশ্বর বা 'ভগবান' কথাতে কি তাহাই বুঝ? অথবা গড্ ও শয়তান এই উভয় ভাব বিশিষ্ট একব্যক্তিকে ধর? তাহাতে উত্তর পাইলাম 'আপনি' আমাদের ভাব লইয়া কি করিবেন; আপনি ঈশ্বর ও ভগবান্ কথাতে যাহা বুঝেন আমাদের মুখের ঐ দুই কথাতেও তাহা ধরিয়া নেন না কেন?" আমি বলিলাম, তাহা হইলে যে আমি প্রতারিত হই; তোমাদের ঈশ্বর ও ভগবান্ শব্দ যদি হট্টগোল বিশেষ হইয়া থাকে আর আমি তাহাই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্টভাবে বুঝিয়া লইতে যাই এবং তোমাদিগকে যথার্থ ঈশ্বরোপাসক বা ভগবদ্ভক্ত মনে করি, তাহা হইলে কি তোমাদের দ্বারা বঞ্চিত হইলাম না? অর্দ্ধশতাব্দীর ও পূর্ব্বে পল্লী সমাজে এই ভাবের ঈশ্বর ভগবান শব্দ লোক মুখে শুনি নাই; শুনিয়াছি দুর্গা কালী শিব প্রভৃতি। স্কুলের সম্পর্কে প্রথমে ব্রাহ্মদের গৃহীত ঈশ্বর পাইয়াছি; পরে ব্রাহ্মদল ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে ভগবান্ শব্দ জারি হইতে দেখি। যাহারা কথায় কথায় ঈশ্বর, ভগবান্ উচ্চারণ না করিয়া পারেনা, তাহারা কি শাস্ত্রমধ্যে ঈশ্বরের লক্ষণ এইরূপ ও ভগবানের সংজ্ঞা এইরূপ, এসকল জানিয়া বলে, না গোলে হরিবোল দেয়? 'ঈশ্বর' "ভগবান্" বলিয়া যে তোমরা গোলে হরিবোল দিতেছ, একথা তোমরা স্বীকার না করিলে ও আমার বুঝিবার বাকি নাই।

এই দুইটী শব্দ যে ভাবে শিক্ষিতদিগের মধ্যে আগত হইয়াছে,

তাহার ইতিহাস আমার এইরূপ জানা আছে ;—খ্রীষ্টান মিশনরীরা খ্রীষ্টমত প্রচারের জন্য প্রচার করিতেন, এদেশীয়েরা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা করাতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘটিয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে আমাদের (খ্রীষ্টানের) ন্যায় একতা হওয়ার আশা নাই। তখন কলিকাতার বাবুরা তেত্রিশ কোটি দেবতা ভাঙ্গিয়া একজন ঈশ্বর দাঁড়া করিলেন। এই ঈশ্বর শব্দ অবশ্য শাস্ত্রীয় শব্দ, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে ঈশ্বর শব্দের যে লক্ষণ রহিয়াছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে সেই বাবুদিগের অবকাশ ছিলনা। ফ্যাসন যেমন পুরাণ হইলেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় সেইরূপ ঈশ্বর শব্দের পরিবর্ত্তে এখন ভগবান্ শব্দের কাটৃতি হইয়াছে। ভাই! তোমরা কথায় কথায় ঈশ্বর বা ভগবান্ বলিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠের ভাণ করিতেছ, অথচ ঈশ্বর কি, ভগবান্ কি, ইহার কিছুই জাননা ; এদিকে দুর্গা, কালী, হরি, বিষ্ণু, শিব, মহাদেব প্রভৃতি বলিয়া অসভ্যতা প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত, তোমাদের এই ব্যবহারে আমি জ্বলিবনা কেন ? যাহারা ঈশ্বর ভগবান্ প্রয়োগ না করে তাহাদিগকে শাদাসিদা মনে করিতে পারি, তোমরা ভিতরে কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া ঈশ্বর, ভগবান্ বল, তাহাই আমার আপত্তির কারণ।

বাবুটী বলিলেন—"আমার ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবতার নিকট মানত করি, করিয়া ফল পাই এবং পূজা দিয়া থাকি ; অন্তরে শ্রদ্ধা না থাকিলে কি এসকল করিতে পারিতাম ?" আমি বলিলাম এ সকল তোমাদের শ্রদ্ধার কার্য্য নহে ; অন্তরের দুর্ব্বলতার ফল। তোমরা পূজা দিয়া যে প্রাচীন আনুগত্য করার ভাব দেখাইতেছ, ইহার মূলে প্রাচীন কর্ত্তাদের ন্যায় শ্রদ্ধা তোমাদের নাই বলিতেছি।

রাজা রামকৃষ্ণ, জমিদারী নিলাম হইলে যে জয়কালীর বাড়ীতে পূজাদিতেন তাহা শ্রদ্ধামূলক বলি, আর তোমরা মানস সিদ্ধি হইলে যে পূজা দেও, তাহা দুর্ব্বলতামূলক বলিতেছি কেন ?

উভয়ের সংস্কারের তারতম্য রহিয়াছে। যদি তাহা না হইত কেবল বাহিরের কার্য্য দেখিয়া ভিতরের শ্রদ্ধা ধরা হইত, তাহা হইলে আনিবেসেন্টকে হিন্দু বলিতে পারিতাম। তোমরা সেকালের হিন্দুদের অনুকরণে পূজা পাঠ করিতে পার, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়নিহিত শ্রদ্ধা যে তোমাদের মধ্যেও রহিয়াছে এমন বলিতে পারিনা। সমাজের বর্ত্তমান দশা সম্বন্ধে আমি এই সাক্ষ্য দিতে পারি যে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমরা (আমাদের সমসাময়িকেরা) প্রাচীন পুরুষের অনুষ্ঠিত সদাচারের প্রবাহকে অন্যমুখ করিয়া দিয়া নূতন স্রোতে গা ভাসান দিয়াছিল। তোমরা আমাদের প্রবর্ত্তিত নূতন স্রোতে ভাসিয়া আর প্রাচীন-দিগের শ্রদ্ধামূলক ধর্ম্মপ্রবাহ মধ্যে গতিলাভ করিতেছ না। তোমাদের এই বিপথগমনের ক্ষতিপূরণ করা চাই। তোমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয়ে পড়িয়াছ "মানবজাতি বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" ইহা সংস্কাররূপে তোমাদের মধ্যে দাগ লাগিয়া গিয়াছে। এখন যদি হিন্দুয়ানি করিতে চাও, তবে সেই দাগ পুছিয়া ফেলিতে হইবে। সেজন্য মনুষ্যজাতি অপেক্ষা বুদ্ধি ও অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন দেবজাতির অস্তিত্ব অগ্রে বুঝিয়া না লইলে চলিবেনা। ঈশ্বর ভগবান্ মানাদ্বারা সে ক্ষতির পূরণ হয় না।

আমরা ফ্রান্স, জর্ম্মণি ও আমেরিকা কখনও দেখি নাই ; অথচ ঐ সকল রাজ্যের অস্তিত্বের প্রতি আমাদের এত দৃঢ় আস্থা যে তাহাদের সহিত লটারি খেলা প্রভৃতি ব্যাপারে দূর হইতে অংশী হইয়া থাকি। স্বর্গ নামক স্থান এবং দেব নামক জাতি বিশেষের প্রতি প্রাচীন হিন্দুদিগের তেমন আস্থা থাকাতে তাঁহারা দেবোদ্দেশে ঐহিক অর্থ বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গের সিট (বাসস্থান) ক্রয় করিতেন। আমরা ঈশ্বর ভগবানে বিশ্বাস করিয়া কোন্ স্বার্থ ছাড়িয়া দেই বা কোন্ আয়াস স্বীকার করি? প্রাচীন হিন্দুরা কিন্তু দেবত্ব লাভ করিয়া স্বর্গ-বাসের জন্য মহাপ্রস্থান

ও সহমরণাদিতে দেহ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

আমার এই কথার পরে বাবু আমার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ত্তব্যোপদেশ জানিতে চাহিয়াছিলেন।

আজকাল অনেকে যেমন পুস্তক, পত্রিকা ও বক্তৃতা প্রভৃতিতে উপদেশ ছাড়াইয়া স্বমত প্রচার করিতেছে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মোপদেশ তেমন নহে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় শাসন এই যে, প্রশ্ন না করিলে অথবা অন্যায় মত প্রশ্ন করিলেও ধর্ম্মকথা বলিবে না; বলিলে, বক্তা ও শ্রোতা এই দুইয়ের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হয়। এজন্য ব্রাহ্মণগণ, হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন না। আমিও সাধারণকে ব্রাহ্মণের গুহ্য ধর্ম্মকথা বলিয়া দিতে পারিতেছি না।

আমি লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ না দিয়া তাহাদের অবলম্বিত মতের দোষ দেখাইতে চাই এবং বলি তোমরা এখন ঈশ্বর ভগবান্ ভজিয়া যে ধর্ম্মের ভাণ করিতেছ, ইহাতে যেমন আপনাকে তেমন পরকে ঠকাইতেছ। এই কথাটি তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলে, তাহারা বাহিরের শিক্ষা হইতে নিজের পছন্দমত যে ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার অসারতা বুঝিতে পারিবে এবং যথার্থ ধর্ম্মের জন্য তাহাদের পিপাসা জন্মিবে। তখন তাহারা গায়ে পড়িয়া ধর্ম্মোপদেশ দাতাদিগের ভাবগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। তখন তাহারা নিজে খাটিয়া অথবা যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে শাস্ত্রবিধি জানিয়া ধর্ম্মসাধনের সুবিধা পাইবে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধ যেখান হইতে আমাদের মধ্যে ঘুণ ধরিয়াছে, সেস্থান হইতে আমাদের কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ঘুণধরা স্থানটি কোথায়? অনুসন্ধানে পাওয়া যাইতেছে যে তেত্রিশ কোটি দেবতা ভাঙ্গিয়া তাহার স্থলে এক ঈশ্বর বা, ভগবান্‌কে স্থাপন করাতেই ঘুণ লাগিয়াছে। এদশা ৫০ বৎসরের কিছু অধিক কাল হইতে বঙ্গসমাজে আগত হইয়াছে। এখনকার ব্রাহ্মণ বর্ণের কর্ত্তব্য এই যে শাস্ত্র বাক্য যুক্তি দ্বারা

অনুভূতির সহিত মিলাইয়া এই কার্য্যটী উচিত কি অনুচিত হইয়াছে তাহা অবধারণ করেন। তেমন করিতে গেলেই ঈশ্বর, ভগবান্ বা দেবতা বলিয়া জীবন্ত কিছু রহিয়াছে কিনা, তাহা স্পষ্ট ধরা পড়িবে। যদি বুঝা যায় হাঁ, ঈশ্বর বা ভগবান্ ও তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং গঙ্গাদি তীর্থ, ইঁহারা সকলেই জীবিত আছেন, তবে দেখিতে হইবে, তাঁহাদের প্রকৃতি কিরূপ, এবং আমাদের সহিত তাঁহাদের কি সম্বন্ধ। এতদূর স্থির করিলে আমাদের যোগ্যতার সহ মিলাইয়া কাহার কোন দেবতা উপাস্য হওয়া উচিত এই বিষয়টী নির্ণয় করিতে হইবে। তাহার পরে কোন্ উপাস্য দেবতা কিসে অধিক সন্তুষ্ট থাকেন তাহাও শাস্ত্র হইতে জানিয়া লইতে হইবে। এইত হইল উপাসনা সম্বন্ধে। খ্রীষ্টানদের উপাসনা যেমন তাহাদের ধর্ম্মকার্য্যে, আমাদের উপাসনাকে ধর্ম্ম না বলিলেও চলে; কারণ, সচরাচর বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য দেবতাদির উপাসনা করিতে হয়। যদি উপাসনাই ধর্ম্ম হইত তবে সেই প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে যেমন উপাসনা অনাবশ্যক, তেমন ধর্ম্ম করাও অনাবশ্যক, হইত, কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম করা স্বাভাবিক; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিবর্ণের মনুষ্যদিগের প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

খ্রীষ্টানেরা জানেন গড্ দয়া করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এজন্য গডের নিকট তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাধ্য। ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা জানেন তাঁহারা ঈশ্বর, ভগবান্ আদি কাঁহারও দয়াতে সৃষ্ট হন নাই; জন্মার্জ্জিত কর্ম্মজনিত সংস্কার প্রভাবে এই জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেজন্য কাহারও নিকটই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবেনা, কেবল স্বভাবনিয়ত কর্ম্মগুলি করিতে হইবে।

এতদুপলক্ষে প্রাক্তন, বিধিলিপি, দৈব প্রভৃতি কথা শুনা যায়। কেহ কেহ মনে করে আমাদিগকে ইহজন্মে যেসকল কর্ম্ম করিতে

হইবে, তাহার একটা লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, আমরা একচুলও তাহার এদিক ওদিক্ করিতে পারিনা। এই মত সম্পূর্ণ যথার্থ নহে। আমার পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের সংস্কার হইতে ইহজন্মে আমার বিশেষ বিশেষ কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে বটে, কিন্তু সেই প্রবৃত্তি নিতান্ত অনিবার্য্য নহে। বিচারক যেমন আপনার পূর্ব্বকৃত নিষ্পত্তির অন্যথা করিয়া পুনর্ব্বিচার করিতে ক্ষমতা রাখেন, আমিও তেমন জন্মান্তরীয় সংস্কারের গতি অন্যমুখ করিতে পারি; কারণ, সেই কার্য্যের কর্ত্তা আমিই ছিলাম এখনও সেই কর্ত্তাই আছি, অতএব আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের গতি অন্যথা করিতে না পারিব কেন? এখানে কাঠিন্য এই যে, আমার জন্মান্তরীয় কর্ম্মজনিত সংস্কার, এই জন্মে স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এজন্য আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিনা। ইহারই নাম প্রেয়। এখন আমার কোন্ প্রবৃত্তি রোধ করিতে হইবে ও কোন প্রবৃত্তিকে বলবতী করিতে হইবে, তাহা স্থির করি কি দিয়া?—উত্তর শাস্ত্রদ্বারা। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রবিহিত পথে চলিবেন ইহাই শ্রেয়ঃ। সেই শাস্ত্রমতে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য কয়েকটি বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়। ব্রাহ্মণ স্বীয় জন্মগত স্বভাবকে ঐ গণ্ডীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিবেন। স্বধর্ম্ম সাধনের সেই গণ্ডী বা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম এই—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা। ব্রাহ্মণের প্রাত্যহিক সন্ধ্যাতর্পণাদির নাম— নিত্যকর্ম্ম। পুত্র জন্মিলে জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাসনাদি ও তদুপলক্ষে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ, ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়াদির পূজা প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম। বিহিত কর্ম্ম যথাযথ ভাবে করিতে না পারিলে তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনার জন্য দেবতা বিশেষের উপাসনা করার আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহার নাম উপাসনা।

এখনকার লোকে যে একমাত্র ঈশ্বর বা ভগবানের উপাসনাকেই ধর্ম্মকার্য্য মনে করে তাহা ভ্রমাত্মক ধারণা।

সাধারণে জানে ঐসকল নিত্যকার্য্যাদিদ্বারা বিশেষ কোন ফল লাভ হয় না, এজন্য তাহারা পৃথকভাবে ধর্ম্মকার্য্য করিতে চায়। আমরা জানি, ঐ নিত্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান নিষ্ফল নহে। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্মাদি অতি কঠিন; শূদ্রের নিত্যকর্ম্ম অতি সহজ। একমাত্র সেবাই শূদ্রের নিত্যকর্ম্ম বা ধর্ম্ম বলিয়া কথিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহ সেই স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম সম্যক অনুষ্ঠান করিয়া উঠিতে পারিলে, জ্ঞানলাভের যোগ্য হইতে পারে। সেই ব্রহ্মজ্ঞান, সকল বর্ণের পক্ষেই একরূপ। তাহারা স্ব স্ব জাতীয় স্বভাবানুযায়ী কঠিন ও সহজ কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ একই ফল লাভে সমর্থ হয়। ইহাকে আজকালকার লোকেরা পক্ষপাত মূলক ব্যবহার বুঝাইতে যত্ন করিতেছে। তাহার পরে, কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, সেই স্বভাবনিয়ত স্বধর্ম্ম সম্যক অনুষ্ঠান করিয়া উঠার পূর্ব্বে যদি মরিয়া যায়, তথাপি তাহার অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায় না। বরং তাহারই ফলে মরণান্তে ব্রাহ্মণ প্রজাপতিলোক, ক্ষত্রিয় ইন্দ্রলোক, বৈশ্য বিশ্বদেবগণের লোক এবং শূদ্র গন্ধর্ব্বলোক লাভ করিয়া স্বর্গভোগ করিতে থাকে। সেই ভোগ ক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে পূর্ব্বানুরূপ ব্রাহ্মণাদি বর্ণে জন্মলাভ করতঃ পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মের অবশিষ্ট ভাগের অনুষ্ঠান করে।

শাস্ত্রবিধি অনুসারে ধর্ম্ম সাধনোপলক্ষে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা ব্রাহ্মণদিগের কার্য্য। অন্য বর্ণ সকল ব্রাহ্মণের ব্যবস্থামতে চলিলে, তাহাদের ধর্ম্মপথে চলা হয়। তেমন ব্যবস্থা দানে দোষ ঘটিলে সেজন্য ব্রাহ্মণ দায়ী হন। ইহাতে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বিস্তর সুবিধা রহিয়াছে। নব্য পৈতাধারীরা সেই সুবিধা ছাড়িয়া দিয়া যে নিজেরাই ব্যাবস্থাপক হইতেছে, এখানেই তাহাদের মধ্যে কলির ঘূণ ধরিয়াছে বলা যায়। তাহারা যখন ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, তখন তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নাই। যেভাবে আমাদের মধ্যে ঈশ্বর ভগবানের উপাসনা আসিয়াছে তাহা বলা

হইল। প্রয়োজন সাধনের জন্য উপাসনা করিতে হয়। ঈশ্বর, ভগবান্, তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তীর্থ সমূহের সজীবত্ব নির্ণয় করিয়া উপযোগিতা অনুসারে উপাস্য স্থির করার কথাও বলা হইয়াছে। সেইরূপ করিয়া উপাস্য স্থির করিলে দেখা যাইবে ঈশ্বর, ভগবান্ অপেক্ষা, রুদ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাই সাক্ষাৎ ফলপ্রদ এবং এতকাল প্রয়োজন উপলক্ষে ঐসকল দেবতারই উপাসনা করা হইত। আমরা যে মনে করি, ঈশ্বর, ভগবান্ নামে আমরা কালী, দুর্গা, হরি প্রভৃতিকেই ডাকিয়া থাকি, এ আমাদের মহা ভ্রম। শাস্ত্রবিধি এমন নহে। আমরা ভাবি, "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।" বিষ্ণু আমাদের ভাবই গ্রহণ করিবেন, বিধিমত হউক আর নাই হউক, তাহাতে আট্‌কাইবে না। এসকল আমরা নব্যভাবের শিক্ষামতে প্রলাপোক্তি পোষণ করিতেছি। শাস্ত্র বলিতেছে—

যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

ভগবদ্গীতা ১৬শ অধ্যায়।

"যে শাস্ত্রীয় বিধান ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত সাধন করে, সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেনা, সুখ সাফল্য এবং পরম গতিলাভেও অসমর্থ হইয়া থাকে।"

আমরা ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ যে ভাবে ঈশ্বর বা ভগবানের ভজনা করিতেছি, তাহাই শাস্ত্রবিধি ছাড়া ইচ্ছামত সাধন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেহ এতদ্বারা যে সিদ্ধি, সুখ বা পরমগতি লাভ করিতে পারিয়াছেন, এমন কাহিনী আমরা কেহই অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। তাহাতেই এ সকল সাধন ভজন ও উপাসনা নিস্ফল বলিতেছি। প্রয়োজন সাধনের জন্য উপাসনা করিতে হয়। সেই প্রয়োজনটী ঐহিক স্বার্থ বা পারত্রিক স্বর্গ হইতে পারে। সেই স্বর্গ ও স্বার্থ-বিশেষ বই নহে।

অতএব দেখা যায় উপাসনাদ্বারা স্ব অর্থ হয়। তন্মধ্যে ঐহিক অর্থ নিকৃষ্ট ও পারত্রিক স্বর্গই উৎকৃষ্ট অর্থ। কিন্তু এই উভয় প্রকার অর্থই ক্ষয়শীল। যাহা অক্ষয় স্বার্থ তাহার নাম পরমার্থ। অতঃপর আমরা পরমার্থ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

ঈশ্বর ভগবানের প্রতি আমার এত আপত্তি কেন? আমি দেখিতেছি শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর বা ভগবানের স্বরূপ নিরূপণ করিতে গেলে কি হইয়া উঠে অথবা বস্তুতঃ তেমন কিছু প্রকৃতই রহিয়াছে কিনা, এই তথ্যটি কেহ জানেনা ও বুঝেনা; অথচ ভাসা ভাসা "ঈশ্বর" "ভগবান" ভজিতেছে; তাহাদের ভাব এই যে ঈশ্বর ও গড্ একই বস্তু। ইহাতে আমি দেখি ও বলি, এখনকার লোকেরা ঈশ্বর ভগবান নাম দিয়া গড্ ভজনা করিতেছে, সুতরাং ইহারা খ্রীষ্টান। যে খ্রীষ্টান হওয়া নিবারণ করার জন্য তেত্রিশ কোটি দেবতা ভাঙ্গিয়া একজন ঈশ্বর বা ভগবানকে উপাস্য করা হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে আমরা সেই খ্রীষ্টানই হইতেছি। অন্য হিসাবে দেখা যায়, হিন্দুর প্রসিদ্ধ পঞ্চোপসনার মধ্যে ঈশ্বর বা ভগবানের উপাসনা বলিয়া পৃথক কোন উপাসনা নাই।

লোকে যেমন মনে করে ঈশ্বর বা ভগবানের উপাসনাই হিন্দুর হিন্দুত্ব; আমি এই ভাবটীকে সম্পূর্ণ উল্টা দেখিয়া থাকি, কারণ, শাস্ত্রে প্রত্যেক হিন্দুর জন্য ঈশ্বর বা ভগবানের উপাসনা যে কর্ত্তব্য এমন কোন অবশ্য কর্ত্তব্য ব্যবস্থা দেখা যায় না; এবং ঈশ্বর ভগবান উপাসনা না করিলেও হিন্দুত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা হইতে পারে, ইহা বেশ বুঝা যায়। এক্ষেত্রে ৬০।৭০ বৎসর কালের প্রবর্ত্তিত ঈশ্বর বা ভগবদারাধনা রহিত হওয়া বাঞ্ছনীয় দেখিতেছি। কেবল বাঞ্ছনীয় নয়; স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য এই ঈশ্বর বা ভগবানকে দূর করিয়া দেওয়া আবশ্যকীয় হইয়াছে। আমদের মধ্য হইতে ঈশ্বর ভগবান দূর হইলে, আমরা প্রাচীন হিন্দুদিগের মত শাস্ত্র বিহিত দেবতারাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিব। ঈশ্বর ভগবান্‌দ্বারা

যে দেবতা পূজা নষ্ট করা হইয়াছিল, তাহাই আমরা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। যে ঈশ্বর ও ভগবান্ শাস্ত্র সম্মত নয়, প্রত্যুত গডের নামান্তরমাত্র, তাহা অচিরাৎ হিন্দুসমাজ হইতে উঠিয়া যাউক, ইহা বুদ্ধিমান্ হিন্দুমাত্রেরই স্বীকার করিতে হইবে।

গড্ বলিতে যীশুর পিতা ও শয়তানের প্রতিপক্ষ কোন ব্যক্তিকে ধরিতে হয়। গড্, শয়তানের নিয়ন্তা বা স্রষ্টা নহেন, তেমন তিনি মনুষ্যের সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি উভয়ের প্রেরকও নহেন। তিনি মঙ্গলময়, যত মাঙ্গলিক কার্য্য আমরা করিয়া থাকি তাহা গডের অভিপ্রেত ও কুকার্য্যগুলি শয়তান কর্ত্তৃক চালিত হইয়া আমরা করিতে বাধ্য হই; গীতার ভগবান্ কিন্তু তেমন নহেন। গীতার ভগবান্ বলেন —"সদসদমহমর্জ্জুন" অর্থাৎ সৎ ও আমি অসৎ ও আমি, সুতরাং ভগবান্‌কে গড্ ও শয়তান, এই দুয়ের কর্ম্মই করিতে হয়। গীতার ঈশ্বর ও তথৈবচ ;—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।"
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

অর্থাৎ ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে থাকিয়া (অতএব সর্ব্বব্যাপী নহে) প্রাণীদিগকে সদসৎ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। বলদেখি ভাই! এই ভগবান ও ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট (Passive) হইয়া পড়িয়া থাকা কি আমার উচিত? উনি যখন উভয়দিকেই আমাদিগকে পরিচালিত করিতে পারেন, তখন তাঁহার প্রতি ভরসা কি? তিনি অসৎপথে চালাইয়া যখন আমাকে নরকে নিপাতিত করিতে পারেন, তখন কোন আশাতে আমি তাঁহার চালনার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি? এবিষয়ে ঈশ্বরও ভগবান্ অপেক্ষা বরং গডের প্রতি কিছু বেশী প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। তিনি যদি শয়তানের সহিত যুঝিয়া জয়লাভ করিতে পারেন তাহা হইলেই আমার মঙ্গল পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা হয়। আমরা এখানে ঈশ্বর ও ভগবানের

সহিত গডের পার্থক্য কিয়ৎ পরিমাণে দেখাইলাম। তোমরা কি তাহা স্বীকার কর? করিলে, গডের অনুবাদে ঈশ্বর শব্দ বসাইতে না। ঈশ্বর ও ভগবান্‌কে মঙ্গলময় বলিতে পারিতে না। শাস্ত্রের ঈশ্বর ভগবান্ যেমন মঙ্গলময়, তেমন অমঙ্গলময়ও। নতুবা তাহার রাজ্যে যেমন জন্ম তেমন মৃত্যু হইত না।

ব্রাহ্মমত প্রবর্ত্তকেরা যে হিন্দুদিগের খ্রীষ্টান হওয়ার স্রোত রোধ করার জন্য এক ঈশ্বরকে সমস্ত হিন্দুর একমাত্র উপাস্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, তাহাতেই গোল বাঁধিয়াছে। তাহারা যদি শাস্ত্রীয় ঈশ্বর শব্দটীকে গডের বিশেষণে ভূষিত করিয়া নূতন মত প্রচার না করিত; প্রত্যুত হিন্দুর বহু দেবতা উপাসনার আবশ্যকতা হিন্দু সাধারণকে বুঝাইতে যত্নপর হইত, তাহা হইলে আজি ব্রাহ্মদলকে নেড়ানেড়িদের ন্যায় সমাজ ভ্রষ্ট হইতে হইত না; আর তাহাদের প্রদর্শিত ঈশ্বর বা ভগবান্ ধরিয়া যে আমরা পৈতৃক হিন্দুধর্ম্ম হারাইতে বসিয়াছি, আমাদেরও এই দুর্দ্দশাকে আলিঙ্গন করিতে হইত না।

আধুনিকেরা কথায় কথায় যেভাবে ঈশ্বর বা ভগবানের নাম করিয়া আপনাদের হিন্দুয়ানি ফলাইয়া থাকে শত বৎসরের পূর্ব্বকার হিন্দুরা এরূপ করিলে তৎপ্রতি কোন কথাই হইতে পারিতনা; কারণ, তাহারা তখন পুরুষপরম্পরাগত সদাচারের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিত; এখনকার মনুষ্য ফ্যাসন বা খেয়াল ধরিয়া চলে সুতরাং ইহারা অন্তঃসার-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা যদি বুঝিতে পারিত গীতায় ঈশ্বর লোকদিগের সুমতি কুমতি উভয়ই যোজনা করেন অথবা যদি বুঝিত ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা ঈশ্বরোপাসক ছিলেন না, দেবতাদিগের পূজা করিতেন, আর নব্যদিগের যদি জানা থাকিত যে মিশনারিদিগের কথায় হিন্দু সন্তানদিগকে খ্রীষ্টান হইতে দেখিয়া শিক্ষিতেরা খ্রীষ্টানদিগের এক গড্ ভজনার অনুকরণে প্রাচীন ব্যবহার মত

বহু দেবতা পূজার পরিবর্ত্তে ঈশ্বরভজনা চালাইয়াছে; শাস্ত্রীয় ঈশ্বর কি বস্তু, এবং সমাজে তাহার ভজনা চলিতে পারে কিনা, একথা তখন হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছিল না। তাহা হইলে সমাজের অবস্থা অন্যরূপ হইত।

গীতা হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যে শ্লোকটী দেখান গেল, তাহা দ্বারা ঈশ্বর যে উপাস্য অথবা ঈশ্বর মঙ্গলময় এমন কোন কথাই বলা হয় নাই। 'সেই ঈশ্বর কথাটী অন্য শব্দদ্বারা বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় আমাদের জন্মান্তরীয় যে সকল কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মজনিত সংস্কারদ্বারা আমরা পরিচালিত হইয়া থাকি, এখানে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বর শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ঈশ্বর শব্দটী প্রভুত্ববাচক, আমাদের জন্মান্তরীয় কর্ম্মজনিত সংস্কার, অথবা সেই সংস্কারময়ী প্রকৃতি বা স্বভাবই ইহজন্মে আমাদিগকে পরিচালিত করিয়া প্রভুত্ব করিতেছে। অতএব তাহার নাম—ঈশ্বর। উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকদ্বারাই এই ভাব ধরা যায় যথা—

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিংয়োক্ষ্যতি॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মনা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপিতৎ॥

"হে অর্জ্জন। তুমি যে অহঙ্কার সহকারে আমি যুদ্ধ করিবনা বলিতেছ, তোমার এই স্বাধীনতা নাই, তোমার প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত করিবে। জন্মজন্মান্তর-কৃত কর্ম্মদ্বারা স্বভাব বা প্রকৃতি গঠিত হয়, সেই স্বভাবদ্বারা নূতন কর্ম্ম করিতে বাধ্য; তুমি স্বভাবজাত কর্ম্মদ্বারা এতই বাধ্য হইয়া রহিয়াছ যে মোহ বশতঃ যে যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইতেছ অবশ হইয়া সে যুদ্ধ করিয়া ফেলিবে।" এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয় স্বভাবের প্রতি নির্ভর করিয়া বলিলেন, "তোমাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে।" এখনকার হিন্দু সমাজের মধ্যে তেমন ক্ষত্রিয়াদিবর্ণ বিদ্যমান্ না থাকাতে,

তাহাদের স্বভাব ধরিয়া তোমার এই কার্য্য করিতেই হইবে এমন বলা যায় না বটে কিন্তু প্রত্যেকেই জন্মান্তরীয় স্বভাব বা প্রকৃতি দ্বারা যে চালিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে সেই পরিচালক প্রভুত্বকারী সংস্কার বা স্বভাবকে ঈশ্বর বলা হইল।

আমাদের লোকনাথ ব্রহ্মচারী এইরূপ প্রভুত্বকারী স্বভাব বা প্রকৃতি কিম্বা কর্ম্মজনিত সংস্কার অর্থাৎ ঈশ্বরকে কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। সংসারময় ঈশ্বরকে যত কেন তোষামদ না কর, সে তোমাকে প্রাক্তন বিহিত পথে চালাইতে ছাড়িবে না। আমাদের মধ্যে কেহ কি এই ভাব স্বীকার করিতে পারে? অথচ সকলেই ঈশ্বর ভক্ত।

হিন্দুগণ যে এতকাল শাস্ত্রবিহিত দেবতাদিগের পূজা করিতেন, তাহা লোপ করার জন্য আধুনিকেরা তাহাদের মধ্যে অর্থশূন্য ঈশ্বর নামধারী গড্‌কে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। তাহারা ভাবে, আমরা সভ্যতার আলোকে ক্রমোন্নতির সোপান দেখিয়া দেবতা ছাড়িয়া ঈশ্বর ভজনাতে উন্নীত হইলাম, ধন্য আমরা। আমি ভাবি যদি কোন কলকৌশলে এই ফ্যাসনের ঈশ্বর বা ভগবান্‌কে হিন্দু সমাজ হইতে সরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তখন আমরা শাস্ত্রীয় পথের অনুসন্ধান করার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিব। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন আধুনিকেরা আমাদিগকে ঈশ্বর বা ভগবান নামক মোয়া হাতে দিয়া ভুলাইতেছে, বুঝিতে হইবে।

নব্য হিন্দুরা আমাদের উপরে একজন ঈশ্বর বা ভগবান্ নামক সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন বলাতে ধর্ম্মসাধন হইতেছে মনে করে; এরূপ করার কোন ভিত্তি নাই। প্রথম বয়সে ব্রাহ্ম ভ্রাতারা আমাদিগকে বুঝাইতেন যে আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাসটা সহজ জ্ঞানপ্রসূত, অর্থাৎ মনুষ্যের অন্তঃকরণ জন্মাবধি এমনভাবে গঠিত যে তাহাতে ঈশ্বর মানিতে হয়। বয়ঃস্থ হইয়া দেখি, ওরূপ বলার কিছুমাত্র মূল্য নাই। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মমত প্রচারক ভিন্ন কোন হিন্দু

এরূপ ঈশ্বর বিশ্বাস করিতেন না। জন্মান্তরীয় কর্ম্মানুসারে আমরা এই জন্ম ধারণ করিয়াছি,—ঈশ্বর বা ভগবানের কৃপাতে নহে। ব্রাহ্ম ভ্রাতারাই খ্রীষ্টানের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, ঈশ্বরের অপার করুণা, তিনি জন্মগ্রহণ করার পূর্ব্বেই আমাদের জন্য মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। এমন কথা কোন শাস্ত্রেই নাই; এই ভাবটী, বাহিরের শিক্ষাদ্বারা আমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে।

ফলতঃ গত পঞ্চাশ বৎসরে আমরা এমন বিকৃত হইয়া উঠিয়াছি যে আমাদিগকে প্রাচীন হিন্দুদিগের বংশধর বলিয়া সহজে চেনা যাইতে পারেনা। তখনকার হিন্দুদিগের মত গঠন হইত, শাস্ত্র ও পূর্ব্বপুরুষগণের আচরণ হইতে, এখনকার হিন্দুর মত গঠন হইতেছে,—স্কুল, কলেজ সংবাদপত্র ও বক্তৃতা প্রভৃতি হইতে; এরূপ উল্টা চালে চলিয়া আমরা ভিত্তিহীন ধর্ম্মমত পোষণ করতঃ বিকৃত হইতে বাধ্য হইতেছি; তাহাতেই ঈশ্বর ভগবান্ কথাতে শাস্ত্রে কোন্ বস্তুকে বুঝায় সেইদিকে খেয়াল না করাতে ঐ দুইটী কথা উচ্চারণ হইলেই আমাদের অন্তরে খ্রীষ্টানের গডের ভাবটী উদিত হয়। এজন্য বলিতে ছিলাম, নব্য হিন্দু! বাহিরের শিক্ষা হইতে লব্ধ এই ভিত্তিহীন ঈশ্বর, ভগবান্‌কে অন্তঃকরণ হহতে সরাইয়া দেও, এবং সেইস্থলে কাহাকে বসাইতে হইবে, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্থির কর। তোমরা যে কোন্ দিকে ভাসিয়া চলিয়াছ, তাহা একটু ভাবিয়া দেখ। এতকাল ভাবিতে আমরা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি; এখন সেই ক্রমোন্নতির স্রোতঃকে অসভ্যতাতে প্রতিহত হইতে দেখিতেছ না কি? তাহা না হইলে কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, প্রভৃতি, শেষ বয়সে সুর বদলাইতেন না। বিলাত ফেরৎ সাহেব বাবুরা প্রায়শ্চিত্ত করার পাতি খুঁজিতে ব্যস্ত হইতেন না।

আমরা 'ভগবদ্গীতার লিখিত—"ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে হর্জ্জুন তিষ্ঠতি" এই শ্লোকের ঈশ্বর শব্দে জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম জনিত

সংস্কার প্রকৃতি বা স্বভাবকে বুঝায়, এই ব্যাখ্যা করিয়াছি। এতৎ প্রতি আপত্তি হইয়াছে যে, সংস্কার নিৰ্জ্জীব ও আমাদের কৃত, তাহা ঈশ্বর হয় কিরূপে? উত্তর—আমার ও তোমার এই শরীর নিৰ্জ্জীব এবং তাহা পিতা মাতার কৃত, কিন্তু আমি তুমি নির্জ্জীব বা পিতা মাতার কৃত নহি। অথচ আমার তোমার শরীর লক্ষ্য করিয়াই আমাকে তোমাকে দেখাইয়া দিতে হয়; তেমন সংস্কার গুলি ঈশ্বরের শরীর। সেই সংস্কাররূপ দেহকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরের প্রতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অনন্ত জীবপুঞ্জের অনাদি কালের কৰ্ম্মসমূহ হইতে জাত সংস্কারদ্বারা ঈশ্বরের শরীর রচিত হয়। এই হিসাবে অনন্ত জীবগণ ঈশ্বরের দেহ-কর্ত্তা। আবার প্রলয়ে যখন সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয়, ব্যক্ত জগৎ অব্যক্ত হইয়া যায়, আমাদের সংস্কার সমূহ অব্যক্ত কারণরূপে বিদ্যমান থাকে, তখন আমাদের ও যে দশা ঈশ্বরের ও সেই দশা। কাহার ও পৃথক দেহ থাকে না। আমরা ও ঈশ্বর, সকলেই সেই কারণে মিশিয়া থাকি। প্রলয়ান্তে পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভসময়ে সেই অব্যক্ত সংস্কার ব্যক্তরূপ ধারণ করে। তখন ও সংস্কার সমূহের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয় না, একই থাকে; তৎকালে সেই মিলিত সংস্কার-রাশিকে ঈশ্বরের স্বয়ম্ভু-দেহ অর্থাৎ স্বয়মুৎপন্ন শরীর বলা যায়। সেই সময়ের সমষ্টি সংস্কাররাশি যখন ভাগ হইতে থাকে, তখন বলা হয়, ঈশ্বর বহু হইয়া জন্মিতে ইচ্ছা করিলেন। এই ভাবে সংস্কারের প্রস্ফুটনে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দেহ হইয়াছে। আমরা এই ভিন্ন ভিন্ন দেহে কৰ্ম্ম করাতে যে সংস্কার জন্মে তাহা ঈশ্বরের সংস্কারময় দেহকে পুষ্ট করিতে থাকে। আমরা আবার সেই ঈশ্বরের দেহগত সংস্কারদ্বারা চালিত হইয়া নূতন কৰ্ম্ম করিতে থাকি। কখনও উৎকৃষ্ট সংস্কার অর্জ্জন করিয়া স্বর্গে যাই, কখন বা অপকৃষ্ট সংস্কারদ্বারা নরক ভোগ করি; কদাপি মধ্যবিধ সংস্কারে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। সেই সংস্কারের বলে চালনাটী ইহ জন্মে কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের হৃদয় হইতে নির্গত

হওয়াতে বলা হইয়াছে ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে থাকিয়া জীবদিগকে যন্ত্রারূঢ়বৎ চালনা করেন। আমরা ব্যষ্টি-সংস্কার দেহধারী, আর ঈশ্বর সমষ্টি-সংস্কার-দেহধারী, এইমাত্র প্রভেদ।

উপরে অনাদিকালীয় অনন্ত জীবপুঞ্জের সংস্কারকে আমাদের দেহধারণের মূল বলা হইল। প্রলয়কালে সেই সংস্কার অব্যক্ত হইয়া কারণাবস্থাতে থাকে, সৃষ্টির আরম্ভে তাহা সূক্ষ্মরূপে অভিব্যক্ত হইয়া ক্রমে স্থূল জগতে পরিণত হয়। এখন আমাদের দৃশ্য বা জ্ঞেয় জগৎকে সেই সংস্কাররাশির স্থূলপরিণাম বুঝিতে হইবে, ইহার অন্য নাম জড়জগৎ। এখন দেখিতে হইবে এই জড়জগৎ ছাড়া আর কিছু আছে কিনা?

তোমরা যে মনে কর ইহার একজন পৃথক্ নির্ম্মাতা রহিয়াছেন, নতুবা জগৎ নামক জড়পদার্থ এরূপ পরিপাটিরূপে সংস্থিত হইতে পারিত না। সেই নির্ম্মাতাই ঈশ্বর। এই যুক্তি ধরিয়া ঈশ্বরাস্তিত্ব স্থির হইতে পারেনা। যদি পারে বলিয়া জিদ্ কর, সেজন্য বলিতেছি, তোমার ঈশ্বরনিরূপণের সূত্র হইল, জগৎ আছে বলিয়া তাহার কর্ত্তা মানিতে হইবে। কিছু থাকিলে তাহার একজন সৃষ্টিকর্ত্তা থাকা চাই। এই সূত্রমতে ঈশ্বর নামক কর্ত্তার ও এক কর্ত্তা স্বীকার না করিয়া পারা যায়না, কারণ ঈশ্বর নামক কিছু রহিয়াছে, অতএব তাহারও একজন কর্ত্তা থাকিবে। আবার সেই কর্ত্তার ও নূতন অন্য কর্ত্তা মানিতে হয়, এই ভাবে ঈশ্বরের ঈশ্বর, তাহার ঈশ্বর ধরিতে গেলে, অনবস্থা দোষ ঘটে। কোন শাস্ত্রেই এইভাবে ঈশ্বর নিরূপণ করিতে দেখা যায় না।

ঈশ্বর ত দূরের কথা, আমি আছি কিনা প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। আমি কে? জড়জগৎকে যে জানিতেছে সেই আমার আমি। অতএব মোটের উপর দুইটী রাশি হইল। একটী আমি নামক কর্ত্তাকারকের কর্ম্মপদ অর্থাৎ জ্ঞাত জড়জগৎ, দ্বিতীয়টী আমি নামক কর্ত্তৃকারক অর্থাৎ জ্ঞাতা, চেতনবস্তু। সেই আমাকে আমি

জানিতে পারিতেছিনা বলিয়া আমাকে অনির্দ্দিষ্ট (X) চেতনবস্তু ধরিতে হয়।

লোকনাথব্রহ্মচারী এই X এর মান বাহির করিতে পারিয়াছিলেন; অর্থাৎ জড় জগৎ হইতে আত্ম-সত্তাকে পৃথক করিতে পারিতেন। অন্যেরা তেমন করিতে পারে না।

এখন স্থির হইল তুমি, আমিও তিনি এক একটী অনির্দ্দিষ্ট চেতন বস্তু। জড়ের সহিত চেতন এমন ভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে যে, কিছুতেই ইহাকে বিভক্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি কর্ম্ম করিয়া সংস্কার অর্জ্জন করি; সেই সংস্কার অনুসারে পুনর্জ্জন্মে নূতন দেহ ধারণ করিয়া নূতন কর্ম্ম করিতে বাধ্য হই। একবার যেমন আমি (দেহাশ্রিত চেতন), সংস্কারের জন্মদাতা হই, পুনরায় সেই সংস্কার আমাকে নূতন দেহে যোজিত করিয়া আমার জন্মদাতা হইতেছে। এখন আমিই সংস্কারময় জড়ের আদি, না সংস্কারময় জড়ই আমার আদি, একথা নির্ণয় করার উপায় নাই।

শাস্ত্র, এই সংস্কারময় জড়কে প্রকৃতি (স্বভাব) ও চেতনকে (পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ) নাম দিয়া, পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয়কেই অনাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমার সহিত জড়ের সংযোগও অনাদি। অতএব সংস্কার আদি কি আমি আদি এ প্রশ্ন হইতে পারে না। এখন হইল তুমি, আমি ও তিনি এক এক জন চেতন (পুরুষ)। তোমাতে আমাতে ও তিনিতে জড়দেহের সম্বন্ধ-নিবন্ধন পার্থক্য থাকিলেও চেতন হিসাবে আমরা তিনই এক। এই ভাবটী বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মচারিবাবা তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন "তুমি যদি আঁধার ঘরে থাক, এবং কেহ জিজ্ঞাসা করে, ঘরে কে? তুমি উত্তর দেও 'আমি'। আমি যদি আঁধার ঘরে থাকি এবং কেহ জিজ্ঞাসা করে, ঘরে কে? আমিও বলি 'আমি'। আচ্ছা জগতে নামে নামে (একনামের দুইজনে) এত মিত্রতা হয়, এই 'আমিতে' 'আমিতে' কি একটা বিরাট

মিত্রতা হইতে পারে না?" এইরূপে সমস্ত জীবপুঞ্জের সেই একীভাবের নাম ঈশ্বর।

এই হিসাবে ঈশ্বর নিরূপন হইয়া থাকে। সংস্কারময়ী প্রকৃতি ও চেতন পুরুষ উভয়ই নিত্য বলিয়া ঈশ্বর নামক সমষ্টি পুরুষ জড়ের স্বষ্টিকর্ত্তা নহে। আমি নামক ব্যষ্টি পুরুষের সহিত জড় জগতের যে সম্বন্ধ, ঈশ্বর নামক সমষ্টি পুরুষের সহিতও জড়ের সেই সম্বন্ধ। এজন্য কোন শাস্ত্রেই ঈশ্বরকে জগৎ-কর্ত্তা বলেনা, অথচ পুরুষেয় অধিষ্ঠান প্রযুক্ত পূর্ব্বতন কল্পের জীব সমূহের সংস্কাররাশি নূতন স্বষ্টিতে পরিপাটিরূপে বিকাশ পাইতেছে।

কলির মনুষ্য এতদূর বিচার করিয়া জগদ্ব্যাপারের ভাব যাহাতে বুঝিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে আধুনিকেরা আমাদের মধ্যে জগতের একজন পৃথক্ কর্ত্তার অস্তিত্ব প্রচার করিয়া থাকে। আমরা সকলে সেই ভাব গ্রহণ করিলেই কলি-রাজের রাজ্য বিস্তার ঘটে। সেই একজন কর্ত্তা স্থির হইলে, তাহাতে হিন্দুর ঈশ্বর বা ভগবান্, খ্রীষ্টানের গড্ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে সুতরাং কলির একাচারের আর বিলম্ব থাকিবে না।

ব্রাহ্মণ কলির এই যুগধর্ম্ম বিদিত আছেন এবং নীরবে তাহার ভাব ভঙ্গী প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

ঈশ্বর নামক আমাদের স্বষ্টি-কর্ত্তাকে আমা হইতে পৃথক্ ধরিলে আমি কিছু নই। আমি থাকি এই ইচ্ছা যতকাল ঈশ্বর পোষণ করিতেছেন ততদিনই আমার অস্তিত্ব, তাহার পূর্ব্বে ও পরে আমার অভাব। ইহাও একরূপ নাস্তিকতা। আপনার অস্তিত্ব রহিত করাই নাস্তিকের কর্ম্ম। বুদ্ধও মহাশূন্যে প্রবেশ করিয়া সেই অভাবে মিশিতে গিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ চেতন (পুরুষ) ও জড় (প্রকৃতি) উভয়কে নিত্য জানাতে তাঁহার নিজের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। তিনি আপনাকে পুরুষ বা চৈতন্যবস্তু জানাতে সমষ্টি পুরুষ ঈশ্বরকে না মানিলেও প্রকারান্তরে

মানিতেছেন বলিতে হয়। কেহ ক্ষুদ্র জলাশয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া সমষ্টি জলরাশির অস্তিত্ব না মানিলেও কি সে জলাস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছে বলা যাইতে পারে? এই ভাবে চিন্তা করিলে আস্তিক ষড়্ দর্শনে, ঈশ্বরাস্তিত্বের জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখায় কারণ বুঝা যাইবে।

আধুনিকেরা আমাদিগকে ঈশ্বর মানাইয়া আমাদের অস্তিত্ব-বিলোপ করাইতে চায়। দর্শনশাস্ত্রে সেই ঈশ্বরের প্রাধান্য দেখাইতে না পারাতে তাহাদের মতের দুর্ব্বলতা ঘটে; এজন্য তাহারা গীতায় ঈশ্বরবাদ দেখাইতে যত্ন করিতেছে। গীতায় একটী মাত্র শ্লোকে যে ভাবে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী শ্লোকের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম যে সেই ঈশ্বর তাহাদিগের কল্পিত ঈশ্বর বা গড্ নহে, তাহা জীবগণের কর্ম্ম-সংস্কার বা প্রকৃতি কিম্বা সকলের কর্ম্মসমষ্টিমাত্র। ইহার পরেও যদি তোমরা ঈশ্বর নামক একজন পৃথক্ সৃষ্টিকর্ত্তাকে মানিতে পার, তবে তোমাদের পরের কথায় নির্ভর করার প্রবৃত্তির বলবত্তা স্বীকার করিতে হইবে।

পরমার্থ কি?

দরিদ্রেরা সামান্য অর্থের জন্য ধনবানের উপাসনা করে, শিক্ষিতেরা চাকরগীরির জন্য উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির উপাসনায়রত প্রাচীনেরা সকল প্রকার অর্থের জন্য বিবিধ দেবদেবীর আরাধনাতে নিযুক্ত ছিলেন; এই সকল হইল ঐহিক অর্থের উদাহরণ। শাস্ত্রে রহিয়াছে স্বর্গকামী ব্যক্তিরা যজ্ঞ করিবে। ত্রিশঙ্কু নামক নরপতি স্বশরীরে স্বর্গে যাওয়ার জন্য বিশ্বামিত্র দ্বারা যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ইন্দ্রলোক প্রাপ্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমরা পিতৃলোকের স্বর্গলাভের নিমিত্ত গয়ায়পিণ্ডদান, ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইয়া থাকি। এসকল পর-

কালের অর্থের উদাহরণ। সাংখ্য নিষ্ঠ ও যোগনিষ্ঠ মুনিগণ যেরূপ স্বার্থের জন্য জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ আশ্রয় করিতেন, তাহা ঐ দুই উদাহরণে প্রদর্শিত ঐহিক বা পারত্রিক অর্থ নহে, তাহা ঐ দুই প্রকার অর্থ ও অন্য সর্ব্বপ্রকার অর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া, তাহার নাম—পরমার্থ।

রাম মহাভক্ত,—ঠাকুর ঠাকুর বলিয়া আকুল; দিনে তাঁহার দশবার সমাধি অর্থাৎ দশা হইয়া থাকে; রাম সর্ব্বদা ঐ ভাবাবেশে আত্মহারা। শ্যাম, ভাবে এতটা বিভোর নহেন, কিন্তু ঈশ্বর ভগবান্ বা গড্ নামধারী কাহারও দাসানুদাস হইয়া থাকিতে চান। এই রাম ও শ্যাম, কেহই আপনার স্বাধীনতা চাহেন না। ভাবে বিভোর হইয়া আত্মহারা হওয়া অপেক্ষা আপনাকে বজায় রাখিয়া থাকা কি তপেক্ষাকৃত শ্লাঘ্য নহে? শ্যামের ন্যায় অন্যের দাসানুদাস হওয়া অপেক্ষা স্বাধীনতা রক্ষা করা কি প্রশংসনীয় নয়? উপরোক্ত সাংখ্য ও যোগনিষ্ঠ মহাত্মাগণ, আপনাকে না ডুবাইয়া ভাসাইয়া রাখিতে চান। জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগদ্বারা অবিমিশ্র আত্মসত্তাতে থাকা যায; তাহাই আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা। সেই পূর্ণ স্বাধীনতাতে আমাকে কোন প্রকার অর্থ, সম্পদ্ বা ভোগের দিকে হেলিতে দুলিতে হয় না; তাহাই পরমার্থ। প্রাচীন ঋষি মুনিগণ ভিন্ন, অন্য কেহই এই পরমার্থের সন্ধান জানেনা। তাহাতে অহিন্দুগণ মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরাদি ভিন্ন ভিন্ন নামধারী উপাস্যের উপাসনা করিয়া আপনাকে তাঁহার অনুগত করে। অন্যেরা তেমন কিছুই মানেনা, ইংরাজিতে তাহাকে এথিষ্ট (Atheist) বলে। ইংরাজিশিক্ষিতেরা যেমন গড্‌কে ঈশ্বর বলে, তেমন ঐ এথিষ্ট (Atheist) দিগকে নাস্তিক আখ্যা দিয়া, উপাস্যানুগত থিইষ্ট (Theist) দিগকে আস্তিক বলিতে চায়। শাস্ত্রীয় ভাষাতে এথিষ্টকে নাস্তিক বলা চলে, কিন্তু তোমাদের থিইস্টকে আস্তিক বলার উপায় নাই; কারণ তাহারা নাস্তিকের

(Atheist) ও অধম। নাস্তিকেরা বিচার করিয়া আনুগত্য করার জন্য কোন উপাস্য বস্তুকে পায় না, স্বাধীন ভাবে থাকিয়া কোন উপাস্যকে মানেও না। উপাসকেরা তেমন নহে; তাহাদের বিচার করার সামর্থ্য নাই, আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া থাকিতেও পারে না। তাহারা মতপ্রচারকদিগের কথায় ভুলিয়া অথবা দশজনের দেখাদেখি একজন উপাস্যকে আপনার প্রভুত্বে বরণ করতঃ স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।

হিন্দুদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ না করিয়া দেবতা বিশেষের উপাসনাতে নিযুক্ত হয়, তাহাদিগকে বিচার বিহীনতা-নিবন্ধন ঐ হিসাবে নাস্তিকদিগের নীচে ধরা যাইতে পারিলেও, অন্য হেতুতে তেমন বলা যায় না। তাহারা কোন মত প্রচারকের অনুসরণ করেনা। স্বাভাবিক আস্তিকতা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ যে অভ্রান্ত বেদকে আপনাদের পথ প্রদর্শক করিয়া চলেন, ব্রহ্মণানুগত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিবর্ণও সেই বেদের আদিষ্ট দেবতা আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাতে তাহাদের অন্ধ-পরম্পরা ঘটেনা, বরং সৃষ্টিসময়ে বেদবাক্যানুসারে যে সকল স্বর্গ সৃষ্ট হইয়াছে, বেদের শাসনদ্বারা এই উপাসকেরা মরণান্তে সেই সকল স্বর্গভোগ করতঃ কালক্রমে সাংখ্য বা যোগ নিষ্ঠা লাভ করিতে সুতরাং পরমার্থ পথে চলিতে সমর্থ হয়। বেদবিমুখ অন্যান্য মনুষ্যদিগের স্বর্গ বা পরমার্থ লাভের সম্ভাবনাই নাই। স্বর্গ নামক ভোগস্থান বেদের শাসনে সৃষ্ট হওয়াতে তাহা বেদাবলম্বীদিগের নিজস্ব হইয়াছে।

নব্য হিন্দুরা যদিও শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর বা ভগবানের উপাসনা করেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের উপাস্যের নাম মাত্র শাস্ত্রীয় হইলেও উপাসনার ভাব শাস্ত্রীয় না হইয়া অশাস্ত্রীয় হইতেছে, একথাই আমার বক্তব্য। এজন্য আমি জানি এ সকল উপাসনা ও নাস্তিকতার নিম্নস্তরে স্থিত। শাস্ত্রে যদি ঈশ্বর বা ভগবানের উপাসনার বিশেষ বিধি থাকিত এবং নব্যেরা তাহার

অনুষ্ঠান করিতেন তাহা হইলে আমার কোনই আপত্তি ছিলনা।

প্রাচীন নাস্তিক বুদ্ধ নাকি মরণকালে বলিয়াছিলেন,— আমি কিছুতেই দুঃখকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিনা। সেই দুঃখের হাত হইতে এড়াইবার জন্য আমাকে অভাবে পরিণত করিতেছি; তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখেরও অভাব ঘটিবে, সুতরাং তখন আমার দুঃখ দূর হইবে। চরমে এই শূন্যতাই বৌদ্ধ-নির্ব্বাণ। সাংখ্য বা যোগনিষ্ঠ আস্তিক ব্রাহ্মণ, কিছুতেই এই ভাবে আত্ম-নাশের পক্ষপাতী হইতে পারেন না। তিনি সেই চরম শূন্য বা বৌদ্ধ নির্ব্বাণ অতিক্রম করিয়া একক থাকা নামক পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেন। সেই শূন্য বা আকাশকে অতিক্রম করার সঙ্গে দুঃখাদি দ্বৈত-প্রপঞ্চ ও অতিক্রম করা হইয়া থাকে। আমি বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি চরমে কি চাও? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন— "আমি একা থাকিতে চাই।" ইহাই ব্রহ্মচারীর পরমার্থ ছিল।

বুদ্ধ যেমন চরমে অভাব বা শূন্যকে স্থির করিয়াছিলেন, (নাস্তিকের মতে কিছুই নাই সমস্তই শূন্য) আস্তিক ব্রাহ্মণ তেমন সেই শূন্যকেই চরম জানেন না; তাঁহার শাস্ত্র-চক্ষুর দৃষ্টি ঐ অভাবে নিবদ্ধ নহে; —"পর আকাশাৎ অজ আত্মা" এই শ্রৌত দৃষ্টিতে সেই বৌদ্ধ নির্ব্বাণস্বরূপ মহাশূন্যের পরে আত্মসত্তা রহিয়াছে দেখেন। বৌদ্ধদিকের দৃষ্টি মহাশূন্যে পর্য্যবসিত (কিছুই নাই) বলিয়া তাহাদিগকে (ন+অস্তি+ক) নাস্তিক বলা হয়; শাস্ত্র-চক্ষু-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের দৃষ্টি 'আত্মা আছে' ইহাতে শেষ হওয়াতে তাদৃশ ব্রাহ্মণকে (অস্তি+ক) আস্তিক বলা হইয়া থাকে। নাস্তিকের মতে চরমে শূন্য হওয়াতে এই জগত শূন্য অর্থাৎ নাস্তি হইতেছে; আস্তিক ব্রাহ্মণ নাস্তিকের মহাশূন্যের অভ্যন্তরে সত্যবস্তু (আত্মা) রহিয়াছে বলাতে "জগতকে কেবল শূন্য বলিতে চাননা, চরমে সত্য অস্তি" বলিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ মাতৃগর্ভে আগমনের সময়ে "বীজভাগবত" এই আস্তিকতা সঙ্গে লইয়া আসেন। এজন্য শাস্ত্রে ব্রহ্মণকে স্বাভাবিক আস্তিক বলে।

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রাহ্মং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ গীতা।

আস্তিকতা সহকারে জাত ব্রহ্মণ শাস্ত্রানুশীলন করিয়া চরমে সত্য আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন। শাস্ত্রের তাদৃশ বাক্য সকল তাঁহার আস্তিক সংস্কার বা শ্রদ্ধার সহিত মিলিয়া যাওয়াতেই তিনি সত্য আত্মার অস্তিত্ব অবধারণ করিতে পারেন, নাস্তিকের তাদৃশ সংস্কার বা শ্রদ্ধার অভাবে চরমে সত্য রহিয়াছে, একথা শুনিয়াও সে তাহা গ্রহণ করিতে পারেনা, কারণ তাহার সংস্কারের সহিত সে কথার মিল হয় না। সুতরাং সে মহাশূন্যকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারেনা। তাহাতে নাস্তিক ও আস্তিকের পরস্পর বিরুদ্ধ পন্থা ব্যাপ্তি হইয়া থাকে।

আস্তিক 'ব্রাহ্মণ হৃদয়নিহিত আস্তিকতার বলে গুরুবাক্য ও শাস্ত্রোপদেশদ্বারা যখন সেই চরম সত্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়া উঠিতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলা যায়; আর যখন সেই ব্রহ্ম পদার্থকে আমি বলিয়া টের পান, তখন তাঁহাকে অপরোক্ষ ব্রহ্মবিৎ বলে। এই অপরোক্ষ ব্রহ্মবিদ্যা নিজে খাটীয়া অর্জ্জন করিতে হয়। গুরুর সাহার্য্যে ব্রহ্মাস্তিত্বরূপ পূর্ব্বে যে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয় বলা হইল তাহার নাম পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। বৌদ্ধ নির্ব্বাণ নামক মহাশূন্যের পরপারে সত্য ব্রহ্মের অস্তিত্ব জানিয়া পরোক্ষ ব্রহ্মবিদ্ হওয়া যায়। সেই পরোক্ষ ব্রহ্ম যখন অপরোক্ষ হন অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্মপদার্থ ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম অপরোক্ষ জ্ঞান। এই অপরোক্ষ জ্ঞানেই শেষ হয় না; ইহার পরে যখন তাঁহার বিদেহ মুক্তি ঘটে তখন তিনি মহাশূন্যের

পারে গিয়া অর্থাৎ অদ্বৈত হইয়া একক অবস্থান করেন; ইহাই আস্তিক হিন্দুর পরমার্থ।

যাহাদের মধ্যে এতাদৃশ আস্তিকতা বিদ্যমান নাই, তাহারা তর্ক যুক্তির বলে সেই মহাশূন্য পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতে পারে। যাহাদের তেমন তর্ক যুক্তি করার শক্তি নাই, তাহারা মহাশূন্যের নিম্নস্থ সূক্ষ্ম জড় বস্তুকে চরম ধরে। যাহারা তর্কের নামে শিহরিয়া উঠে তাহাদের পরের মতানুসরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

অস্তিকের গন্তব্য সেই সত্য ব্রহ্ম বস্তু যে দুঃখাদির অতীত, একথা বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে, যে অভাবে বা মহাশূন্যে গিয়া বুদ্ধ দুঃখ এড়াইতে চাহিয়াছিলেন, আস্তিক ব্রাহ্মণ সেই মহাশূন্যের এ পারে (দুঃখাদির মধ্যে) থাকিয়াই ওপারে সত্য আত্মা বা ব্রহ্মের অস্তিত্ব, স্বভাব-সিদ্ধ আস্তিকতার বলে ধরিতে পারেন এবং কালে তাহাতে প্রবেশ করেন। দুঃখাদি দ্বৈত জগৎ মহাশূন্যে গিয়াই লয় পায়, পর পারস্থিত সত্য আত্মাকে ধরিবে কিরূপে ? আস্তিক সত্য-স্বরূপ আত্মার অভিমুখ হইয়া চলাতে, তাহাকে ইদানীন্তন ভক্তদিগের ন্যায় কখনও আত্মহারা বা বিভোর হওয়ার সাধন করিতে হয় না। তেমন হওয়া অজ্ঞানের কার্য্য; জ্ঞানীর নিকট তাদৃশ অজ্ঞানের স্থান নাই। এজন্য শাস্ত্রমতে জ্ঞানই পরাভক্তি; আধুনিকদের মতে জ্ঞান দ্বারা ভক্তি নষ্ট হয়। ইহার দ্বারাই জ্ঞান-নাশ্য ভক্তির ওজন করা যাইতে পারে। ভক্তির অর্থ ভজন; জ্ঞান বিচার দ্বারা যাদৃশ ভজন মঙ্গলজনক দেখা যায়, তেমন ভক্তি বা ভজনই শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কলি চাহে জীবদিগকে মঙ্গলের পথ হইতে ছিনাইয়া লইয়া অমঙ্গলের নিমগ্ন করিতে, তাহাতেই কলিচরেরা আপনাদের অভিপ্রায়মুরূপ দাস্যাদিকে ভক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করে এবং বলে জ্ঞান আলোচনাতে এই ভক্তি নষ্ট হইবে! এ ভক্তি যে ভক্তি নহে, ফাকি মাত্র, একথা সহজেই বুঝা যায়। তাহারা বলে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর

ভাবাশ্রিত ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ভক্তি; জ্ঞান কিছুই নহে। এইভাবে কুব্যাখ্যা প্রচার করিয়া তাহারা কলির মনুষ্যদিগের শাস্ত্র পথ হইতে বিচ্যুত করতঃ অধঃপাতে নিপাতিত করিতেছে। কলির অনুগত ব্যক্তিরা 'আমি অধম' 'আমি পতিত' ইত্যাদি মনে করাই ভক্তি সাধনের পথ স্থির করিয়া তুষ্ট থাকে। ব্রহ্মণ আপনাকে ঐরূপ অধম ভাবিলে, ক্ষত্রিয়াদি নিম্নবর্ণসমূহের গুরু হইতে পারিতেন না। এখনকার ব্রহ্মণগণ একথা বুঝিতে পারিলে, আর দাস্যভক্তির অনুসরণ করিতে পারিবেন না। 'আমি জড়দেহ নই, জড়ের পরিচালক চেতন বস্তু হইয়াও জড় দেহের আশ্রিত রহিয়াছি,' একথা ব্রাহ্মণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

জ্ঞান-বিরহিত দাস্যাদিভাবাশ্রিতরা আপনাকে অন্যের দাস করিতে চায়। বুদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিকদিগের মতে ঐরূপ দাস হওয়াও দুঃখ বই নহে। তুমি নেই দুঃখকে সুখ ধরিতে পার; মেথর সুখের জন্য মল পরিস্কাররূপ চাকরি করে; মেথর উহাকেই সুখের চাকরি ভাবে, তাহাতে কি অন্যেরা ঐ হীন কার্য্যের প্রংশসা করিবে? ফলতঃ বৌদ্ধ নাস্তিকেরা সংসারের সর্ব্বত্র দুঃখ দর্শন করিয়া শূন্যকে নির্ব্বাণ ভাবিয়া তাহাই আলিঙ্গন করে। আস্তিকেরা ঐরূপ দাস্যভক্তির বা বৌদ্ধ নির্ব্বাণের পক্ষপাতী না হইয়া আপনাকে দ্বৈত প্রপঞ্চের অতীত করিতে যত্ন করিয়া থাকে।

আধুনিকেরা বলিতে পারে আস্তিকগণ কি শাস্ত্রবাক্য অবলম্বন করিয়া ঐহিক সুখকে চিরকালের জন্য বিদায় দেয়? এবং বিদেহ মুক্তি অর্থাৎ পরিণামে একক থাকার জন্য চিরজীবন শুষ্ক যুক্তি তর্ক লইয়া থাকিতে বাধ্য হয়? তাহাদের ইহ জীবনে কি কিছুই হইতে পারেনা? এ কথার উত্তরে বলিতে হয়, জ্ঞানী বা যোগী-দিগকে ঐরূপ লুব্ধশ্বাসে চিরজীবন কাটাইতে হয় না, তাহারা ইহ জীবনেই, এই শরীরেই সেই পরমপদ দর্শন করিয়া তৃপ্ত থাকেন।

উপরে যে ভাব বলা হইল, তাহাতে মনে হয় মহাশূন্যের (আকাশের) অতীত সেই সত্য আত্মাকে দেহাভ্যন্তরে উপলব্ধি করা যাইতে পারেননা। কিন্তু ঋষিপ্রত্যক্ষ অমোঘ শ্রুতি বাক্য অন্যরূপ বলিয়া থাকেন। "গুহায়াং পরমে ব্যোমন্" আমাদের হৃদয় গুহার মধ্যে যে পরমব্যোম বা মহাশূন্য দেখা যায় তাহার অভ্যন্তরে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। শ্রুতি আরও বলেন "নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" আত্ম লাভের অন্য পথ নাই। তাহাতেই বলিতে হয় বেদবিমুখদিগের সদ্‌গতি হইতে পারেনা।

আমাদের দেহের মধ্যে হৃদয়, তাহার মধ্যে গুহা, সেই গুহার অভ্যন্তরে পরম ব্যোম। এসকল বিষয় যোগ ভিন্ন প্রত্যক্ষ হইবার নহে। যাঁহারা যোগবলে সেই হৃদ্‌গহ্বরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের তদভ্যন্তরে পরমব্যোম উপলব্ধির সম্ভাবনা থাকে এবং সেই ব্যোম মধ্যে আত্মদর্শন করা কেবল যোগ সাপেক্ষ নহে, তাহা জ্ঞান দ্বারা লক্ষ্য করিতে হয়। যোগবল ও জ্ঞানবলহীন ইদানীন্তন মনুষ্যেরা এসকল কথাতে আস্থা করিবে কিরূপে? তাহারা কলকৌশল অবলম্বন করিয়া পরের শরীরের অবস্থা মাত্র দেখিতে সমর্থ। নিজের শরীরের মধ্যে হৃদ্‌গুহার অনুসন্ধান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করা, এখনকার লোকের কর্ম্ম নহে। আমি গুরুদেব শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করিয়া নাড়ী বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই গুহা প্রবেশের পথ পাইয়াছি এবং বলিতে পারি যে আস্তিক ব্রাহ্মণ নাড়ী যোগাদির সাহায্যে এই শরীরের মধ্যেই হৃদ্‌গুহা পাইতে পারেন। সেই গুহাভ্যন্তরে ব্যোম ও দেখা যায়। সেই পরম ব্যোম বা মহাশূন্যের পরপারে আত্মাস্তিত্ব অনুভব করিয়া মনুষ্য জন্মমৃত্যু অতিক্রম পূর্ব্বক অমৃত লাভে সমর্থ হয়। তাহা কথার কথা নহে, ইহ জন্মে ইহ শরীরেই তাহার অনুভব হইয়া থাকে।

অনেকে আমাদের শাস্ত্র দ্বারাই আমাদিগকে ইহার বিরুদ্ধ মত বুঝাইতে আসে। এতকাল তাহারা "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।" শ্লোক দেখাইয়া কন্যাদিগকে শিক্ষার জন্য বেথুন কলেজে পাঠাইবার ব্যবস্থা দেখাইত, যেন ঘরকন্না শিখান তাদের শিক্ষাই নহে। এইরূপ ভগবদগীতায় লিখিত—

"যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

এই শ্লোক দেখাইয়া শিখাইতে চাহে যে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম প্রভৃতি যে, যেভাবেই আমাকে ডাকুক্ না কেন সকলেই আমার একমাত্র পথের অনুসরণ করে। অতএব আমরা যে বলিলাম বেদ ছাড়া অন্য পথ নাই, তাহা উড়াইয়া দিয়া থাকে। তাহাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য যে সেই গীতাতেই শেষে যে কথিত আছে—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণস্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বাশাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥" গীতা।

"কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য একথা নির্ণয় করার জন্য শাস্ত্রই প্রমাণ; সেই শাস্ত্রের ব্যবস্থা জানিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।" একথা যে নিরর্থক হইয়া যায়? এজন্য পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অর্থ ইহার সহিত ঐক্য করিয়া এরূপ করিতে হয় "যে সকল পুণ্যাত্মারা স্বর্গের জন্য যজ্ঞাদি বেদবিহিত কার্য্য করে সেই পুণ্যকারীদিগের নিকট স্বর্গরূপে এবং যেসকল পাপাত্মারা বেদনিষিদ্ধ অভক্ষ্য-ভক্ষণাদি নরকপ্রদ কার্য্য করিয়া থাকে সেই পাপকারিদিগের নিকট নরকরূপে উপস্থিত হই; কারণ স্বর্গ ও নরক উভয়ই আমার মূর্ত্তি।" নব্যেরা কি এই ভাব স্বীকার করিতে পারে?

এই ভূমিকাতে এক শ্রেণীর ভক্তির নিন্দা করা হইল। বাস্তবিক ভক্তি জিনিষটী নিন্দনীয় নয়। কেবল কলির অনুকূল ভক্তির

দোষ দেখানই আমাদের বক্তব্য হওয়াতে চণ্ডালের গৃহস্থিত দেবতা-বিগ্রহ যেমন ব্রাহ্মণের পূজ্য নহে, অন্ধভক্তিও তেমন আস্তিক ব্রাহ্মণের গ্রহণীয় নয়, ইহাই দেখান হইল। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রবিহিত সকাম অপরাভক্তিদ্বারা স্বর্গাদি লাভ ও নিষ্কাম পরাভক্তি (জ্ঞান) দ্বারা মুক্তি (পরমার্থ) লাভ যে আস্তিক হিন্দুর ঘটিয়া থাকে, তাহাই যে এখনকার হিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় এই কথাই বলিতেছি।

আস্তিকতা সম্প্রাপ্ত আত্ম-জ্ঞান বা পরাভক্তি ভিন্ন পরমার্থ লাভের আর উপায়ান্তর নাই। আর্ত্ত অর্থার্থীও জিজ্ঞাসুর হৃদয়নিহিত অপরা ভক্তি সাধককে সেখানে পঁহুছাইয়া দিতে পারে না। উহা নাস্তিক-দিগের উপযুক্ত সুতরাং তাহা স্বর্গপ্রদই নয়, পরমার্থপ্রদ হইবে কিরূপে ?

ঈশ্বর বা ভগবান্ বলিয়া যাহা কিছু ধরা যায়, তাহাতে দ্বৈত না থাকিয়া পারে না; পরমার্থ সত্য অদ্বৈত বস্তু। ঈশ্বরেরা ও ভগবানেরা আপনাদের ঈশ্বরত্ব ও ভগবত্তা ত্যাগ করিয়া পরমার্থ স্বরূপে স্থিত থাকিতে পারেন। যতদিন তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ও ভগবত্তা বিদ্যমান থাকে ততদিন তাঁহারা কোন ক্রমেই পরমার্থে স্থিত হইতে পারেন না। জ্ঞানী অর্থাৎ পরাভক্তিশালীরাই পরমার্থ পথের পথিক। বারদীর ব্রহ্মচারিবাবার যোগনিষ্ঠ হইয়া পরমার্থ পথের পথিক ছিলেন বলিয়া এই পুস্তকের ভূমিকাতে তাঁহার উপলক্ষে এতকথা বলিতে হইতেছে।

সিদ্ধজীবনীর প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া গিয়াছে। শ্রীমান্ মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী বি, এ, ব্রহ্মচারিবাবার অন্যতম শিষ্য। তাহার প্রশ্নমতে নূতন সংস্করণের জন্য অনেক নূতন কথা বাহির হইয়াছে। মথুর বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। নূতন কথাগুলি ভূমিকাতে ও পুস্তক মধ্যে উভয়ত্র সন্নিবিষ্ট হইল। প্রথম বারে ব্রহ্মচারিবাবার জীবনী ভিন্ন অন্য কতিপয়সিদ্ধপুরুষের বিবরণ ইহাতে সংযুক্ত ছিল। এবার সেগুলি না দিয়া ঐসকল নূতন বিষয়ের সংযোগ করা গিয়াছে।

বারদীর ব্রহ্মচারী

পরিচয়

ঢাকা জেলার মেঘনা নদীর তীরে, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন বারদী গ্রাম অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতীরে প্রাচীন হিন্দু-রাজগণের রাজধানী প্রসিদ্ধ সুবর্ণগ্রাম নামে এই সকল স্থান পরিচিত। বারদী নয়াবাদের জমীদার নাগ বাবুদের নিবাস স্থান। এই গ্রামে একজন অজ্ঞাতকুলশীল মহাপুরুষ আগত হন; তিনি "বারদীর ব্রহ্মচারী" নামে খ্যাত।

বাঙ্গালা ১২৭০ সনে কি তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ সময়ে বরফপূর্ণ হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে, দুইজন মহাপুরুষ বাঙ্গালার পূর্ব্ব-সীমাবর্ত্তী পাহাড়ে অবতরণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল বরফে অবস্থান করা নিবন্ধন তাঁহাদের সর্ব্বশরীরে একরূপ শ্বেতবর্ণের পুরু চর্ম্ম জন্মিয়াছিল। সেই চর্ম্মের প্রভাবে তাঁহাদের উলঙ্গ শরীরে শীতজনিত কষ্ট বোধ হইত না। একদিকে শরীরে এই অদ্ভুত চর্ম্মচ্ছদ, অন্যদিকে তাঁহাদের ভূতলস্পর্শী বিশাল জটাকলাপ, তাঁহাদিগকে অভিনব জীবাকারে পরিণত করিয়াছিল। পাহাড়বাসী অসভ্য মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে মানুষ না ভাবিয়া, কোন অপরিচিত জীবের দম্পতি মনে করিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজনের সম্বন্ধে নিম্নভূমে যাইয়া লোক মধ্যে অবস্থান করার বিশেষ কথা ছিল। তাঁহারা তদনুসারে চন্দ্রনাথ পাহাড় পর্য্যন্ত দুইজনে একত্র আসিয়া, প্রথম মহাপুরুষ নিম্নভূমে অবতরণ করেন, দ্বিতীয় জন কামাখ্যাভিমুখে প্রস্থান করেন।

যিনি নীচে আসিলেন, তিনি প্রথম কয়েকদিন এক মাঠের মধ্যে রহিয়া গেলেন। কৃষকেরা ক্ষেত হইতে ক্ষীরা (শশা) তুলিয়া

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে দুই একটা ক্ষীরা তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইত, ক্ষুধা হইলে তিনি তদ্দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। কিছুদিন পরে ফৌজদারীর আসামী একজন কর্ম্মকার তাঁহার কৃপায় মোকদ্দমা হইতে মুক্তি লাভ করাতে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহাকে স্বীয় নৌকাতে তুলিয়া লইয়া, কিছু দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া স্বীয় বাসগ্রাম বারদীতে আনয়ন করে।

নিম্নভূমিতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরের সেই বরফ-নিবাসজনিত শ্বেত চর্ম্মের আবরণটী অদৃশ্য হইতে থাকে, কালে তাহা সম্যগ্ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বারদী গ্রামে প্রথমে তিনি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান, কেহ বড় একটা খোঁজ খবর লয় নাই। তাঁহার উলঙ্গবিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া গ্রামের বালকেরা দলবদ্ধ হইয়া তাড়া করিতে প্রবৃত্ত হয়, কেহ ঢিল ছুড়ে এবং নানা প্রকারে উৎপাত করে।

ফলতঃ গ্রামবাসী বয়স্থঃগণও ইঁহাকে উন্মত্ত নীচ জাতি ভাবিয়া উপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু গ্রামিকদিগের এই উপেক্ষাভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই।

একদিন দুই তিনজন ব্রাহ্মণ বসিয়া পৈতাগ্রন্থি দিতেছিলেন; এমন সময়ে সেই আগন্তুক পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে হাঁটিতে হাঁটিতে তথায় উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অপবিত্র নীচ জাতি মনে করিতেন সুতরাং বলিলেন—"আমরা পৈতাগ্রন্থি দিতেছি আমাদিগকে ছুইস না।"

মহাপুরুষ ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, "কেন? ছুলে কি তোমাদের জাতি যাবে?" ব্রাহ্মণগণ বিরক্তস্বরে বলিলেন, "যাবে না ত কি? তুই কি জাতি তাহা জানি না- চাঁড়াল কি মুসলমান তা কে জানে?" মহাপুরুষ পুনরায় হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা কোন্ গোত্র? ব্রাহ্মণগণ প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া

তাঁহারা কাশ্যপ গোত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন "কাশ্যপ, অব্‌সর নৈধ্রুব প্রবর।" তখন ব্রাহ্মণগণ সেই উন্মত্ত নীচ জাতির মুখে স্বীয় প্রবরের পরিচয় শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, এবং কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ ভাবিয়া কিছু বলিতে সাহস হইল না। উন্মত্তবেশধারী পুরুষ বলিলেন "গ্রন্থি দিতে বিরত আছ কেন?" তাঁহারা বলিলেন "পৈতাটা পাক লাগিয়া জড়াইয়া গিয়াছে খুলিতে পারিতেছি না।" মহাপুরুষ বলিলেন "পৈতায় পেঁচ লাগিয়া গেলে কি উপায়ে খুলিতে হয়?" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন "গায়ত্রী জপ করিয়া"— প্রত্যুত্তর হইল— "তাহা কর না কেন?" একথা শুনিয়া একে অন্যের মুখপানে তাকাইতে লাগিলেন। কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, এখন আর আগন্তুককে মুসলমান আদি নীচ জাতি মনে করিতে পারিলেন না। কিছুকাল পরে তাঁহাদের একজন বিনয়সহকারে কাতরভাবে বলিলেন—"আমরা তেমন ভরসা পাইতেছি না। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া পৈতার পেঁচ খুলিয়া দেন তবেই হইতে পারে।" তখন মহাপুরুষ পৈতার উপর গায়ত্রী জপ করিয়া করতালি দিলেন অমনি পেঁচ খুলিয়া আসিল। এই ঘটনাতে ও এবম্বিধ অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া গ্রামিকেরা তাঁহাকে অসাধারণ পুরুষ বলিয়া প্রথমে অবগত হন। তখন ক্রমশঃ জমিদারগণও মহাপুরুষের আশ্রিত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে নীলকর ওয়াইজ সাহেবের নীলের কুঠী লইয়া নাগবাবুদিগের সহ ঘোরতর দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছিল;. কথিত আছে, বারদীর নাগ জমিদারেরা এই মহাপুরুষের অনুগ্রহেই প্রবল নীলকরের হাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদবধি ওয়াইজ সাহেবের নীলের কারবার উঠিয়া যায়।

ক্রমে মহাপুরুষের বাসের জন্য একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট ও তথায় দুই একখানা কুটীর নির্ম্মিত হইল। মহাপুরুষের আগমনে গ্রামের

বিশেষ মঙ্গলজনক পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়াছিল। বারদীতে বর্ষে বর্ষে ওলাওঠা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে বহুসংখ্যক নরনারী কাল কবলে নিপতিত হইত, তাঁহার অগমনাবধি সেই সকল দৈব উপদ্রব বিদূরিত হইয়া যায়। পল্লীগ্রামের নিরীহ ভক্তগণ, তাঁহাকে দেববৎ মান্য করিত; কোন বৃক্ষে ফলোৎপন্ন না হইলে, প্রথমোৎপন্ন উৎকৃষ্ট ফল তাঁহার জন্য মানস করিয়া রাখিত। গাভীর বৎস হওয়ার জন্য, ক্ষেত্রে ফসল হওয়ার নিমিত্ত, জেলের জালে মৎস্য ধৃত হওয়ার জন্য, এইরূপ নানাবিধ ব্যাপারে সেই মহাপুরুষের নিকট মানস, এবং মানস সিদ্ধ হইলে, পূজা প্রদান করিতে লাগিল।

এইভাবে বারদী ও তাহার নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রামে মহাপুরুষ পূজিত হইয়া প্রায় বিংশতি বৎসর যাপন করিলেন। এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয়। তৎকালে তিনি ঢাকার সাধারণ ব্রহ্মদিগের নায়ক ছিলেন।

গোস্বামী মহাশয় বারদীতে গিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হন। তিনি ঢাকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট এই মহাপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় প্রচার করেন। তাহাতে চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোক সকল ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিতে গমন করে। এই সকল দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মলাভের অল্প লোকই গমন করিতেন। অধিকাংশই ঐহিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাইতেন। কেহ উৎকট রোগ শান্তির মানসে, কেহ বা অর্থকৃচ্ছ্রের প্রতীকারাকাঙ্ক্ষায়, কেহ কেহ মোকদ্দমাতে জয়লাভের জন্য, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। প্রায় সকলেই আশ্চার্য্যরূপে প্রতীকার লাভ করিয়া আসিতেন। কয়েকজন মৃতকল্পরোগী ডাক্তার ও কবিরাজের চিকিৎসাতে হতাশ ও মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া বার-দীতে উপস্থিত হয়। মহাপুরুষ কোনরূপ ঔষধাদি ব্যতিরেকে শুষ্ক মুখের কথার দ্বারা, তাহাদের রোগ দূর করিয়া দেন। এই মৃতকল্প রোগীদিগের মধ্যে কলিকাতাস্থ হাটখোলার মহাজন বাবু সীতানাথ

দাস এবং ঢাকার নিকটবর্ত্তী পানিয়ার জমিদার রাধিকামোহন বাবু অন্যতম।

এইরূপ বহুবিধ আলৌকিক অভাবনীয় ঘটনা সেই মহাপুরুষের অনুগ্রহে সংঘটিত হওয়াতে তিনি ঢাকা অঞ্চলে সর্ব্বত্র পরিচিত ও "বারদীর ব্রহ্মচারী" বলিয়া কীর্ত্তিত হন। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম "লোকনাথ ব্রহ্মচারী।" ব্রহ্মচারী বলিতে এখনকার লোকে শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত, চারি মঠের মধ্যে কোন এক মঠের শিষ্য বলিয়া বুঝে; আমাদের বর্ণিত ৺লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাদৃশ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। তিনি প্রাচীনকালীয় বৈদিক প্রথানুযায়ী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের মঠের আধুনিক ব্রহ্মচারীদের ন্যায় তাঁহার নামে আনন্দ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট শব্দ যোজিত হয় নাই, পিতৃদত্ত নাম লোকনাথই রহিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মচারীর আশ্চর্য্য মহিমার কথা শুনিয়া, আমিও বারদীতে গিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। সেদিন অন্যান্য যাত্রীদের বিদায়ের পূরে সর্ব্বশেষে আমার ডাক হইল; আমি নিকটবর্ত্তী হইলে ব্রহ্মচারী কহিলেন "কি জন্য আসিয়াছ?" আমি বলিলাম —রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন "স্বখাত সলিলে ডুবে মলেম শ্যামা।" আমি নিজের ইচ্ছায় সংসারে আসিয়া ঠেকিয়াছি—আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়াছি। আত্ম-মায়ার আত্ম-হারা হইয়াছি, সেই মায়াকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছি না; আপনি সাধু মহাজন, বোধ হয় এই মায়াকে বশ করিয়াছেন। যদি সম্ভব হয় তবে মায়াকে আপনি এমন করিয়া ব্যবহার করুন, যেন তদ্দারা মায়া আমার বশীভূত হয়। যদি তাহা সম্ভব না হয়, আপনি যেমন করিয়া মায়াকে আয়ত্ত করিয়াছেন আমাকে সেই সঙ্কেত বলিয়া দিন, আমি এই মায়াপ্রকৃতিকে বশীভূত করি।

ব্রহ্মচারী কহিলেন—"উহার উপাসনা করিয়া উহাকে বশ কর না কেন?" আমি বলিলাম প্রকৃতি জড়স্বভাবা, তাহার উপাসনা

করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিছুকাল পরে তিনি উত্তর করিলেন—“গুটিপোকা রেশম বাহির করিয়া আপনাকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত করে; তখন সেই বাসা কাটিয়া বাহির করিয়া তাহাকে বাঁচাইতেও পারে না; কিন্তু কালে যখন সে. পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রজাপতি আকারে পরিণত হয়, তখন সে আপনি আপনার বাসা কাটিয়া বাহির হয়, অন্যের সাহায্য প্রতীক্ষা করে না।”

আমি বুঝিলাম—আমাকে সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। এই সাধু দ্বারা নিজের প্রকৃতিকে বশীভূত করার প্রত্যাশা করিতে পারি না। তৎক্ষণাৎ তথা হইতে ফিরিয়া চলিলাম। কিয়দ্দূরে আসিলে ব্রহ্মচারী আমাকে লোক দ্বারা ফিরাইয়া আনাইলেন এবং বলিলেন—“কয়েকদিন অবস্থান কর; পরে বিশেষ আলাপ হইবে।” আমি তদবধি কয়েকদিন তদীয় আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলাম। পরদিন আমাদের উভয়ের মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। আমার কিছু দর্শনশাস্ত্র পড়া ছিল; ওকালতী করিতাম, সেই জন্য জেরা করিয়া সাক্ষীকে আটকাইবার অভ্যাসও হইয়া গিয়াছিল; আমি সেই সকল অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগে ব্রহ্মচারীকে অবরুদ্ধ করিলাম এবং নূতন প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলাম। প্রশ্নটি দুই তিনবার বলিলাম কোন উত্তর পাইলাম না। তখন ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম চক্ষুঃস্থির; যেন তিনি তথায় নাই; সেই বিশাল নয়নযুগলের তারকাদ্বয়, উভয় দিক হইতে আসিয়া নাসিকার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ব্রহ্মচারী যেন সেই চক্ষু কণীণিকার ছিদ্র পথ দ্বারা কোন গভীর অজ্ঞাত দেশে ডুবিয়া গিয়াছেন। আমার চক্ষু সেইদিকে নিপতিত হইলে কোন এক স্থির ধীর গম্ভীরভাব আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। আমি আর কাহারও তেমন ভাব দেখি নাই। মানুষ যে এমন হইতে পারে, এমন ধারণাও ইতিপূর্ব্বে আমার হয় নাই।

বারদী আশ্রমে শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী বাবার
আসন মন্দির

ব্রহ্মচারী ধ্যান ভাঙ্গিয়া বলিলেন "আমার কথায় তোমার আস্থা নাই। আমি এ কথার উত্তর তোমাকে কল্যই দিয়াছিলাম।" আমি বলিলাম কোনটা? তিনি বলিলেন "গুটিপোকার উদাহরণ। আমি এইবারে তাহা হইতে একটী নিগূঢ়ভাবে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলাম। তাহা এই— ভাবিয়া দেখিলাম আমি যেমন আমার স্বাভাবিক বিদ্যাবুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মচারীর সহিত কথা বলিতেছি, ব্রহ্মচারী তেমন স্বাভাবিক বিদ্যাবুদ্ধিদ্বারা আমার সহিত কথা বলিতেছেন না, কোথা হইতে ধার করিয়া যেন কথা আনয়ন করিয়াছেন। নতুবা যে কথা পূর্ব্বদিনে আমার নিকট বলিয়াছেন, পরের দিনে সেই উত্তরটী দিয়া অনায়াসে আমাকে নিরুত্তর করিতে পারিতেন, তাহা না করিয়া এতাদৃশ অলৌকিক ধ্যানাশ্রয় করিবেন কেন? এবার আমার এই নূতন সত্য লাভ হইল যে, মনুষ্যের স্বাভাবিক বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা চেষ্টা না করিয়াও হৃদয়ের গহ্বরে ডুবিয়া উপযুক্ত উত্তর সংগ্রহ করার শক্তি থাকিতে পারে। তাদৃশ শক্তি মনুষ্যসাধারণের মধ্যে নিহিত থাকিলেও বিকাশের তারতম্য লক্ষিত হয়। অনেকের শরীরে তাহা আয়ুষ্কাল মধ্যে মোটেই বিকাশ পায় না, কদাচিৎ কাহার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। বারদীর ব্রহ্মচারী শেষোক্তদিগের মধ্যে একজন। হৃদ্-স্থলের গঠন বৈচিত্র্য দ্বারা একজনের অন্তরের বল অধিক, অপরদিগের মানসিক শক্তি কম হইয়া থাকে। মহাশক্তি সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোত থাকিলেও অন্তঃকরণের গঠনবিভেদে শক্তি বিকাশের ন্যূনাধিক্য হয়। অন্তরের সেই গঠনের আভাস অনেকটা স্থূল শরীরেও দেখা যায়, তদ্দ্বারা সামুদ্রিক বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত আছে। বাহ্যদেশের গঠনানুসারে যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি জাতির বিভেদ হয়, তেমন অন্তঃকরণের গঠনবৈচিত্র্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যবন; ম্লেচ্ছাদি জাতির নির্দ্দেশ হইয়াছে। ব্রহ্মচারীর হৃদয়দ্বার এমন ভাবে উন্মুক্ত ছিল যে তিনি তদ্দ্বারা

অনেক গূঢ় তত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে পারিতেন। সর্ব্বানন্দের সাধনদ্বারা শক্তি এমনভাবে প্রকটীত হইয়াছিলেন যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে মূর্খ সর্ব্বানন্দ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইয়া উঠিল।

ইহার পর হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মচারীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে লাগিল।

প্রাচীন প্রসঙ্গ

ব্রহ্মচারী সেকেলে লোক ছিলেন; অধুনা, সময়ের বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুসমাজ বৈদিক শাসনে চালিত ছিল। এক্ষণে বেদ বিলুপ্ত, সমাজ উচ্ছন্নপ্রায় হইয়াছে। এখন ঈশ্বর বা গড্ মানিলে আস্তিক না মানিলে নাস্তিক হইতে হয় পূর্ব্বে বেদ মানা না মানার উপর আস্তিক নাস্তিক নির্ভর করিত। আস্তিক ষড়্দর্শনে প্রায়শঃ ঈশ্বর মানা হয় নাই, অথচ সেই দর্শনকর্ত্তারা সকলেই বেদের প্রামাণ্য মানিয়া আস্তিক রহিয়াছেন। নব্যেরা প্রাচীন আর্য্যদের বেদনিষ্ঠার কথা শুনিয়া তাঁহাদের অনুচিত গোড়ামী মনে করিয়া থাকেন। নব্যেরা বেদকে যেরূপ বহু ঋষির কৃত গ্রন্থ বিশেষ মনে করিতেন, বেদ যদি প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইত তবে আমরাও বাইবেল, কোরান অপেক্ষা বেদের প্রতি বড় অধিক আস্থা করিতে পারিতাম না।

'বেদ কাহারও কৃত' নহে, গ্রন্থ বিশেষও নহে—কতকগুলি নিত্য প্রবর্ত্তিত শব্দরাশির নাম — বেদ। তাহা সৃষ্টির আদিতে প্রাদুর্ভূত হয় এবং সৃষ্টির শেষে প্রলয় কালে স্বকীয় গূঢ় সত্তায় লুকাইত থাকিয়া পুনরায় নূতন সৃষ্টিতে বিকাশ পায়।

নব্যেরা বলিবেন যে বায়ুর আঘাত দ্বারা শব্দোৎপত্তি হয়, সেই বায়ু সৃষ্টির পূর্ব্বে শব্দ-রাশী-স্বরূপ বেদ কিরূপ বিদ্যমান থাকিবে? একথার উত্তর এই যে, শব্দের চারি প্রকার সত্তা আছে; যথা—

পরা, পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী। তন্মধ্যে স্থূলতম (১) বৈখরী বাণীই নব্যদিগের পরিচিত; পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমার অস্তিত্ব নব্যেরা জ্ঞাত নহে, সুতরাং শেষোক্ত তিন সত্তাতে বেদ বিদ্যমান থাকিলেও নব্যেরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না।

(২) মধ্যমা—বাহ্যশব্দ উচ্চারণের পূর্ব্বে মনে মনে যে আবৃত্তি করা হয়, সেই সকল মানসিক শব্দ ও তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে মনোমধ্যে যে নানাপ্রকার চিন্তাময় শব্দের বিকাশ জানা যায়, সেই সমস্তই মধ্যমা বাক্।

(৩) পশ্যন্তী—ইহা মধ্যমার ও উপকার কথা। এই ধ্বনি মনের অভিঘাত (চিন্তা) ভিন্ন জন্মিয়া, জগদ্ব্যাপিকা মহাশক্তির নিত্য সঞ্চালন দ্বারা সর্ব্বদা দেহ মধ্যে শব্দায়মান থাকে। তন্ত্রশাস্ত্র মতে ইহাকে অনাহত ধ্বনি বলে। যত্ন করিলে সকলেই অনুভব করিতে পারেন। আমরাও ইহার, সত্তা অনুভব করিয়া দৃঢ়তা সহকারে পশ্যন্তীর অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছি।

(৪) পরা—পরাবাণীর অস্তিত্বানুভব করার উপায় নাই; অনুমানবলে উহার সত্তাসিদ্ধি হয়। পরমাণুকে যেমন বাহিরের বস্তুর লঘুতার চরম সীমা ধরা যায়, তেমন পরা বাক্‌কে শব্দ সমূহের অর্থাৎ বৈখরী, মধ্যমা ও পশ্যন্তী এই সমস্ত প্রকার বাণীর মূল বুঝিতে হইবে। নব্য বিজ্ঞান, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরার কোন সন্ধানই রাখেন না সুতরাং বেদের নিত্যতা স্বীকার করা আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষে অসাধ্য।

নব্যেরা এইরূপ ধরিতে পারেন যে, সৃষ্টির প্রাক্কালে জগৎ যখন সূক্ষ্ম অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া এক্ষণকার লোকের বুদ্ধিগম্য স্থূল অবস্থাতে উপনীত হইতেছিল, বেদ তাহার পূর্ব্বেই মধ্যমা মূর্ত্তি হইতে বৈখরীতে প্রকাশ পাইয়াছিল।

এইরূপে জগদ্বিকাশের পূর্ব্বে শব্দময় বেদ, বিকাশ হওয়াতেই বোধ হয় (তাদৃশ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া) বাইবেলে সেন্টজন

বলিয়াছেন,—সৃষ্টির পূর্ব্বে শব্দ ছিল, সেই সকল শব্দই তখন ঈশ্বরের মূর্ত্তি ছিল; যথা—

"In the beginning was the word and the word was with God and the word was God" :—St. John সেই আদিম শব্দরাশিই যদি বাইবেল হইত, তবে আমরা উহাকেও বেদ বলিয়া মান্য করিতাম, অথবা সেই শব্দরাশির অর্থই বাইবেলে বা কোরানে লিখিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিতাম, ত'ব বাইবেল হিন্দুর স্মৃতি অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতাম। সেই আদিম শব্দরাশির সহিত বাইবেলের কোন সম্বন্ধ রহিয়াছে, এমন কথাও কেহ বলিতে পারে না। সেই নিত্যস্থায়ী আদিম শব্দরাশিই কিন্তু হিন্দুর বেদ।

বেদ অকৃত্রিম সত্য বাক্য। এই বিষয়টী আমাদের প্রচারিত "সন্ধ্যাযোগ রহস্য" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য। সেই নিত্য বেদ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে যজুর্ব্বেদ নামে খ্যাত থাকে; দ্বাপরান্তে সাম্ ঋক, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি নামে বিভক্ত হয়। "এক আসীদ্ যজুর্ব্বেদস্তঞ্চতুর্দ্ধব্যকল্পয়ৎ।" এই কথা উলঙ্ঘন করিয়া মেক্স্ মুলরের কথিত ঋগ্বেদ পূর্ব্বে ছিল," এইরূপ কথা মানিতে যাইব কেন? নব্যেরা বেদের উক্তরূপ নিত্য সত্তার অস্তিত্ব বুঝিতে অক্ষম সুতরাং বেদকে অভ্রান্ত প্রমাণ নিবে কিরূপে? আমরা বেদকে অভ্রান্ত সত্য বাক্য জানি, তাহাতেই বেদের প্রতিপাদ্য তেত্রিশ কোটী দেবতারও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকি; এক্ষণকার ঈশ্বর বা গডের সত্তা বেদ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না বলিয়া তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। এজন্য ঈশ্বর (গড্) না মানাতে নাস্তিক হই না বরং বেদ না মানাতে (ঈশ্বর বা গড মানিলেও) নাস্তিক বই নহে।

নব্যেরা জগৎ আছে বলিয়া তাহার কর্ত্তা স্বরূপ একজন ঈশ্বর ধরিয়া লন; অথবা নব্যদের অন্তরে স্বতঃই ঈশ্বর আছে বলিয়া উদিত হয়; কিংবা অন্য কোন হেতুতে ঈশ্বর আছেন বলিয়া মান্য

করা কর্ত্তব্য মনে করেন। এরূপ মান্য করা অন্তঃকরণের ব্যাপার মাত্র। এই ঈশ্বরাস্তিত্বের বুনিয়াদ জীবের অন্তঃকরণ। জীব-দিগের অন্তঃকরণ প্রসূত গড, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম অথবা ভগবান্ ইহাদের কোনই মূল্য দেখিনা। আমরা যে বেদ নামক কতক-গুলি শব্দকে নিত্য ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি এ বিশ্বাসও আমাদের অন্তকরণ সঞ্জাত বটে, কিন্তু বেদটি আমাদের বা কাহারও অন্তকরণজাত নহে। আমাদের অন্তকরণ এমন ভাবে গঠিত যে তাহাতে (অন্তঃকরণ এবারকার সৃষ্টির আদিতে আবির্ভূত) বেদকে অমোঘ প্রমাণ বলিয়া আস্থা করার প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। তোমাদের অন্তরে তেমন প্রবৃত্তির উদয় হয় না। অন্তরের গঠনের এই ভিন্নতা অনুসারে তোমাদিগকে নাস্তিক ও আমাদিগকে আস্তিক বলিলাম। ইহাতে এই পার্থক্য দাঁড়াইতেছে যে তোমরা অন্তঃকরণের শক্তিদ্বারা গড্, ঈশ্বর, ব্রহ্ম প্রভৃতি নাম দিয়া একটা কিছু মানিতে পার; আমরা অন্তঃকরণকে ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া জানি; সুতরাং তোমাদের অন্তকরণপ্রসূত গড্ ঈশ্বরাদির মান্য করিতে পারি না; কেবল দেখি যে যাহা বেদদ্বারা প্রতিপন্ন হয় তাহাতে যেন অন্তঃকরণ স্থাপিত করিতে পারি। কলির অনেকেইত বলিয়া বেড়ান যে বাইবেলের গড্, ব্রাহ্মের ব্রহ্ম, ভক্তের ভগবান সকলেই এক বস্তু, নামে মাত্র বিভিন্ন। আমরা দেখি বেদ প্রমাণে ইহার একটারও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। কেবল যে অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না এমন নহে, প্রত্যুত এগুলির নাস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে; যথা "নেদং ব্রহ্ম যদিদমুপাসতে।" যাহা কিছু উপাসনার বিষয়ীভূত তাহা বেদ প্রতিপাদ্য পরম সত্য বস্তু নহে। এজন্য আমাদের আস্তিক্য নাস্তিক্য কেবল বেদকে নিত্য সত্য অভ্রান্ত বলিয়া ধরা ও না ধরার উপর নির্ভর করিতেছে।

আমরা জানি আস্তিক ভাবের গঠিত অন্তঃকরণ হইতে প্রায়শঃ আস্তিক সন্তান জন্মে, নাস্তিক হইতে নাস্তিক জন্মিয়া থাকে,

ইহাই জাতি বিভাগের মূল। কলির প্রভাবে দ্বাপরের আস্তিক দিগের বংশে এখন নাস্তিক জন্মগ্রহণ করিতেছে; কিন্তু নাস্তিকের বংশে কখনও আস্তিকের জন্মিতে শুনা যায় নাই।

এই নাস্তিক্য ও আস্তিক্যবুদ্ধির ফল কতদূর গড়াইতেছে দেখা যাউক নিত্য নূতন নূতন কল কারখানায় আবিষ্কার দেখিয়া তোমরা দিন দিন মানবজাতির উন্নতি বুঝিতেছ; আমরা মনে করি কলিযুগ-ধর্ম্মে দিন দিন মনুষ্যের স্বাভাবিক ক্ষমতার হ্রাস হওয়াতে তাহার ক্ষতিপূরাণার্থ মনুষ্য সমাজকে দিন দিন বিবিধ যন্ত্রের ও বহুব্যক্তির সমবায়তার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছে, ইহা ক্রমাবনতির লক্ষণ; প্রাচীন কালের ঋষি মুনিগণ দূরদর্শনও দূরশ্রবণ প্রভৃতি ক্ষমতাতে সিদ্ধ ছিলেন। তৎপ্রভাবে সহস্র সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী ঘটনা প্রত্যক্ষ ও তত্রত্য কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতে পারিতেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারীতে তাহার অনেকটা লক্ষিত হইত।

প্রাচীন সত্য কালে যখন পৃথিবীর সকল জাতির স্থলে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি বিদ্যমান ছিল, তখন তাহাদের কোন বিষয়ে অভাব ছিল না, এমন কি ক্ষুধাতৃষ্ণা আধিব্যাধি রোগশোক প্রভৃতি কিছুই ছিল না,; সুতরাং তাহারা শরীরের বাহিরে কিছুই চাহিতেন না; সর্ব্বদা অন্তরে উদ্ভাসিত বৈদিক জ্ঞানজনিত সুখে বিভোর থাকিতেন। কালচক্রের পরিবর্ত্তন হইল, তাঁহাদের এই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি রহিত হইতে লাগিল, ক্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণাদির উদ্রেক ঘটিল; তাঁহাদের দেহের বাহিরের বস্তু প্রাপ্তির প্রয়োজন ঘটিল; এক দিকে যেমন তাহার অভাব বোধ হইতে লাগিল, অপর দিক দিয়া তাঁহাদের সংকল্প সিদ্ধি নামক একরূপ ক্ষমতা জন্মিল, অন্তঃকরণের মধ্যে যে বস্তুর সংঘটনের ইচ্ছা উঠিত, বাহিরের সেই বস্তু তৎক্ষণাৎ সৃষ্ট বা আগত হইত। এই উপায়ে তাঁহারা অভাব পূরণ করিতেন। চির দিন কাহারও এক

ভাবে যায় না, সেকালের লোকদিগের সংকল্প-সিদ্ধিও লোপ হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণা ও শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতি জনিত অভাব বোধ রহিয়া গেল। তখন সেই অভাব পূরণার্থে পৃথিবীতে কল্প-বৃক্ষ সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কল্পবৃক্ষের নিকট যে কোন আবশ্যকীয় বস্তু প্রার্থনা করা যাইত বৃক্ষেরা তাহা তৎক্ষণাৎ প্রসব করিয়া দিত। পূর্ব্বের মনুষ্যেরা ইচ্ছার বলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য জাত পাইতেন, এই সময়ের মানবেরা তৎপরিবর্ত্তে কল্পবৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে প্রলয়াবাসনে প্রথম সত্যযুগে উৎপন্ন মনুষ্যগণ পূর্ণতা সহকারে ভূমিষ্ঠ হইয়া যতই ত্রেতা দ্বাপর ও কলির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের বাহ্যশক্তি প্রবল হইতে লাগিল ততই ব্যক্তিগত শক্তির হ্রাস হইতেছিল। আমরা সেই মনুষ্যদিগের বংশে জন্মিয়া এখন তাঁহাদের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যাহা হউঁক কালস্রোতের গতিতে সেই সকল কল্পবৃক্ষ দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। তখন কল্পবৃক্ষের পরিবর্ত্তে অন্য একজাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কল্পবৃক্ষ সকল বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই সকল বৃক্ষে অন্ন, পানীয়, গৃহ, বস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যকীয় বস্তুজাত, অপর্য্যাপ্তরূপে ফলিয়া থাকিত। ইহাকে তৎকালীয় মনুষ্যদিগের "বার্ক্ষী-সিদ্ধি" অর্থাৎ বৃক্ষের নিকট প্রাপ্তি সিদ্ধি (ক্ষমতা) বলা যাইত। আমাদের বর্ত্তমান সময়ে শ্রমলাঘবের জন্য যন্ত্র-সিদ্ধির আবশ্যক হইয়াছে। তখনকার লোকেরা প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিষ বৃক্ষের নিকট সঞ্চিত ছিল, সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্ভাবনা ছিল না। বৃক্ষের তলাতে বাস করিলেই চলিত। তখনও লোকের মধ্যে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক ব্যক্তিগত মর্য্যাদা অতিক্রম করার ভাব আগত হয় নাই সুতরাং রাজা প্রজা ভাব ছিল না। কৃষি বাণিজ্যের কথা ত বহু দূরে। এইকালে রেলগাড়ী, জাহাজ, টেলিগ্রাফ থাকার কি

আবশ্যকতা ছিল? তথাপি কেন ঐগুলি করিল না, এজন্য তাহাদিগকে অনুন্নত বা অসভ্য বলা আমাদের কতদূর সঙ্গত, ভাবিয়া দেখা উচিত। তখন যাহার যে বস্তুর আবশ্যক হইত বৃক্ষের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করা হইত; কিন্তু বৃক্ষগণ, পূর্ব্বকার কল্পবৃক্ষের মত মনুষ্যের প্রার্থনা অনুসারে কিছুই প্রদান করিতে পারিত না; বৃক্ষেরা এক্ষণকার আম কাঁঠাল আদি প্রসব করার ন্যায় তখন গৃহ, বস্ত্র, অন্ন, পানীয়, মক্ষিকার সাহায্য ভিন্ন মধু প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু প্রসব করিয়া রাখিত। এতদুপলক্ষে এই যুগে মনুষ্যেরা বৃক্ষের তলবাসী হইয়াছিল। বৃক্ষের শাখা সকল প্রকোষ্ঠের ন্যায় গঠিত ছিল, মনুষ্যেরা তাহাকে আমাদের গৃহের ন্যায় ব্যবহার করিত। কোন শাখা-গৃহের নিম্নে বেদ পাঠ করিত, কোন শাখা-তলে রন্ধন করিত, অন্য শাখা-গৃহে অগ্নি রক্ষিত হইত। ঐ সকল শাখা যথাক্রমে পাঠশাখা, রন্ধনশাখা অগ্নিশাখা নামে অভিহিত ছিল; সেই শাখা শব্দই কালে শালা শব্দে পরিণত হইয়াছে; যথা পাঠশালা, রন্ধনশালা, ও অগ্নিশালা। মানবের এতাদৃশ সুলভতাকে বার্ক্ষী-সিদ্ধি বলে। অধুনা সেই বার্ক্ষী-সিদ্ধির পরিবর্ত্তে মনুষ্যের যন্ত্র-সিদ্ধি চলিতেছে; এক্ষণে আমরা যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্ত হইতেছি। যে সকল মনুষ্য মানব জাতির প্রাচীন কালের এবম্বিধ স্বতঃ সিদ্ধি, সংকল্প সিদ্ধি, কল্পবৃক্ষসিদ্ধি ও বার্ক্ষী-সিদ্ধির অস্তিত্ব অবগত আছে তাহারা কেন বর্ত্তমান যুগের বহুব্যয় ও কষ্টসাধ্য যন্ত্র-সিদ্ধি দেখিয়া মানব জাতির দিন দিন উন্নতি হইতেছে মনে করিবে? তাহারা দেখে মনুষ্যের একদিক দিয়া ক্রমশঃ বাহুশক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, অপরদিকে সুলভ সিদ্ধি সকল তিরোহিত হইতেছে। তাহাতেই বহুশ্রম ও অর্থবিনিয়োগপূর্ব্বক যন্ত্র আবিষ্কারের আবশ্যকতা হইয়াছে। আর যাহারা পুরাকালে ঐ সকল স্বতঃসিদ্ধির অস্তিত্ব জ্ঞাত নহে অথবা জানিয়াও তাহা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে অক্ষম, তাহারা বুঝে
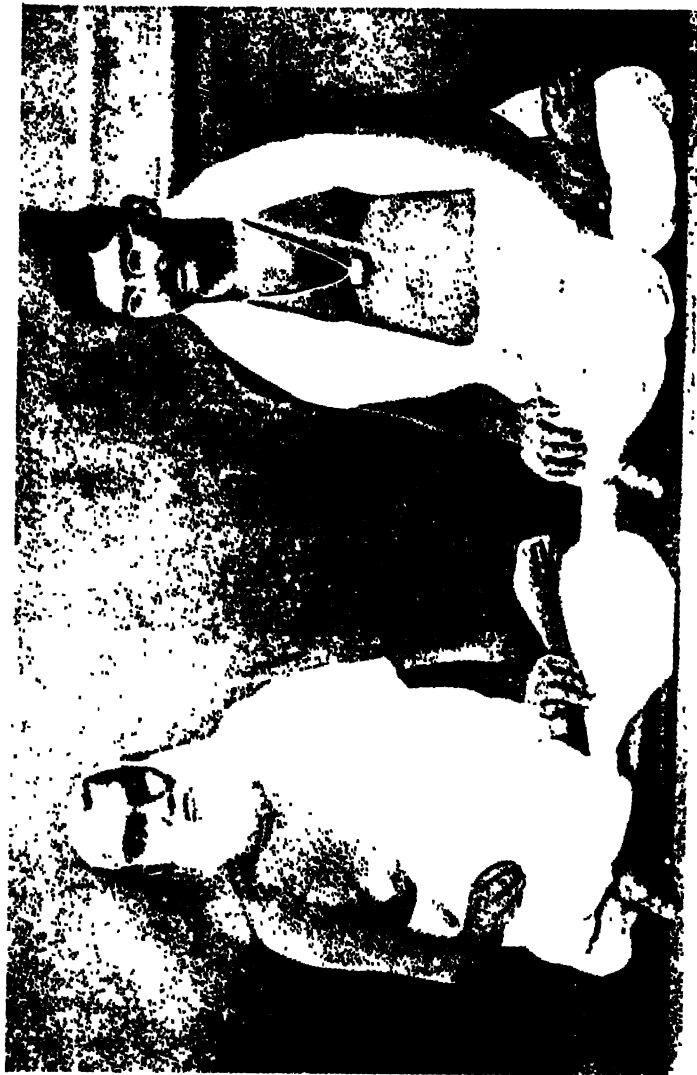
শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ ভারতী
(শ্রীশ্রীব্রহ্মচারীবাবার শিষ্য)

শ্রীমদ্ মুণ্ময় মোহন দেবশর্ম্মা
(শ্রীশ্রীব্রহ্মচারীবাবার শিষ্য)

মানব জাতির বহির্বৃত্তি, চিরকালই সমান আছে; অভাবও সমানই রহিয়াছে, কেবল বুদ্ধির হীনতাবশতঃ প্রাচীন লোকেরা আমাদের মত কলকৌশল আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আমরা ক্রমোন্নতির পথে ধাবিত হইয়া সভ্যতার উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ় হইয়া এই সকল যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছি; কালে আরও কতই করিব। এক্ষণকার সভ্যতাভিমানী লোকেরা কালে আর কতই করিব ভাবিয়া ক্ষান্ত থাকে; কিন্তু সেই চরমোন্নতির সীমা কোথায়, একথা ভাবিয়া দেখিতে অবকাশও পায় না। আমরা এবিষয়ে কিছু মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছি; আমরা দেখি, মনুষ্যের স্বাভাবিক দর্শন শ্রবণ ও চলন শক্তির যে অভাব ঘটিতেছে তাহার ক্ষতিপূরণার্থ চস্‌মা, দূরবীক্ষণ, টেলিফোন, বাইসিকিল্‌ প্রভৃতি সিদ্ধি লাভ করা হইয়াছে। এই সকল যন্ত্রসিদ্ধির বাহুল্য প্রচার দ্বারা আমাদের স্বাভাবিক শক্তি সকল প্রবল মাত্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে; কালে ঐ সকল শক্তি এত সঙ্কুচিত হইবে যে তাহার সমাবেশের জন্য এত বড় দেহের আর আবশ্যক হইবে না, অতি ক্ষুদ্র শরীরেই সামান্য ইন্দ্রিয় শক্তির সমাবেশ হইতে পারিবে। সুতরাং মনুষ্য, বিশেষ পরিমাণে ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হইবে। এখন যেমন বট অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় হাট বসে, কলির শেষে তেমন বেগুন তলাতে হাট বসিবে বলিয়া যে প্রবাদ শুনা যায়, উহা নিতান্ত অমূলক হইবে না। কালে যেমন শরীর ক্ষুদ্র হইবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আয়ুষ্কালও সংক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে। শাস্ত্রোক্ত ভবিষ্যৎ বাণী এই যে, এখনকার ৬০।৭০।৮০ বৎসরের স্থলে ১৭।১৮ বৎসর আয়ুর ঊর্দ্ধ সীমা দাঁড়াইবে। তাহার পরে দৈবগত্যা এক সময়ে সকলে বিনাশ পাইয়া আগামী সত্য যুগের পথ মুক্ত করিবে।

সে যাহা হউক, অতঃপর মূলের অনুসরণ করা যাউক। সত্যকালের বার্দ্ধক্য দশাতে সেই বার্ক্ষী-সিদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তে আকৃষ্ট-পচ্য সিদ্ধি জন্মিল। এক্ষণে যেমন ক্ষেত্রে

কর্ষণ ও জল সেচন করিয়া ফসল উৎপাদন করিতে হয় তখন তাহার আবশ্যকতা ছিল না। কর্ষণ ব্যতীত শস্য পাকিত এই অর্থে "অকৃষ্ট-পচ্য" শব্দ রচিত হইয়াছে। ফলতঃ তখন প্রযত্ন ভিন্ন অপর্য্যাপ্ত শস্য ফলিয়া থাকিত, প্রতিপালন ভিন্ন অসংখ্য গো, মেষ ছাগ, মহিষ দলে দলে বিচরণ করিত, তাহাদের প্রচুর দুগ্ধ, বৎস সমূহ পান করিয়া উঠিতে পারিত না, সুতরাং দুগ্ধে বসুন্ধরাকে প্লাবিত করিত; সেই কালের মনুষ্যেরা আবশ্যক মতে সেই সকল অরক্ষিত গবাদি পশু দোহন করিয়া দুগ্ধ ঘৃত পান করিতেন। সত্যযুগের বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যগণ ক্রমশঃ লুব্ধ হইয়া নিজ নিজ স্বার্থের উদ্দেশ্যে শস্য সঞ্চয় ও পশুরক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাঁহারা তেমন লোভবশ ছিলেন না, প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য লাভে কুণ্ঠিত ছিলেন. তাঁহাদিগের অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। তাঁহারা জনমানব বিহীন জঙ্গলাদিতে প্রস্থান করিতেন। অবশিষ্টেরা নগর গ্রামাদি রচনা করিয়া বাস করিতে লাগিল।

তাহারা লোভাতিশয্যবশতঃ সাধারণভোগ্য শস্য ও পশ্বাদি নিজেদের আয়ত্ত করিয়া ও নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে পারিল না। আপনাদের মধ্যে বলবান্ ব্যক্তিরা অন্যের সংগৃহীত বস্তু হরণ করিয়া ভোগ করিতে আরম্ভ করিল। এতকাল মানবজাতি অন্যের সাহায্য ভিন্ন আপন আপন ভাবে সুখে থাকিতে পারিত এখন সেইরূপ রহিল না। পরস্পরের সাহায্যের অপেক্ষাতে দলবদ্ধ হইয়া বাস করার আবশ্যক হইল। তদনুসারে নগর, গ্রাম, গৃহ, অট্টালিকা প্রভৃতি রচিত হইতে লাগিল। যাহারা সঞ্চয়কারীদিগকে আক্রমণ করিয়া সঞ্চিত শস্যাদি লুণ্ঠন করিত, তাহাদের সহিত সঞ্চয়ীরা এই ব্যবস্থা করিল যে, তোমরা অন্য লুণ্ঠনকারীর আক্রমণ হইতে আমাদিগকে ত্রাণ কর, আমাদের অর্জ্জিত দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ তোমরা পাইবে। সঞ্চয়ীদিগকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করিত বলিয়া তাহারা ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইত। সঞ্চয়ীরা কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্যপরায়ণ

হইয়া বৈশ্য খ্যাতি প্রাপ্ত হইল। যাঁহারা এতাদৃশ লোভের বশীভূত হইলেন না, অতএব পূর্ব্বানুরূপ অন্তর্ম্মুখ বৃত্তিতে রহিলেন তাঁহারা কপোত আদি পক্ষীর ন্যায় ক্ষুধা উপস্থিত হইলে বন্য ফল শস্যাদি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তৃপ্ত থাকিতেন, নূতন সমাজ বন্ধনের মধ্যে আসিতেন না; ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ন্যায় তাঁহারা কোন নূতন বৃত্তি লইলেন না বলিয়া নূতন জাতি হইলেন না, সুতরাং অগ্রজ বা মুখজ স্বরূপ রহিয়া গেলেন; ইহারা ব্রহ্মপরায়ণ বলিয়া ব্রাহ্মণ আখ্যা পাইলেন। এই তিন বর্ণের সেবাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকেরা শূদ্র সংজ্ঞা পাইলেন। এই ভাবে প্রকৃতির প্রেরণাদ্বারা সেই ব্রাহ্মণজাতি প্রথমে চতুর্ব্বর্ণে পরিণত হয়।

ভগবদ্গীতাতে এই প্রকৃতির প্রেরণাকে ভগবানের সৃষ্টি বলা হইয়াছে। যথা ঃ—

"চতুর্ব্বর্ণোময়াসৃষ্টো গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।"

বর্ষাগমে পুষ্পোদ্যানের মধ্যে নানাবিধ জঙ্গলা আগাছা জন্মে। তাহাদিগকে প্রকৃতির প্রেরণাতে বা বর্ষা ঋতুর ধর্ম্মে জাত অথবা ভগবানের ইচ্ছাতে উৎপন্ন বলা যাইতে পারে। আমরা তেমন না বলিয়া, বাগানের মালীর প্রতি দোষারোপ করিয়া বলি "মালী বসিয়া থাকিয়া বাগানটীকে জঙ্গলা করিয়া ফেলিয়াছে।" সত্যযুগের শেষে বর্ণবিভাগ সম্বন্ধেও তেমন বলা হইল, সত্যযুগের বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যগণ ক্রমশঃ লুব্ধ হইয়া নিজ নিজ স্বার্থের উদ্দেশ্যে শস্য সঞ্চয় ও পশুরক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।"

নব্যেরা এসকল কথা বুঝেনা—তাহারা মনে করে, সেকালের বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণেরাও আমাদের ন্যায় স্বার্থপর ছিলেন; তাঁহারা আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, সরলচিত্ত অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে ভুলাইয়া, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণে বিভক্ত করতঃ ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছেন। যাহারা, "ঘটনা স্রোতের চক্রগতি" বা "যুগচক্র" বিষয় আলোচনা করেন, তাঁহারা বুঝিতে

পারেন, প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে যেমন ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটে; এবং গ্রীষ্মে গোলাপ, গন্ধরাজ; বর্ষাতে বেলী, জুঁই সন্ধ্যামালতী দোপাটি; শরতে শেফালিকা, পদ্মকুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি পুষ্প বিকশিত হয়; তেমন যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়া সত্য-ত্রেতার সন্ধিতে চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ, দ্বাপরে সঙ্করবর্ণ ও কলিতে বর্ণাশ্রম বহির্ভূত আর্য্যেতর জাতির বাহুল্য পরিমাণে প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। ভূগর্ভে নিহিত বীজ সকল যেমন আপন আপন ঋতুতে উদ্ভূত হয়, তেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে কালগর্ভে প্রবিষ্ট ক্ষত্রিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, পুনরায় আপন আপন যুগে উৎপন্ন হইতেছে। অতএব বুঝিতে হইবে, সত্য ত্রেতার সন্ধি সময়ে ব্রাহ্মণদিগের গৃহে (পূর্ব্বতন যুগ সমূহে কালগর্ভে লীন) ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করাতে বর্ণিত ভাবে চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ না হইয়াই পারে না।

এখন প্রবল কলি প্রবর্ত্তিত হওয়াতে এই সময়ে নাস্তিক প্রভৃতি আধিক্য অপরিহার্য্য। তাহাতে হিন্দুর গৃহে ঐ ভাবাপন্ন মনুষ্যেরা বহুপরিমাণে জন্মগ্রহণ করিতেছে। এতদুপলক্ষে হিন্দুসমাজে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত। সেই সকল সমাজ বহির্ভূত ব্যক্তিরা হিন্দু-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া, হিন্দুকে অহিন্দু করিতে চায়। হিন্দুরা তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র রক্ষার জন্য ব্যস্ত। এই সংঘর্ষে শীঘ্রই হিন্দুসমাজ হইতে বহু লোককে দূরীভূত হইতে হইবে। তাহার ফলে, শত বৎসর পরবর্ত্তী লোকেরা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে—"সেকালের ব্রাহ্মণেরা এতই স্বার্থপর ছিল যে অসংখ্য হিন্দুসন্তানকে স্কুল কলেজে পাঠাইয়া ইংরাজি চালে চলিতে অভ্যস্ত করায় এবং বস্ত্র, অস্ত্র, দীয়াসলাই প্রভৃতি এতদ্দেশে প্রস্তুত করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করার জন্য তাহাদের অনেককে ইউরোপাদি দেশে শিক্ষা ব্যপদেশে প্রেরণ করিয়াছিল। পরিশেষে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করতঃ আপনারা সমাজ মধ্যে প্রভুত্ব করিতেছে।" আমরা যে ইংরাজী শিক্ষার ও ইংরাজী চাল চলন

ও বিলাত গমনের এত বিরোধী একথা তখন আর কেহ বলিবে না। আমরাই আমাদিগকে মজাইয়া নষ্ট করিয়াছি বলিয়া অপবাদ দিবে। সেইরূপ এখন বলিতেছে চতুর ব্রাহ্মণেরা জাতি বিভাগ করিয়া লোকদিগকে ঠকাইতেছে।

এইভাবে সত্যযুগ অতীত হইয়া ত্রেতাযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। "ততঃ সমুদিতা বর্ণাস্ত্রেতায়াং ধর্ম্মশালিনঃ।" মৎস্য পুরাণ ১৪২ অধ্যায়। অর্থাৎ তাহার পরে সেই সকল মনুষ্যের মধ্যে ত্রেতাযুগে ধর্ম্মশালী চতুর্ব্বর্ণ সমুদিত হইয়াছে। এই সময়কে সত্য ও ত্রেতা-যুগের সন্ধিকাল মনে করা উচিত। ক্রমে সত্যের ব্যবহার তিরোহিত হইয়া ত্রেতা প্রবল হইতে থাকে, কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের মিশ্রণে বহুপ্রকার সঙ্করজাতি উৎপন্ন হয়।* তখন লোক সমাজ ক্রমশঃ বাহ্য-জগৎ-পরায়ণ হইতে থাকে। তখন "আকৃষ্ট-পচ্য" নামক সিদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়, কর্ষণ আদির বাহুল্য প্রচার হইতে থাকে। এই যুগে উক্ত চারি বর্ণের মধ্যে এমন সকল বহির্ম্মুখ মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যে তাহারা কিছুতেই অন্তর্ম্মুখ হইবার উপযুক্ত ছিল না। এজন্য তাহাদিগকে বৈদিক শাসনের অযোগ্য স্থির করিয়া সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরে দ্বাপরযুগে যখন লোক সকল বাহ্যজগত লইয়া ব্যাপৃত হইয়া পড়িল, তখনকার সমাজ হইতে বহুসংখ্যক মনুষ্য বেদবহিষ্কৃত হইয়া যায়। এই সমুদয় বেদভ্রষ্ট নির্ব্বাসিত মনুষ্যগণ হইতে এখনকার ধর্ম্মহীন মানবজাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার পরে কলিযুগে বহির্ম্মুখতার পরাকাষ্ঠা ঘটিতেছে। এই যুগে সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে সঞ্জাত মূল চতুর্ব্বর্ণ ও সঙ্করবর্ণ সকল এবং ধর্ম্মহীন মনুষ্য সকল এক জাতিতে পরিণত হইবে। সেই একজাতি কিন্তু সত্যের এক ব্রাহ্মণজাতি নহে, ইহারা এক ম্লেচ্ছজাতি হইবে। তবে কেহ কেহ যে গুপ্তভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুসরণ করিবেন না এমন নহে।

সেই সকল গুপ্তাচারী ব্রাহ্মণগণের সন্তান দ্বারাই ভাবী সত্যযুগে পৃথিবী পুনরায় ব্রাহ্মণময় হইয়া উঠিবে।

কলির আরম্ভে বিষ্ণু যেমন বুদ্ধাবতার হইয়া বেদনিন্দা করতঃ সময়োচিত যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তেমন কলির অবসানে সেই বিষ্ণু "প্রমতি" বা "কল্কী" প্রভৃতি নামে জন্মগ্রহণ করিয়া কলির পাপীদিগকে বিনাশ করতঃ সত্যযুগ আগমনের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। তৎকালের হতবিশিষ্ট মনুষ্যের পার্ব্বত ও জঙ্গলাদিতে পলায়ন করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করে। সেখানে মৎস্য, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া প্রথমে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে থাকে। কালে সে সকল অপ্রাপ্য হওয়াতে তাহারা বল্কলাদি পরিধান ও পত্র-ফল-মূল ভক্ষণে জীবন ধারণ করে। এইভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্যক্ পরিত্যক্ত হওয়াতে তাহাদের অতিরিক্ত মাত্রাতে ব্যাধি পীড়ন ভোগ করিতে হয়। তদবস্থায় মনুষ্যদিগের বাহ্য-ভোগের স্পৃহা ন্যূন হয় ও সঙ্গে সঙ্গে বিচার চলিতে থাকে। বিচার দ্বারা যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। এইভাবে কলি রহিত হইয়া সত্যযুগের ভিত্তি পত্তন হইবে।

"বৈবর্ণাৎ ব্যাধি সংপীড়া নির্ব্বেদো ব্যাধি-পীড়নাৎ।
নির্ব্বেদাদাত্মসংবোধঃ সংবোধাদ্ধর্ম্মশীলতা।
এবং গত্বা পরাকাষ্ঠাং প্রপৎস্যতে কৃতং যুগম্॥"

(হরিবংশ ভবিষ্য ৬পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ উক্তভাবে চরমতা প্রাপ্ত হওয়ার পরে সত্যযুগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। কলির অন্তে অবনতির চরমাবস্থায় তাহা হইতে সত্যের উন্নতির সূত্রপাত হয়।

বিচারণাত্তু নির্ব্বেদঃ সাম্যাবস্থাত্মনা তথা।
ততশ্চৈবাত্ম সংবোধঃ সম্বোধাদ্ধর্ম্মশীলতা॥

(মৎস্য পুরাণ ১৪৪ অধ্যায়, লিঙ্গপুরাণ ৪০ অধ্যায়)

বিচার দ্বারা বাহ্য বিষয়ের প্রবল অনুরাগ রহিত হয়, তাহাতে

অন্তঃকরণে সমতা ঘটে, তখন আত্মচিন্তা সমুদিত হইয়া ধর্ম্মশীলতা উৎপাদন করে।

কলির বর্ত্তমান অবস্থাতে সেই বিচার বিলুপ্ত হইয়াছে। বিচার দ্বারা প্রেয়সে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ আশ্রয় করা যায়। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য বিচারদ্বারা বেদান্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন। তাহার পরে হিন্দুস্থানে উপাসক্ সম্প্রদায়ের প্রাবল্য ঘটে। উপাসকেরা বিচার করেনা, সুতরাং শ্রেয়কে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়। তাহারা উপাস্যকে কেবল প্রেমাস্পদ ভাবিয়া সুখভোগ করিতে চায়। বর্ত্তমান সময়ে তাহাও নাই;—নব্য ঈশ্বরবাদীরা সুখের জন্য ঈশ্বর ভজেন। তাহারা হিন্দুদিগের আচার ও নিষ্ঠা রক্ষার কঠোরতা ভালবাসেনা। বরং হিন্দুর অখাদ্য খাইতে লালায়িত। এজন; গড্ প্রভৃতির প্রতি, হিন্দুর ঈশ্বর নাম দিয়া, হিন্দুসন্তানদিগকে ভুলাইতে চান। নব্যেরা যদি একাচারের পক্ষপাতী না হইত, তবে বাইবেলে গডের যে লক্ষণ আছে ও তাহার সহিত শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরের লক্ষণগুলির ঐক্য হয় কিনা একবার বিচার করিয়া দেখিত এবং বিচারে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় হইতে পারিত ও আর্য্য ধর্ম্মরক্ষার পথ হইত। আধুনিক ঈশ্বরবাদীরা সে পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস অর্থাৎ কল্পনা বা ধারণাদ্বারা 'নব্য ঈশ্বরবাদ' নামক মত গঠন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। সত্যের আবির্ভাব সময়ে তৎকালীয় মনুষ্য-দিগের হৃদয়ে বিচারের আবশ্যকতা অনুভূত হইবে। এইভাবে প্রতি কলির অবসানে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। প্রতি বৎসর যেমন শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে, তেমন প্রতি ৪,৩২০০০ সহস্র বৎসরে (দৈব একযুগে) সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামক চারিটি যুগের পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়; আবার ঐরূপ প্রায় ৭১টি দৈবযুগ দ্বারা মন্বন্তর নামে অন্য একটি বৃহত্তর পরিবর্ত্তন

চক্র গঠিত হইয়া থাকে। তাদৃশ মন্বন্তর ১৪শ বার সংঘটিত হইলে ১000 দৈবযুগ চক্র আবর্ত্তিত হয়। এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ব্যাপী কালের নাম এককল্প। এক্ষণে যে কল্প চলিতেছে, তাহার নাম শ্বেত বরাহ কল্প। এইরূপ বহুসংখ্যক কল্পদ্বারা আবার অন্য একটি বৃহত্তম পরিবর্ত্তন চক্র রচিত হইয়া থাকে।

ছয়টি ঋতুর ভাব বুঝিতে পারিলে যেমন একবৎসরের ভাব বুঝা যায়, তেমন এক দৈবযুগের মধ্যবর্ত্তী সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগের স্থূল ইতিহাস বুঝিলে সমস্ত দৈবযুগেরই তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যাইতে পারে। এইভাবে এক দৈবযুগ দ্বারা ৭১ দৈবযুগাত্মক এক মন্বন্তর জানা যায়। এবং ঐরূপ ১৪শ মন্বন্তর একত্র করিলে, সহস্র যুগাত্মক এক কল্পের অবস্থা বুঝা গিয়া থাকে। এভাবে অন্যান্য কল্প সমূহেরও স্থূলভাব অনুমতি হইতে পারে। এই উপায়েই হিন্দু পণ্ডিতগণ জগতের অনাদি ও অনন্তকালের অবস্থা জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্ব কথিত স্বয়ং জাত বেদবাক্যগুলি এই জগতের নিয়ামক। সত্যযুগে মনুষ্যের হৃদয় স্বতঃই বেদদ্বারা চালিত হইত, ত্রেতাতে জ্ঞানালোচনা দ্বারা বেদের ভাব বজায় থাকিত, দ্বাপরে যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা অন্তকরণ বেদানুরূপ গঠিত হইত, কলিতে অল্পে অল্পে বেদ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে কলির ৫000 হাজার বৎসর গত হইতেছে। ৩000 হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধমত প্রচলিত হওয়াতে বেদ চাপা পড়ে। প্রায় ২৫00 বৎসর পূর্ব্বে সুধন্বা রাজার সময়ে কুমারিল-ভট্টদ্বারা বেদ সত্য বলিয়া পুনঃ প্রচারিত হয়। ৭00 কি ৮00 শত বৎসর যাবৎ অনার্য্যাধিকার অবধি বেদ অপ্রামাণ্য হইতেছে। এখন বেদ রাখালের গান বলিয়া গণ্য; বৌদ্ধ আমলে বেদের নিন্দা ইহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল; তাহারা বলিত "চতুর্ব্বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।" চারি-বেদের কর্ত্তারা ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর ছিল। আমরা কিন্তু সেই

বেদ বাক্যকে অভ্রান্ত প্রমাণ স্বরূপ স্বীকার করি। বেদজ্ঞ লোকেরা অন্য শব্দদ্বারা বেদের ভাব ব্যক্ত করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছেন। এখন বেদাভাবে স্মৃতিশাস্ত্র সকল (মনু, অত্রি, বিষ্ণু প্রভৃতিকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র) আমরা মান্য করিয়া চলিতেছি।

কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, বিদ্যারণ্য প্রভৃতি বুদ্ধের পরে জন্মিলেও ইহাদের বেদের প্রতি নিষ্ঠা থাকা জানা যায়। আমরা তাঁহাদিগকে মান্য করি। বুদ্ধ, যীশু, নানক, চৈতন্য, প্রভৃতি বিষ্ণুর অবতার হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের বেদনিষ্ঠায় প্রমাণ অভাবে আমরা তাঁহাদের অভিমত সকল মান্য করিতে পারি না। আমরা জানি যাহা বেদ বিহিত হইয়াছে তাহাই ধর্ম্ম, অবৈদিক মত অধর্ম্ম। উহাদের মত বেদসম্মত না হওয়াতে অধর্ম্ম সংজ্ঞার অন্তর্গত হইতেছে।

আমরা জানি ব্যক্তিবিশেষের অন্তঃকরণ প্রসূত মত (Religion) ধর্ম্ম হইতে পারেনা, তাহাতে ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে। বেদ কাহারও মত নহে, সুতরাং বেদের প্রতি সেই আশঙ্কাও নাই। প্রতিবার প্রলয়ের পর বেদরূপে স্বয়ম্ভু ঈশ্বর আবির্ভূত হন, তাহার পর প্রকৃতির নিয়মানুসারে সেই অবস্থা জমিয়া ঈশ্বর এই জগৎ মূর্ত্তিতে বিকাশ পাইয়া থাকেন। বেদ কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় বিভিন্ন ভাব ধারণ করে না। বেদ অবিকৃত ভাবেই জগতের নিয়ন্তা। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর বেদের অবস্থানুসারে আপনাকে বিবিধ জগৎ মূর্ত্তিতে রচিত করেন। জজ যেমন আইনের অধীন, ঈশ্বর তেমন বেদের অধীন; বেদ জগতের ব্যবস্থা দাতা, ঈশ্বর ঐ ব্যবস্থার প্রতিপালন কর্ত্তা। উকিলেরা যেমন আইন জানিয়া ও মানিয়া জজ হইয়া থাকে, মনুষ্য তেমন বেদের ব্যবস্থা ধরিলে ঈশ্বর হইতে পারে; আর ঈশ্বর বেদ না ধরিলে স্বীয় ঈশ্বরত্ব হারাইয়া জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন; বিষ্ণু (ঈশ্বর), শ্রীরাম,

প্রভৃতি অবতারে, বেদ বিস্মৃত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জন্মগ্রহণান্তে পুনরায় বেদ গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করিয়াছিলেন। * লক্ষ্মণ, অর্জ্জুন প্রভৃতিও বিষ্ণুর অবতার বটেন, জন্মগ্রহণ করিয়া বেদও মান্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আত্মজ্ঞানের স্মৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। বুদ্ধ কিন্তু ততোধিক, তিনি আত্মজ্ঞানের সম্বন্ধীয় স্মৃতি ত পানই নাই, অধিকন্তু লক্ষ্মণ ও অর্জ্জুনের ন্যায় বেদ গ্রহণও করেন নাই। এইজন্য অবতার বলিয়া তাঁহার সম্মান করিলেও, বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া তদীয় আদেশ আমরা প্রতিপালন করি না।

আমাদের এই সকল ভাব আধুনিক কালের পাঠকগণের নিকট অপরিচিত। তাঁহারা বেদ ও ঈশ্বরকে অন্যভাবে গ্রহণ করেন। অন্ততঃ বেদ যে ঈশ্বরের বাক্য পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারেন; কিন্তু বেদ যে ঈশ্বরের নিয়ন্তা, একথা কি কেহ বিচার করিয়া দেখেন? তাঁহারা গড্, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম নাম দিয়া কিছু মান্য করিলেই পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছেন মনে করিয়া পরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হন।

অনেকে বুঝেন ইহজীবনে পরকালের জন্য কিছুই করার উপায় নাই। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা পাঠকদিগের অন্তরের ঝোঁক

* একসময়ে দেবগণ কর্ত্তৃক অসুরগণ পরাজিত হইলে, দৈত্যগুরু শুক্রাচায্য তপস্যাতে নিযুক্ত হইলেন। অসুরেরা শুক্রজননী মহাকালীর শরণাগত হওয়া সত্ত্বেও সুরেরা তাঁহাদিগকে বধ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শুক্রাচার্য্যের মাতা যোগাবলম্বনে দেবগণের নেতা ইন্দ্র ও ও বিষ্ণুর লোপ সাধনে সংকল্প করেন; ইন্দ্র ও বিষ্ণু ইহা অবগত হইয়া মহাকালী যোগস্থ হওয়ার পূর্ব্বেই চক্রাঘাতে তাঁহার বধ সাধন করিলেন। এতচ্ছ্রবণে শুক্রের পিতা ভৃগু বিষ্ণুকে বলেন, "বেদের শাসনে স্ত্রীজাতি অবধ্যা; তাহা তুমি জানিয়াও যখন স্ত্রী হত্যা করিয়াছ, তখন তোমার বিষ্ণুর পদে থাকা উচিৎ নয়; অতএব মর্ত্তলোকে গিয়া দশবার জন্মগ্রহণ কর। ইহাতে বিষ্ণু দশাবতার রূপে মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এইজন্য বিষ্ণুর স্তবে কথিত হয় যে—

"প্রাদুর্ভূতস্চ দশধা ভৃগুশাপচ্ছলাদিহ।"

হে বিষ্ণু! তুমি লীলাগ্রহণের জন্য ভৃগু শাপের ছলে মর্ত্ত লোকে মৎস্য, কূর্ম্ম বরাহাদি রূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

বুঝিয়া প্রবন্ধাদি প্রচার করেন সুতরাং পাঠকের রুচিকর হইয়া থাকে। আমাদের নিকট তেমন প্রত্যাশা করিতে পারেন না। আমরা অর্থ বা যশের প্রত্যাশায় এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছি না। আমরা দেখি বিজাতীয় শিক্ষা ও অনুকরণ দোষে লোকগুলি উল্টা বুঝিয়া মাঠে মারা যাইতেছে। হিন্দুর ভিতরকার কথা যে কি, ইহা এখনকার হিন্দুরাই জ্ঞাত নহেন। এতকাল হিন্দুরা ধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষের আচার অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। তাঁহারা জানিতেন—"আচারপ্রভবো ধর্ম্ম"। আচার দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হয়। এখন তাহাতে "কেন?" এই প্রশ্ন আসিয়াছে। এই সকল কারণেই এতগুলি কথা বলিয়া আমাদের গ্রন্থারম্ভ করিতে হইতেছে।

ব্রহ্মচারিবাবার বৃত্তান্ত প্রচার করার অন্তরায়

১। এই মহাপুরুষ যে ২৫।২৬ বৎসর কাল আমাদের মধ্যে বাস করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি স্বমুখে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার বিষয়ে অন্য সাক্ষী পাওয়া যায় না; সুতরাং তাঁহার ধারাবাহিক জীবন-চরিত প্রাপ্ত হওয়ার আশা করা যাইতে পারে না।

২। সমাজে ভাষা ও ভাবের বিভ্রাট হওয়াতে এই মহাপুরুষ সম্বন্ধীয় বিবরণ অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(ক) ভাষাবিভ্রাট—বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতমূলক; বাঙ্গালাতে সংস্কৃত শব্দ নূতনরূপে প্রয়োগ করিতে হইলে, তদ্দ্বারা সংস্কৃত ভাষার যেরূপ অর্থ বুঝায়, বাঙ্গালাতেও সেই অর্থে প্রযুক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু নব্যবাবুরা সংস্কৃত শাস্ত্রের ধার ধারেন না; নূতনভাবে পুরাতন শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভাষাবিভ্রাট ঘটাইয়া থাকেন। ইহার উদাহরণ—God শব্দে ঈশ্বর, Religion শব্দে ধর্ম্ম, Heaven

শব্দে স্বর্গে, India শব্দে ভারতবর্ষ, প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞাবাচক শব্দগুলি প্রয়োগ করাতে প্রচুর ভাষা বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

শাস্ত্রে ঐ সকল সংজ্ঞার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে; ইংরেজী গড্ প্রভৃতি শব্দের অর্থ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; অথচ প্রয়োগ দোষে উভয়ই এক ধরিয়া লইতে হয়। এতদ্বারা শাস্ত্রজ্ঞান হৃদয়ে স্ফুরণ হওয়ার গুরুতর ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। এইরূপ যোগ, সমাধি, স্বামী, মহর্ষি, পরমহংস, ব্রহ্ম, তত্ত্বজ্ঞান ও অবতার প্রভৃতি শব্দের বিস্তর অপপ্রয়োগ ঘটিতেছে। আমি সংস্কৃতভাষাগত অর্থে ঐ সকল শব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ্য। পাঠকগণ বাঙ্গালাতে তাহার অভিনব অর্থ বুঝিয়া থাকেন। ইহাকেই ভাষাবিভ্রাট বলা গেল।

(খ) ভাববিভ্রাট—আমাদের ভাব একরূপ; বঙ্গীয় পাঠকের ভাব অন্যরূপ; তাহাতে আমরা একভাবে বলিব, পাঠকেরা অন্য ভাবে গ্রহণ করিবেন। এক্ষণকার লোকে মনে করে খ্রীষ্টানের গড্, ভক্তের ভগবান্ ও শাস্ত্রের ঈশ্বর এই সমস্তই একজনের ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং আপনাদের বিবেচনা মতে তাহার প্রকৃতি আমাদের রাজা, পিতা বা অন্য উৎকৃষ্ট ব্যক্তির অনুরূপ স্থির করেন এবং সেই প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির তুষ্টির জন্য বিশেষ বিশেষ উপাসনা প্রণালী কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রকৃত হিন্দুর ভাব অন্যরূপ, প্রাচীন আর্য্যেরা বেদের অবিরুদ্ধ বিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্র দ্বারা উপাস্য এবং উপাসনা কিরূপ হওয়া উচিত, ইহার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য এক্ষণকার অল্পবুদ্ধি লোকদিগের ভাবিবার আবশ্যক নাই। প্রাচীনদিগের প্রদর্শিত পথে চলাই প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্মের সহজ পথ।

শাস্ত্রীয় ভাষাতে বেদানুমোদিত ব্যবহারকে ধর্ম্ম বলে; নব্য বঙ্গভাষাতে সে ভাব নাই। ইংরেজী রিলিজান (Religion) কথার অনুবাদে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহৃত হয়। তদনুসারে বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, প্রভৃতির কথা প্রচলিত

হইয়াছে। শাস্ত্রমতে ঐ সকল ধর্ম্মসংজ্ঞার অন্তর্গত হয় না। "বেদপ্রণিহিতোধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" অর্থাৎ যাহা বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম্ম, বেদবিরুদ্ধ বিষয়কে অধর্ম্ম বলিতে হয়। বৌদ্ধাদির মত বেদবিরুদ্ধ হওয়াতে ঐ সকল অধর্ম্মের উদাহরণ স্থল। অতএব হিন্দুর ভাষাতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম না বলিয়া, বৌদ্ধ মত, খ্রীষ্টান মত, বৈষ্ণব মত, ব্রাহ্মমত বলিলেই ঠিক হয়। ''

নব্যেরা এইকথা মানিতে পারেন না। তাহারা জানেন রাজা বা পিতার ন্যায় কোন ব্যক্তি, হিন্দু-ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাদের কেহ ঈশ্বর, কেহ গড্, কেহবা ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করেন, বেদাদি শাস্ত্র এবং বাইবেল প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও তদ্দারা সেই একই ব্যক্তির উপাসনা হইয়া থাকে; বেদাদি শাস্ত্রসকল সঙ্কীর্ণতা অবলম্বনে, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম প্রভৃতির মতকে ধর্ম্ম বলিতে না চাহিতে পারেন, আমরা সেই সঙ্কীর্ণতা অবলম্বন করিয়া অন্য মতকে ধর্ম্ম না বলিব কেন? এইখানেই নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের অনৈক্য। আমরাও প্রথম বয়সে কতকটা নব্যদের ভাবাপন্ন ছিলাম; পরে তলাইয়া দেখিয়াছি এই মতটি ভয়ানক ভ্রমাত্মক। উহা যেমন শাস্ত্রবিরুদ্ধ তেমন যুক্তিবিরুদ্ধ। কোনরূপ দার্শনিক যুক্তিদ্বারাই বর্ত্তমান সময়ের প্রবর্ত্তিত ঈশ্বর, গড্ প্রভৃতি শব্দের প্রতিপাদ্য কোন এক ব্যক্তির অস্তিত্ব অবধারণ করা যায় না।

যাহারা আমি একব্যক্তি ও উপাস্য অন্যব্যক্তি এইরূপ ভাবনা করিয়া সাধনা করেন, তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর সাধক। এতাদৃশ সাধকদিগের বুদ্ধি ভেদ করিয়া দেওয়া উচ্চস্তরের জ্ঞানীদিগের উচিত নহে। সাধনার জন্য ঐরূপ ভাব প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত হইলেও তাহা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত নহে।

লোকসমাজে ঐরূপ নিম্নশ্রেণীর সাধনা প্রবর্ত্তিত থাকাতে, নব্যেরা সকল প্রকার উপাস্য ও উপাসককে এক করিতে গিয়া, অধুনা "একেশ্বরবাদ" প্রচার করিয়াছেন। অন্ততঃ বারদীর ব্রহ্মচারিবাবার মত লোক এই নিম্নদলভুক্ত নহেন।

উচ্চজ্ঞানীরা যে সকল লক্ষণদ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিভাগ করিয়া গিয়াছে, নব্যগণ, তাহার ভাব গ্রহণ না করাতে খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম প্রভৃতির মত, অধর্ম্ম সংজ্ঞার অন্তর্গত হইলেও আপনাদের বিবেচনামতে তাহাও ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। আমরা তেমন পারিতেছিনা। আমরা তাহার পরিবর্ত্তে খ্রীষ্টান মত বৈষ্ণব মত, বৌদ্ধমত ও ব্রাহ্মমত প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে পারি অথচ ইহাতে ভাব-বিভ্রাট ঘটেনা।

এইরূপ ভাষা ও ভাব-বিভ্রাটের ফলে, শাস্ত্রের যে সকল বঙ্গানুবাদ হইতেছে, তাহাতে উপযুক্ত অর্থপ্রকাশ হইতে পারিতেছে না। অথচ অনেকে সেই সকল অনুবাদ পাঠ করিয়াই শাস্ত্র জানা হইল মনে করিয়া থাকেন।

যাহারা সরলভাবে শাস্ত্রের অনুবাদ পাঠ করিয়া ভাব-বিভ্রাটে অর্থাৎ ভ্রমে পতিত হন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত ভাষাবিদ্ কতকগুলি ব্যক্তি, শাস্ত্র হইতে প্রচুর বচন প্রমাণ সংগ্রহপূর্ব্বক ভাব-বিভ্রাট ঘটাইতে ত্রুটি করেন না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে বটতলার পুস্তকাগার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই উদ্ধৃত শাস্ত্র বচনে এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিতে পাই। এদদুপলক্ষে শাস্ত্রালোচনাকারীদিগকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। যথা:—প্রাচীন দল ও নব্য দল। যাহারা বেদকে অভ্রান্ত প্রমাণ জানেন সুতরাং বেদ বা বেদানুমোদিত শাস্ত্রবাক্যদ্বারা আপনার অন্তঃকরণ বা মত গঠন করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা প্রাচীন দলভুক্ত, নব্যেরা তাহার বিপরীত। নব্যেরা জানেন, ক্রমোন্নতিই জীবের স্বভাব সুতরাং তাহারা

প্রাচীনদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্র সকল পূর্ব্ব-কালীন ব্যক্তিদিগের মত প্রসূত; নব্যেরা তাহা অপেক্ষা মত প্রকাশে সমর্থ। আপনাদের মতটি ভোটে চড়াইলে, যদি স্বপক্ষে অধিক সংখ্যক ভোটে সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা-হইলে তাহাদের মত অকাট্য বলিয়া তাহারা ধরিয়া নেয়।

কিছু একটা মানিলেই আস্তিক হওয়া যায়, এই পর্য্যন্তই নব্যদিগের ধারণা। তাহার পর অন্যকিছু না মানিয়া যে ঈশ্বর মানেন তাহা কেবল অধিকাংশের সহানুভূতি প্রাপ্তির জন্য। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতির সংখ্যা একত্রে করিলে, ভোট সংখ্যা অধিক হয়। এই জন্যই তাহাদের উপাস্যকে নব্যেরা উন্নত বুদ্ধির বলে একব্যক্তি করিয়া লইয়াছেন। যাঁহাকে ব্রাহ্মেরা ব্রহ্ম ও খ্রীষ্টানেরা গড্ বলে, তাঁহাকেই হিন্দুদের ঈশ্বর বলা উচিত এপর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা চা'ল কলার লোভে কেবল ছোট ছোট দেবতাগুলির নাম প্রচার করিয়াছিলেন, নব্যদিকের মার্জ্জিত বুদ্ধিতে ব্রাহ্মণদিগের জুয়াজুরিটা ধরা পড়াতে, এক্ষণ নব্যেরা একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে ব্যস্ত হইতেছেন। তাহা হইলে সকলেরই একধর্ম্ম ও একাচার হয় এবং তাহাতে নব্যদিগের বিস্তর সুবিধা ঘটে। এজন্য নব্যেরা শাস্ত্রের নিত্য নূতন বাখ্যা করিয়া থাকেন। তাহাতেই শাস্ত্র বিভ্রাট ঘটে। আমরা প্রাচীন দলের পক্ষপাতী; বেদের নিম্নস্থ অথচ বেদানুগামী শাস্ত্রদ্বারা বেদের ভাব বুঝিয়া তদনুরূপ মত গঠন করিতে চাই। ইহাও জানি যে কলিতে বেদ বিগর্হিত লোকের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং আমাদের অনুকূলে অতি অল্প সংখ্যক ভোট জুটিলেও জুটিতে পারে। এবং তদানুসারে এই গ্রন্থের পাঠকও অতি অল্পই হইবে। কেবলমাত্র সেই অল্পসংখ্যক পাঠককেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, "প্রিয় পাঠক! নব্যদিগের কথিত ধর্ম্ম ও মুক্তি প্রভৃতি কথাতে, বেদাদি শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর, ধর্ম্ম ও মুক্তি প্রভৃতি না ধরিয়া ঐগুলিকে

পেটেণ্ট ঈশ্বর, পেটেণ্ট ধর্ম্ম ও পেটেণ্ট মুক্তি বলিয়া বুলিয়া লইও।”

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম,এ, বি,এল, প্রণীত দ্বিতীয় সংস্করণ গীতায়-ঈশ্বরবাদ” পুস্তকের প্রথমাধ্যায়ের শেষভাগে লিখিত আছে, “দর্শন-শাস্ত্রে অনেক চিন্তা বিচার ও গবেষণা থাকিলেও তাহার অসম্পূর্ণতা দূর হয় নাই।” গ্রন্থকার নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি; ষট্‌দর্শনকার গৌতম, কনাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনী ও বেদব্যাস সেকালে লোক, সুতরাং মূর্খ; একালের গ্রন্থকার ক্রমোন্নতির আইন বলে তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের দোষ দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেই সকল দোষ কি? নব্যবাবুদের আবিষ্কৃত ঈশ্বর (গড্) না মানা প্রভৃতি। প্রাচীন দর্শনকারেরা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্যাপার যে উপায়ে সংঘটিত হইয়া থাকে তাহা প্রদর্শন করেন। নব্যদের বুদ্ধি ততদূর খোলেনা বলিয়া, ঈশ্বর গড্ প্রভৃতি নামধারী কোন এক ব্যক্তিকে আপনাদের কর্ত্তা স্বরূপ কল্পনা করিয়াই তুষ্ট থাকেন। সুতরাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্যাপারের দিকে নব্যদিগের বুদ্ধি ধাবিত হয় না। তাঁহারা ঐহিক লইয়া মত্ত থাকিতেই অবকাশ পান। কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনে “ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না” বলিয়া যে সূত্র রহিয়াছে, গ্রন্থকার তাহা খণ্ডন করিয়া “ঈশ্বরবাদ” স্থাপন করিলেন না কেন? তেমন করিলে তাহার কৃত দর্শন শাস্ত্রকে সপ্তম দর্শন বলিয়া পাঠ করিতে পারা যাইত। তাহা না করিয়া তিনি বেদান্তের প্রণেতা সেই বেদব্যাস কৃত মহাভারতান্তর্গত গীতার দোহাই দিয়াই ঈশ্বরবাদ স্থাপন করিতেছেন দেখিয়া ইহাই মনে হয়, তিনি গীতা বা বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র ইহার কোনটাই ভাল করিয়া পড়িবার বা বুঝিবার অবসর পান নাই। দর্শনাদি শাস্ত্রে প্রবেশ লাভের দুইটী উপায় (১) শ্রদ্ধা ও (২) সাধনা। শ্রীমান্ হীরেন্দ্র বাবুর দর্শন-কারদের প্রতি

যে শ্রদ্ধা নাই, তাঁহাদের কৃত দর্শনের সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিবার ইচ্ছাই সে বিষয়ে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমান। অর্থকরী বিদ্যার চর্চ্চা ও পার্থিব বিষয়োন্নতির জন্য অনেক সময় ব্যাপিনী চেষ্টায় যে সময় নষ্ট হয়, তদতিরিক্ত সময়ে দর্শনাদি শাস্ত্র সাধনাদ্বারা আয়ত্ত করাও সুকঠিন।

প্রাচীন সম্প্রদায় যেমন শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরাদিকে শাস্ত্রীয় বিধিদ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক শাস্ত্র বিহিত ফল লাভ করিতে উৎসুক, নব্যগণ তেমন নহেন; ইহারা শাস্ত্রোক্ত কঠোর ব্রতোপবাসাদি সাধন করিতে অনিচ্ছুক। মরণান্তে স্বর্গাদি জনিত সুখ ত দূরের কথা, ইহজীবনের ভোগ ত্যাগ করিতেও নব্যেরা কিছুতেই প্রস্তুত নহেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানের এক উপাস্য স্বরূপ ঈশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, ইঁহাদের স্ত্রী স্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ, অভক্ষ্য ভক্ষণ জনিত ঐহিক সুখের পথটা প্রশস্ত করা হয়; অথচ প্রাচীন দল কর্ত্তৃক "নাস্তিক" প্রভৃতি শব্দে অভিহিত এবং সমাজচ্যুত হইতে না হয়, এই উদ্দেশ্যসাধনে কতকগুলি লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীনদলের উদ্ধার সাধনার্থে জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে ব্যাকুল। এখন আমাদিগকে বুঝাইতে চাহেন যে, 'বেদ রাখালের গান', সেকালের মূর্খদিগের ছয় দর্শনে ঈশ্বরের প্রভুত্ব না থাকিলেও গীতাতে ঈশ্বরবাদ রহিয়াছে। নব্যদিগের ইচ্ছা যে, তাহাদের ন্যায় প্রাচীন সম্প্রদায় খ্রীষ্টান প্রভৃতির কথিত আপনাদিগকে এক 'দয়াময়' রাজার (ঈশ্বর, গড্ নামধারীর) পুত্র মনে করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একাচার অবলম্বন করেন।

বাবুরা ম্যাক্স্‌মুলারের মন্তব্য পাঠ করিয়া ষড়দর্শনে পণ্ডিত হন; কাজেই দর্শনে ঈশ্বরের কথা পান না। পাতঞ্জল দর্শনের সূত্রে ঈশ্বরের এই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, "ক্লেশকর্ম্মবিপা-

কাশয়ৈরপরামৃষ্ট ; পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।” অর্থাৎ অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ, * এবং কর্ম্ম ও পরিণাম আর আশয় অভিপ্রায়, এই চারি ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধবিহীন বিশিষ্ট পুরুষের নাম ঈশ্বর। এই ঈশ্বরের দয়া, মমতা, অভিপ্রায়, সিসৃক্ষা বা সৃষ্টিকরণেচ্ছা প্রভৃতি কিছুই থাকিতে পারেনা। খৃষ্টের গড্ ছয়দিন পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া রবিবারে বিশ্রাম করিতে বাধ্য হন; তাঁহাকে ত দর্শনের কথিত ঈশ্বর বলার উপায় নাই; নব্যদিগের ঈশ্বর দয়াময় এবং মতলবী। তিনি উপাসনার ও প্রিয় কার্য্য পাওয়ার অভিপ্রায়ে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; শাস্ত্রীয় ঈশ্বরের কর্ম্ম, অভিপ্রায় প্রভৃতি বিকার থাকিতে পারেনা; সুতরাং নব্যদিগের ঈশ্বরকে কিরূপে শাস্ত্রীয় ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে পারি? গীতা দর্শন শাস্ত্র নহে, তাহাতে দর্শন-সিদ্ধ যে ঈশ্বর তাঁহার নাম মাত্র রহিয়াছে, ঈশ্বরের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। গীতার ঈশ্বরকে গড্ বলিয়া অজ্ঞদিগের নিকট প্রবোধ দেওয়া কঠিন নহে। এজন্য বাবুরা বলিতেছেন, “গীতার পূর্ব্বে দর্শন শাস্ত্র রচিত হয়, তখনকার লোকের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ছিলনা, তাঁহারা একেশ্বরবাদ আবিষ্কার করিতে অক্ষম ছিলেন।” পরে গীতার সময়ে ঈশ্বরের নাম বাহির হইল। ইহা ক্রমোন্নতির লক্ষণ কিনা? এখন বাবুরা বুঝাইতে চাহেন, গীতাতে যে ঈশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা খৃষ্টানের গড্, ও ব্রাহ্মের ব্রাহ্মবই আর কিছুই নহে। তাহা না হইলে শাস্ত্র হইতে বচন তুলিয়া নব্য ঈশ্বরবাদ প্রচার করিতে বাবুদের এত মাথার ব্যথা কেন? বাবুরা কি শাস্ত্রকে অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া মানেন? না, শাস্ত্রীয় আদেশ পালনে প্রস্তুত আছেন? তাঁহারা যে মতলব আটিবার জন্য বাছিয়া বাছিয়া শ্লোক প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার পূর্ব্বাপর কথার সহিত ঐক্য করিলে কিন্তু বাবুদের মতবিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থের শেষ ভাগে

---

*অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, (ইচ্ছাবিশেষ) দ্বেষ, অভিনিবেশ (মরণভয়)।

প্রদত্ত "তোমাদের ঈশ্বর ও শাস্ত্রীয় ঈশ্বর" নামক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

এহেন সমাজে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর স্থান নাই। ব্রহ্মচারী অতি প্রাচীন কালীয় ঋষি প্রদর্শিত পথে চলিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেন। এখনকার সমাজ সিদ্ধ পুরুষ বলিতে কিছুই বুঝিতে পারে না।

জন্ম ও বাল্যকাল

লোকনাথের ধারাবাহিক জীবনচরিত আমি অবগত নহি। আমার প্রশ্নানুসারে তাঁহার জীবনের যে সকল বিশেষ বিশেষ কথা তাঁহার নিজ মুখে প্রকাশ পাইয়াছে এবং আমি তাঁহার নিকটে থাকিয়া তদীয় ভাষার যে অর্থ বুঝিয়াছি এ পুস্তকে তাহার যথোচিত সন্নিবেশ করার জন্য যত্ন করা যাইতেছে। কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না।

তদীয় ভাষা বুঝাও সহজসাধ্য নহে। একদা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, আহুতি দেওয়া হইয়াছে ত?" বিশেষ চিন্তা করিয়া বুঝিলাম, ব্রাহ্মণ যে ভোজন করেন, তাহা দ্বারা শরীরস্থ দেবতাদিগকে আহুতি দেওয়া হয়; সে জন্য ভোজনারম্ভে "প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চগ্রাস মুখে দেওয়া হইয়া থাকে; এজন্য ইহার বৈদিক ভাষা—প্রাণাগ্নিহোত্র। তখন বলিলাম—হাঁ, আহার করিয়া আসিয়াছি।

প্রথমবারের মুদ্রিত সিদ্ধজীবনীতে লেখা আছে, "কোন বিশেষ নিষেধমূলক কারণ বশতঃ তাঁহার পিতার নাম ধাম প্রভৃতি প্রকাশ করিতে পারিতেছিনা।" যখন ইহা লিখিত হইয়াছিল, তখন ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় জীবিত ছিলেন। অনেক দিন হইল তিনি আর ইহলোকে নাই। সেই বিশেষ নিষেধের বাধা এতদিনে বলহীন হইয়াছে ভাবিয়া নূতন সংস্করণে ব্রহ্মচারিবাবার পূর্ব্ব নাম ধাম প্রকাশ করিতে চাই। এতদুপলক্ষে সেই বিশেষ নিষেধের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যাইতেছে।

এরূপ প্রকাশ যে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের খুল্ল পিতামহ সংসারে বিরাগী হইয়া বাসস্থান ও আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন। এ অবস্থাতে সংসার ত্যাগী প্রাচীন সাধুদিগের মধ্যে সেই খুল্ল পিতামহের দর্শন পাওয়ার আশা পোষণ করা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পক্ষে স্বাভাবিক। গোস্বামী মহাশয় ব্রহ্মচারিবাবাকে প্রথমবার দর্শন করিয়া তাহার প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন যে অনেক বার তাহার নিকট যাতায়াত করিতে বাধ্য হন। এমন কি তিনি কয়েক বার সপরিবারেও বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ কথাবার্ত্তা চলার কালে ব্রহ্মচারিবাবা কোন কথাপ্রসঙ্গে প্রণয় ব্যঞ্জকভাবে বলিয়াছিলেন—"ওরে আমাদের কূলের ধর্ম্ম এরূপ নহে।" এই কথাতে গোস্বামী মহাশয় দেখিলেন ব্রহ্মচারিবাবা আপনাকে গোস্বামীর সহ এক কুল সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেন; তাহাতে তিনি ব্রহ্মচারিবাবাকে আপনার সেই খুল্ল পিতামহ ধরিয়া লইয়া সেই সম্পর্ক মত কথাবার্ত্তা কহিতেন। তদীয় পরিবারবর্গও তেমন ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বাবা যদিও সৎপথাবলম্বী সকলকে এক পরিবার ভুক্ত প্রকাশ করার জন্য "আমাদের কুল" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, গোস্বামী মহাশয় তাহা অন্যরূপ বুঝিয়া যে তাঁহাকে স্বীয় খুল্ল পিতামহ মনে করিলেন, বাবা তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিয়া বরং তাহাই যেন ঠিক, এমন অভিনয় করিতে লাগিলেন। এমন কি ব্রহ্মচারিবাবা গোস্বামীর পত্নীকে নাতবউ বলিয়া তামাসার গালিও প্রদান করিতেন।

ব্রহ্মচারিবাবা আমার নিকট এসকল গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে ইহা অন্যের কাছে প্রকাশ করিয়া যেন বিজয়কৃষ্ণের সরল অন্তঃকরণে আঘাত করা না হয়। তখন তাঁহার মুখ হইতে "সতের মনঃকষ্ট" এই কথাটী বাহির হইয়াছিল মনে হইতেছে।

এই কথা স্মরণ করিয়া প্রথম বারের মুদ্রিত সিদ্ধজীবনীতে ব্রহ্মচারিবাবার পিতার নাম, কৌলিক উপাধি ও বাসগ্রামের পরিচয় লিখিত হয় নাই। তাহা লিখিলেই ব্রহ্মচারিবাবা যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কেহ নহেন, এই ভাব প্রকাশ পাইত। তাহার পরে গোস্বামী মহাশয়ের পরলোকগতি হইয়াছে। এ সময়ে ঐ সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে তেমন বাধা দেখা যায় না। এজন্য এখন বলা যাইতেছে।

বাঙ্গলা ১১৩৭ সনে ইংরেজী ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম বাঙ্গলার অন্তর্গত বারাসতের অধীন (কাঁকড়া) কচুয়া গ্রামে ৺রামকানাই ঘোষাল মহাশয়ের ঔরসে স্বর্গীয়া কমলাদেবীর গর্ভে শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম হয়।

লোকনাথের কথা শুনিয়া ১২৯৬ কি ৯৭ সনের বৈশাখে আমি তাঁহার জন্মভূমি দর্শন করিতে গমন করি।

আমি বারাসত হইতে টাকি অভিমুখের বান্ধা রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছিলাম। প্রথমে অন্য এক কচুয়া গ্রামে গিয়া একদিন অবস্থান করিয়া তথায় যে লোকনাথ ঘোষাল ও ভগবান্ গাঙ্গুলীর বাড়ী ছিল এমন কোনও সন্ধান পাইলাম না। তাহাতে বড় হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন সেই গ্রামে কাঁকড়া গ্রামের সংলগ্ন কচুয়া নামে অন্যগ্রাম রহিয়াছে জানিতে পারিয়া পুনরায় সেই বাঁধা রাস্তায় আসিয়া টাকি অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। ঐ রাস্তা ছাড়িয়া মাঠ দিয়া অগ্রসর হইয়া কাঁকড়া কচুয়া গ্রাম পাইলাম এবং শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়া কতক দিন বাস করিলাম এবং উহাই যে ব্রহ্মচারিবাবার ও তদীয় গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলীর জন্মস্থান একথা স্থির করিলাম। ঐ গ্রামে "মঠ রাজার বাড়ী" বলিয়া একটী প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। তাহাও গ্রামের নিকটবর্ত্তী বিলটীর নাম "মইজলা" স্মরণ করিয়া আনিয়া ব্রহ্মচারিবাবাকে বলিলাম

ব্রহ্মচারিবাবা মঠরাজার বাড়ীর কথা বলিতে পারিলেন না। কিন্তু বিলটির কথা স্বীকার করিয়াছিলেন।

লোকনাথ ঘোষাল

বাঙ্গলা ১১৩৭ সনে ইংরেজী ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত বারাসতের অধীন (কাঁকড়া) কচুয়া গ্রামে লোকনাথের জন্ম হয়। 'তাঁহার পিতার নাম ৺রামকানাই ঘোষাল, মাতার নাম ৺কমলা দেবী। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! একশত দেড়শত বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের পরিচয় পর্য্যন্তও সেই গ্রাম হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সেই বংশীয় কোনও লোক যে সেই গ্রামে বাস করিতেন এমন কথাও কেহ বলিতে পারিল না। আমি ২।৪ দিন তথায় থাকিয়া, বিস্তর অনুসন্ধান করাতে একজন বলিলেন, আমাদের পুরাতন কওলাতে যে চতুঃসীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে ঐ উপাধিধারীদের জমির উল্লেখ রহিয়াছে; ইহাতে অনুমান করা যায় যে, এ গ্রামে পূর্ব্বে তাদৃশ উপাধিধারী ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। আমি ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মচারিবাবার নিকট গ্রামের অবস্থাদি বর্ণনা করাতে, তিনি উহাই তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিলেন।

তৎকালীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এরূপ সংস্কার ছিল যে, বংশের মধ্যে একটি লোকও যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া বাহির হইতে পারেন তবে সেই কুলের উদ্ধার সাধন হয়; সেই কুলের চতুর্দ্দশ পুরুষের জন্য আর পিণ্ডদানের আবশ্যক হয় না। ব্রহ্মচারিবাবার পিতা এতাদৃশ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া একাদশ বৎসর বয়সে পুত্রের যজ্ঞোপবীতসংস্কার সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে আচার্য্য গুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া জন্মের মত বিদায় করেন। তদবধি ব্রহ্মচারিবাবা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া আচার্য্য গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলীর সহিত বহির্গত হন।

তৎকালে সেখানে ভগবান্ গাঙ্গুলীর ন্যায় পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোক দ্বিতীয় ছিল না। তিনি ষড়দর্শনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তখন বৃহৎ ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মিথিলা ও বঙ্গ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সমাজের পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইতেন। সেই সকল সভায় শাস্ত্র মীমাংসক একমাত্র ভগবান্ গাঙ্গুলীই নির্দ্দিষ্ট ছিলেন। তৎকালে কোন সভাতেই ভগবানের অনুপস্থিতিতে কোন পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা হইতনা। ভগবানের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম গঙ্গাধর গাঙ্গুলী। এতদ্ভিন্ন ভগবানের অশ্রম ত্যাগের সময়ে তদীয় পুত্রও পাঠ সমাপ্ত করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারিবাবার পিতার পূর্ব্বহইতেই পুত্রকে ব্রহ্মচারী করিয়া দেওয়ার বাসনা বলবতী ছিল। এজন্য তাঁহার প্রথম পুত্র জন্মিলে তিনি তাহাকে ব্রহ্মচারীরূপে বাহির করিয়া দিতে যত্ন করেন, কিন্তু পুত্রের প্রসূতির প্রতিবন্ধকতায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তদীয় পত্নী কেবল প্রথম পুত্রের সময়েই প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন এমন নহে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুমার জন্মিলেও পিতা তাহাদিগকে ব্রহ্মচারী করিয়া দিতে চাহিয়া ছিলেন; ব্রাহ্মণী কোন মতেই তাহাতে সম্মত হন নাই; সুতরাং প্রথমজাত তিন পুত্রকেই রীতিমত গৃহস্থ ধর্ম্মে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং আপনার অভিপ্রায় ও পত্নীর বাধার কথা পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভগবান্ গাঙ্গুলীকে জানাইয়া উপযুক্ত পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

আমাদের কথিত লোকনাথ চতুর্থ পুত্ররূপে ভুমিষ্ট হওয়ার পরেই প্রসূতি স্বীয় পতিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ইতিপূর্ব্বে জাত তিনটী পুত্রের মধ্যে একটীকেও আমি ব্রহ্মচারী করিতে সম্মত হই নাই, আপনি এই নব-জাত পুত্রকে লইয়া ব্রহ্মচারী করুন।" এতৎশ্রবণে পুত্রের পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সত্বর যাইয়া ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত ভগবান্ গাঙ্গুলীকে এই সংবাদ দিলেন। ভগবান্ও তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মচারীর জাত কর্ম্মাদির ব্যবস্থা করিলেন।

ভগবান্ গাঙ্গুলী বুঝিলেন, এ ছেলে সামান্য নয়; "যার কাজ তারে সাজে, অন্যের তাতে লাঠি বাজে।" প্রথমকার তিন ছেলের বেলায় মাতা প্রতিবন্ধক হইলেন, আর সেই চতুর্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সেই মাতা আপনা হইতেই তাহাকে ব্রহ্মচারী করিয়া দিতে বলিলেন কেন? নিশ্চয় এই নবজাত পুত্রের মধ্যে ভাবী ব্রহ্মচর্য্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে। অতএব বাল্যকাল হইতেই ইহার নিকট উচ্চতম জ্ঞানের কথাগুলি অবতরণপূর্ব্বক, ইহার উচ্চভাব প্রস্ফুটিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। ব্রহ্মচারিবাবা বলিয়াছেন, "গুরুজনেরা শৈশবকালে আমার নিকট জ্ঞানগর্ভ কথা সকল উত্থাপন করিতেন, এবং যাহাতে আমার হৃদয় সেই দিকে আকৃষ্ট হয় এমত চেষ্টা করিতেন। আমি একদিকে গুরুজনদিগের সেই সকল কথা শুনিতাম, অন্যদিকে সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে বৃদ্ধদিগের ঘেঁটু (ঘণ্টাকর্ণ) পূজা সমাধা হইতে না হইতেই লাঠি দ্বারা ভাঙ্গিয়া দিতাম। এই ভাবে আমার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।"

গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলী

লোকনাথের জীবনীর সহিত ভগবানের ও বেণীমাধবের জীবন-বৃত্তান্ত বিশেষ ভাবে জড়িত। পুস্তকারম্ভে যে দুই মহাপুরুষের হিমালয় হইতে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে অবতরণের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাই এই লোকনাথ ও বেণীমাধব ব্রহ্মচারী। চন্দ্রনাথ হইতে বেণীমাধব কামাখ্যা যাত্রা করেন। বেণীমাধব জীবিত আছেন কিনা, আমরা ব্রহ্মচারিবাবাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলিলেন, "বেণী এখনও কামাখ্যাতে বাঁচিয়া আছে।" যখন ঐ প্রশ্ন করা হয়, তাহার দুই এক দিন পরে ব্রহ্মচারিবাবা উক্তরূপ উত্তর দিয়াছিলেন; ইহাতে আমরা বুঝিলাম, তিনি লঘুদেহ (Astral body) ধারণ করিয়া

বেণীমাধবকে দেখিয়া আসিয়াছেন। আজিও তিনি কামাখ্যাতে আছেন কি না বলা যায় না। বেণীমাধবও ব্রহ্মচারিবাবার ন্যায় একবার এক মাস কাল উপবাসী থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভগবান্ গাঙ্গুলী যে অশেষ শাস্ত্র পড়িয়া কেবল পণ্ডিতই হইয়াছিলেন এমন নহে; সাধন মার্গেও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি যে ভাবে ঐ দুই ব্রহ্মচারীকে চালাইয়া ছিলেন, তাহাতে আবদুল গফুর ও হিতলাল মিশ্র নামক দুইজন সিদ্ধপুরুষ ব্রহ্মচারিবাবাকে বলিয়াছিলেন, "আমরা এমন পাকা গুরুদ্বারা পরিচালিত হই নাই।" ভগবান্ যখন লোকনাথ ও বেণীমাধবকে লইয়া বাহির হন, তখন তাঁহার পুত্র উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত ছিলেন। তখনকার লোকেরা কিছু অধিক বয়সেই বিবাহ করিতেন। ইহাতে অনুমান হয় ভগবান্ গাঙ্গুলী প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে ১১৪৮ সনে সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাহির হন। কলিকাতার পূর্ব্বদিকে বারাসত ও টাকি পর্য্যন্ত প্রসারিত রাস্তার নিকটবর্ত্তী (কাঁকড়া) কচুয়া গ্রামে বাংলা ১০৮৮ সনে (কি ইহার নিকটবর্ত্তী সময়ে) রাঢ়ীয় কুলীনবংশে ভগবান্ গাঙ্গুলীর জন্ম হয়। আমি ব্রহ্মচারিবাবার প্রমুখাৎ ভগবান্ গাঙ্গুলীর মাহাত্ম্য শুনিয়া কচুয়াতে গিয়া ভগবানের বংশের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। এখন আর ভগবানের বংশ কচুয়াতে বাস করেন না, তাঁহারা স্থানান্তরে গিয়াছেন। আমি অদ্যাপি তাঁহাদের সন্ধান পাইলাম না। এক্ষণে কচুয়াতে যে সকল গাঙ্গুলী বাস করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভগবানের অনেক পরে কচুয়াতে আসিয়াছেন।

আমি ইহার পরে ঘটকদিগের মূলগ্রন্থে আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশাবলী মধ্যে ভগবান্ গাঙ্গুলীর অনুসন্ধান করি। তাহাতে জানা গেল কচুয়ার গাঙ্গুলীরা অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্রহ্মচারিবাবার গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলী সর্ব্বানন্দী মেলের রাঘব গাঙ্গুলীর সন্তান। সেকেলে ভাষাতে এই রাঘবকে সর্ব্বানন্দী

রাঘাই বলিত। এখানে গাঙ্গুলীদিগের বংশাবলীকে খড়দহ ও সর্ব্বানন্দী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখান যাইতেছে। "গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলীর সহিত পুনর্ম্মিলন" প্রবন্ধের সহিত একতা দর্শনের জন্য এই বংশাবলীর আবশ্যকতা হইবে।

বর্ত্তমান সময়ের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ছান্দর ও শ্রীহর্ষ এই পঞ্চবিপ্র, মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে কান্যকুব্জ (কনোজ) দেশ হইতে এতদ্দেশে আগমন করেন।

"ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।
অপি শ্রীহর্ষ নামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥"

তন্মধ্যে গাঙ্গুলীদিগের আদিপুরুষের নাম বেদগর্ভ।

সাবর্ণ গোত্র সৌভরি পুত্র—

(১) এই রাঘব বা রাঘাই হইতে সর্ব্বানন্দী মেল বন্ধন।

(২) এই নীলকণ্ঠ হইতে খড়দহ মেল বন্ধন।

১৯। শ্রীপতি　১৯। রামগোপাল সাং কচুয়া　১৯। যাদব

২০। রমানাথ　২০। রঘুনাথ　২০। রাজেন্দ্র

২১। রাঘব (৩)　২১। দুর্গাচরণ　২১। হরিচরণ

২২। শ্রীকৃষ্ণ　২২। রামকুমার　২২। রমাপতি

২৩। রামগোবিন্দ, হরেকৃষ্ণ, ২৩। ভগবান (৪) গঙ্গাধর　২৩। বাণেশ্বর

২৪। রুদ্ররাম সাং বাঘিয়া।　২৪। রাজকৃষ্ণ সাং কচুয়া। ২৪ মধুসূদন সাং কচুয়া　২৪ গোপাল　আনন্দ সাং কচুয়া।

২৫। রতিরাম　২৫ রামকুমার　২৫ রাধাকৃষ্ণ

রামচরণ

২৬। গঙ্গাগোবিন্দ　গঙ্গাধর　হারাধন　২৬ ভগবান (৫)

দীনমোহন

২৭। রামদুলাল ২৭ প্রসন্ন ২৭ চন্দ্র　২৭ শ্রীধর

শ্রীনবীনকৃষ্ণ

২৮। উমাকান্ত সাং বিক্রমপুর।　২৮। শ্রীশিবদাস সাং কচুয়া।　শ্রীঅবিনাশ সাং কচুয়া।　সাং কচুয়া।

২৯। এই গ্রন্থলেখক ও তদীয় অনুজগণ।

ভগবানের পিতার নাম রামাকুমার; ইহারা ৬।৭ পুরুষ কচুয়ার গাঙ্গুলী নামে খ্যাত হইয়া বাস করিয়াছে। সম্ভবতঃ ভগবানের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রভায় কচুয়ার গাঙ্গুলীরা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকিবেন। ভগবানের জন্মের দুই শত বৎসর পরে, পূর্ব্ব-বাঙ্গলার বিক্রমপুরবাসী কোন ঘটকের নিকটে পশ্চিম বঙ্গের ভগবানের নামধাম স্ববংশাবলী পাইয়া আমরা বিস্মিত হইয়া

(৩) এই রাঘবা বাঘিয় গ্রামে বিবাহ করেন; ইহা হইতে এখানকার বেদের গাঙ্গুলী উৎপন্ন।

(৪) এই ভগবান ব্রহ্মচারীবাবার গুরু।

(৫) এই ভগবান্ গঙ্গাধর প্রভৃতির বংশধরগণ এখন কচুয়াতে বাস করেন; আশ্চর্য্যের কথা এই যে ভগবান ও গুরু ভগবানের বাসস্থান পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির নামের একতা কেন হইল ?

ছিলান। ১২৩৫ সনে ৺কাশীর মণিকর্ণিকায় ঘাটে, গঙ্গাস্নানের পরে ভগবান্ গাঙ্গুলী যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন। একথা পরে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে।

উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন

অতঃপর লোকনাথের উপনয়নের কাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভগবান গাঙ্গুলী তাঁহার আচার্য্যগুরু হইয়া ব্রহ্মচারিবাবাকে লইয়া বনবাসী হইতে সম্মত হইলেন। ব্রহ্মচারিবাবার পিতামাতা ভগবান্কে যথেষ্ট মান্য করিতেন; এই ব্যাপারে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ভগবান গৃহত্যাগ করিয়া বনবাসী না হইলে, একাদশবর্ষীয় বালক ব্রহ্মচারীকে কোন অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত গুরুর হস্তে জন্মের মত বিসর্জ্জন করিতে হইত। এইরূপ ব্যবহার পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল। চৈতন্যের সখা নিত্যানন্দ শৈশবকালে এক অপরিচিত অবধূতের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলেন। কোন অবধূত ভিক্ষা করিতে আসিয়া শিশু নিত্যানন্দকে চাহিয়া লইয়া অবধুত করেন; নিত্যানন্দ কিন্তু যথার্থ অবধূত হইলেন না, পরিশেষে অবধূত আশ্রম ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া বৈষ্ণব আচার্য্য হইয়া বিবাহ করিয়া পুনরায় গৃহস্থ হইয়াছিলেন।

বর্ণিতক্ষেত্রে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর উপলক্ষে তদীয় গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলীকে উদাসীন হইয়া বাহির হইতে হইয়াছিল।

লোকনাথের যজ্ঞোপবীতের দিন অতি প্রশস্ত (লগ্নসা) ছিল। সেই দিনে গ্রামের অন্যান্য বাড়ীতেও যজ্ঞোপবীত হইয়াছিল। তবে ব্রহ্মচারিবাবা সংসারত্যাগ করিয়া গুরুর সহিত বনবাসী হইবেন বলিয়া, ইঁহার পৈতা হওয়া গ্রামের মধ্যে একটি গুরুতর ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইল; বিশেষতঃ

তাহার সঙ্গে ভগবান্ গাঙ্গুলীও উদাসীন হইয়া জন্মের মত যাইতেছেন, এই কথা সত্বর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। ব্রহ্মচারীর সমবয়স্ক বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি বালকেরও ঐ দিন পৈতা হয়। বেণীমাধব পৈতার দিন উপস্থিত হইলে বলিতে লাগিলেন, "আমিও আমার বয়স্তের (লোকনাথের) ন্যায় গৃহত্যাগ করিয়া যাইব।" বেণীমাধবের অভিভাবকগণ বালচাপল্য বলিয়া, প্রথমে ঐ কথার দিকে বড় একটা কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু শেষে বালকের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া তাঁহাদের মন বিচলিত হইল, তাঁহারা ছেলেকে নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা, অরণ্যবাস জনিত কষ্টের তীব্রতা ব্যাখ্যা করিতে ত্রুটী হইল না। কিন্তু কিছুতেই বেণীমাধবের সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটিল না। তাঁহারা যতই বুঝান, যতই বাধা বিপত্তি প্রদর্শন করেন, বেণীর ব্রহ্মচারী হইয়া গমনেচ্ছা ততই প্রবল হইতে লাগিল। বেণীর অভিভাবকেরা অবশেষে বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত লইয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। অনেক বাক্‌বিতণ্ডা ও তর্কবিতর্কের পর সর্ব্বশেষে স্থির হইল যে, ভগবান গাঙ্গুলী এই বালকেরও আচার্য্য গুরু হইয়া উপনয়নক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ উভয়কে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিবেন।

উপরি লিখিত মতে নির্দ্ধারিত দিনে ভগবান গাঙ্গুলি লোকনাথ ও বেণীমাধবের উপনয়নক্রিয়া নিষ্পন্ন করিলেন, কিন্তু বালকদ্বয়ের সমাবর্ত্তন ঘটিল না। ব্রহ্মচারী বলিতে একণে শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত চারি মঠের ব্রহ্মচারীদিগকে বুঝাইয়া থাকে। লোকনাথ ও বেণীমাধব তেমন ব্রহ্মচারী হন নাই; ইহারা পুরাকালের বেদোক্ত বিধিমত নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন। দেবলোকে সনক, সনন্দ, সনাতন প্রভৃতি এবং বালিখিল্যগণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর উদাহরণস্থল।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণকুমারগণ পৈতা হওয়ার পরে, আর প্রায়শঃ পিতৃগৃহে থাকিত না। তখন তাহারা গুরুকুলবাসী হইত। এ অবস্থাকে তাহাদের পঠদ্দশা বলা যায়। এক্ষণকার বালকেরা বোর্ডিংএ থাকিয়া প্রচুর বিলাসিতা উপভোগ করিয়া থাকে, পূর্ব্বে গুরুকুলবাসীদিগকে ইহার পরিবর্ত্তে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইত। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাসের জন্য গুরু যখন বালককে পিতৃগৃহ হইতে স্বকীয় আশ্রমে আনয়ন করিতেন, তাহাকে উপনয়ন কহিত। এরূপ আনয়ন পাকা আনয়ন হইত না এজন্য ইহার নাম—উপনয়ন।

বালক গুরুগৃহে আগত হইলে, গুরু তাহাকে আপনার অধীত বেদ সকল অভ্যস্ত করাইতেন। যে সকল বালক জন্মান্তরীয় বিশিষ্ট সংস্কার সম্পন্ন থাকিতেন, তাঁহারা অল্পকালেই গুরুর অধীত বেদরাশি অভ্যস্ত করিয়া ফেলিতেন। অপরদিগের বিলম্বে বেদাভ্যাস ঘটিত। এই প্রকারে বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিতে করিতে যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিত, তাঁহাদের পক্ষে অন্য আশ্রম গ্রহণ করার তেমন কোন আবশ্যকতা হইত না। যাঁহারা চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করেন, তাহাদিগকে "নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী" বলে আর যাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে তদৃশ জ্ঞান উৎপত্তি ঘটে না, তাঁহাদের জ্ঞান লাভের জন্য অন্য আশ্রম গ্রহণ করার আবশ্যক হয়। তাঁহারাই পাঠ সাঙ্গ করিয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, দারপরিগ্রহসহকারে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন শেষোক্ত ব্রহ্মচারী-দিগকে "উপকুর্ব্বাণ" ব্রহ্মচারী বলে। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীদিগের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের নাম "সমাবর্ত্তন।"

বর্ত্তমান সময়ে উপনয়নের পর দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদ অভ্যাস করিতে হয় না। যিনি আচার্য্য গুরু হইয়া উপনয়ন করেন, তিনিও অনেক সময়ে গায়ত্রীর অধিক বেদ জানেন না, সুতরাং উপনীত বালক, একদিনেই গুরুর অধীত সমস্ত বেদ

(গায়ত্রী) অভ্যাস করিতে পারেন। এতাদৃশ ব্রহ্মচর্য্যে জ্ঞান উৎপত্তির সম্ভাবনা প্রায়ই নাই, সুতরাং এখনকার কালে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীও হয় না। উপনয়নের দিনে আমরা (এক্ষণকার গৃহস্থ দ্বিজগণ) সকলেই উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী থাকি, অতএব আমাদের পক্ষে উপনয়নের দিনেই সমাবর্ত্তনক্রিয়া সাধিত হওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও বেণীমাধবের উপনয়ন, আমাদের ন্যায় সাধারণ ব্রাহ্মণের মত নহে, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে জ্ঞানলাভ করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইতে চলিলেন। এজন্য উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারিদিগের অনুরূপ তাঁহাদের সমাবর্ত্তন হয় নাই।

উপনয়নের পরই লোকনাথ ও বেণীমাধব বালক ব্রহ্মচারি-যুগল, গুরু ভগবানের সমভিব্যাহারে, প্রিয় জন্মভূমি হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা চলিতে চলিতে কলিকাতা কালীঘাটে আসিয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন। তখন বাঙ্গালা ১১৪৮ সন। তিনি বলিয়াছেন—"তৎকালে কলিকাতা জঙ্গলময়, কালীঘাট ও নিবিড় বনে আচ্ছাদিত ছিল। ইংরেজেরা। কালীঘাটের নিকটে সওদাগরি ব্যবসা করিতেছিলেন। তখনও ইংরাজের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে নাই। আমরা যখন কালীঘাটে আসিয়াছিলাম, তখন বহুসংখ্যক দীর্ঘ জটাজুটধারী সাধু সন্ন্যাসী তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। আমি ও বেণী এই অভিনব জীবদিগকে পাইয়া বিলক্ষণ তুষ্ট হইলাম। কয়েক দিন থাকিয়া কালীঘাটকে আমরা বাড়ী ঘরের মত করিয়া লইলাম। সাধুরা যখন চুপ করিয়া স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিতেন, তখন বালকস্বভাব-সুলভ-চপলতাবশতঃ আমরা কাহারও জটায় হস্তার্পণ, কাহারও বা লেংটি স্পর্শ করিতাম তাঁহারা কিছু বলিতেন না। আমরা প্রশ্রয় পাইয়া উহাদের জটা ও লেংটি ধরিয়া টান দিয়া পলায়ন করিতাম। সাধুরা আমাদের উপদ্রব কয়েকদিন সহ্য করিয়া অবশেষে গুরুদেবকে জানাইলেন। গুরুদেব উত্তর

করিলেন—'আমাকে বলেন কেন? আমিত গৃহী। ইহারা আপনাদের লোক, আপনারা ইহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লউন। আমি গৃহ হইতে আপনাদিগের দুইটী বালক সঙ্গে করিয়া আনিয়া আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছি।' এই উত্তর শুনিয়া সাধুরা আর গুরুদেবকে অনুযোগ করিতে পারিলেন না, আর কিছু করিলেনও না। তাহার পরে গুরু আমাদিগকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন—'তোমরা যে উহাদের জটা খসাইয়া ফেল, ও লেংটি ধরিয়া টান, বড় হইলে যখন অন্যেরা তোমাদের জটা ও লেংটি ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকিবে তখন কি করিবে? আমি বলিলাম—সে কি? আমরা পৈতার দিনের চেলির কাপড় পরিয়াছি, আমাদের জটা ও লেংটি হইবে কেন? গুরু বলিলেন—'তোমরা ঐ সকল ছাড়িয়া উহাদের মত হইতে আসিয়াছ তাহা কি এখনও বুঝিতে পার নাই? আমি বলিলাম—আমরা যদি উহাদের মত হইতে আসিয়া থাকি, তবে উঁহারা ভিক্ষা করিয়া খান, আর আমাদের ঘর হইতে খরচ আসে কেন? গুরু বলিলেন—'তাহাও আমাদের ভিক্ষা স্বরূপ। আমরা এখানে আছি, এই কথাটি আমাদের পরিত্যক্ত বাটীতে প্রকাশ থাকাতে তথা হইতে খরচ আসিয়া থাকে।' আমি বলিলাম তবে আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নহে, শীঘ্র কোন দূরতর স্থানে প্রস্থান করা উচিত। গুরু তাহাই করিলেন। আমরা কালীঘাট ছাড়িয়া চলিলাম। ব্রহ্মচারী বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন "নূতন কোন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে বা কোথাও যাইতে হইলে গুরুদেব আমাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চলিতেন।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, লোকনাথের মধ্যে দিয়া স্বভাবতঃ যেটা প্রস্ফুটিত হইবে, তাহা বিশেষ মূল্যবান হওয়ার সম্ভাবনা। লোকনাথের স্বাভাবিক গতিরোধ না করিয়া সেইভাব বিকাশ হওয়ার জন্য যত্ন করিলেই ভাবী সিদ্ধির সাহায্য করা হইবে।

কঠোর ব্রহ্মচর্য্য

কালীঘাট ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীর দল প্রায়শঃ জঙ্গলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাহাদিগকে "নক্তব্রত" নামক বিশেষ নিয়মাবলম্বন করিতে হইয়াছিল। "নক্ত" শব্দের অর্থ রাত্রি; দিবাতে অনাহারী থাকিয়া রাত্রিতে হবিষ্য করা, "নক্ত-ব্রতের" নিয়ম। গুরু ভগবান্, লোকনাথ ও বেণীমাধবকে জঙ্গলে রাখিয়া দিনের শেষভাগে ভিক্ষাসংগ্রহের জন্য লোকালয়ে যাইতেন। ভিক্ষালব্ধ তিল ও দুগ্ধ দ্বারা একরূপ অন্ন প্রস্তুত করিয়া শিষ্যদ্বয়কে খাইতে দিতেন, নিজেও খাইতেন। ব্রহ্মচারিবাবা বলিয়াছেন, "আমরা প্রত্যহ সেই তিল ও দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন খাইয়া এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে তাহা আর খাইতে ভাল লাগিত না। সর্ব্বদা মনে করিতাম গৃহস্থেরা অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী ভিক্ষা দেয় না কেন?" ব্রহ্মচর্য্যের জন্য এতাদৃশ খাদ্যই যে প্রশস্ত, তাঁহারা তখন বুঝিতে পারেন নাই। বালকদ্বয় তখন গুরুর নিকট সর্ব্বোতভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। গুরুই তাঁহাদের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা ছিলেন। সুতরাং অনিচ্ছাসত্বেও উদর জ্বালায়, সেইরূপ খাদ্যই উদরসাৎ করিয়া কষ্টে সৃষ্টে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইতেন। এখনকার ব্যবসাদার গুরুরা অনেক সময় ধনবান্ শিষ্যদিগের তোষামোদ করিয়া থাকেন। অন্য দলের গুরুরা নানারূপ ভেল্কি দেখাইয়া, ডাক্তার, উকিল, হাকিম প্রভৃতি শিক্ষিত ও অর্থবান্ লোকদিগকে বিনা বেতনে হদ্দ খেজমত করাইয়া ছাড়েন। আমাদের কথিত ব্রহ্মচারিদ্বয়ের গুরুর তেমন ভাব ছিল না বরং গুরুই শিষ্যদিগের উল্টা খেজমত করিতেন; অথচ তাহাদের নিকট কিছুই প্রত্যাশা করিতেন না। শিষ্যদ্বয়ও জন্মান্তরীয় সংস্কারবশেই বাল্যাবস্থায় গুরুতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা হারাইয়া

ছিলেন। তাঁহাদের এই কষ্টজনক "নক্তব্রত" দশ পাঁচ দিনে বা দশ পাঁচ মাসে উদ্‌যাপন হয় নাই; প্রায় ৩০।৪০ বৎসর এই ব্রত করিতে হইয়াছিল। ব্রহ্মচারীরা পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন, "আমরা যুবক শিষ্যদ্বয় জঙ্গলে বসিয়া খাইব, আর তুমি বৃদ্ধ গুরু লোকালয় পর্য্যটন করিয়া ভিক্ষা করিবে, এটা আমাদের ভাল বোধ হয় না, এখন হইতে আমাদিগকে ভিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত কর না কেন?" গুরুদেব বলিলেন, "না, তেমন করিলে তোমাদের একনিষ্ঠতা রহিত হইবে। গৃহস্থদিগের বিবিধ ভাবভঙ্গি দেখিয়া তোমাদের চিত্ত মধ্যে তাদৃশ চিন্তা সকল উদিত হইয়া তোমাদের যোগ নষ্ট করিবে।"

ব্রহ্মচারিবাবা তাঁহার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'যাঁহারা সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী হন, তাঁহাদিগকে বিবিধ শাস্ত্রবেত্তা হইতে দেখা যায়, কিন্তু আমাদিগকে কোন শাস্ত্রই শিক্ষা দিতেছেন না কেন? এমন কি সংস্কৃত ভাষাটী পর্য্যন্তও শিক্ষা দিলেন না। আমরা কেমন ব্রহ্মচারী হইব?"

গুরুদেব বলিলেন, "তোমরা শাস্ত্র শিক্ষায় কষ্ট স্বীকার করিবে কেন? আমিই অতি কষ্ট করিয়া বহু শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি; তোমাদের জন্য যখন যে শাস্ত্র ব্যবহার আবশ্যক হইলে, তাহা আমার নিকটেই পাইতে পার। তোমরা যখন আমাতে আত্মসমর্পণ করিতেছ, তখন আমার অধীত বিদ্যা বিনা অধ্যয়নে তোমাদের মধ্যে সংক্রামিত হইতে পারিবে। তোমরা যদি শাস্ত্রাধ্যয়ন কর, তবে আমার আদেশের প্রতি তোমাদের তর্ক উপস্থিত হইবে। এখন যেমন বিরুক্তি না করিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হও, তখন তেমন পারিবে না; আমার আদেশ শাস্ত্রসঙ্গত হইল কিনা, এই কথা লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করিবে; সুতরাং তোমাদের মনঃস্থির হওয়ার বাধা ঘটিবে।"

ব্রহ্মচারিবাবা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে উপনয়ন সময়ের

সেই চেলির কাপড় খানাকে তিনি ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দড়ি পাকাইয়া পরিয়াছিলেন।

কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গুরুদেব শিষ্যদ্বয়কে কঠিন ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন এমন নহে। যাহাতে জন্মান্তরের উৎকৃষ্ট সংস্কারগুলি অন্তঃকরণে বিকশিত হয়, গুরুদেব সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করিতেন। উন্মার্গগত কোন বিরুদ্ধ সংস্কার উদিত হইয়া সৎসংস্কার বিকাশের বাধা জন্মাইলে, তিনি বিবিধ উপায়ে সেই মন্দ সংস্কারকে সমূলে উৎপাটিত করিতে যত্ন করিতেন। এইজন্য শিষ্যদিগের মধ্যে কখন কোন্ ভাবের উদয় ও বিলয় হইতেছে, গুরুদেব সতর্কতার সহিত তাহার পরীক্ষা করিতেন এবং সংস্কারগুলিকে বদ্ধমূল করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতেন।

লোকনাথ ও বেণীমাধব "নক্তব্রত" উদ্‌যাপন করিয়া "একান্তরা" আরম্ভ করিলেন। একদিন সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিয়া, পরের দিন আহার করার নাম "একান্তরা"। এই একান্তরা অভ্যস্ত হইয়া গেলে "ত্রিরাত্রি" অর্থাৎ তিনদিন উপবাস থাকিয়া চতুর্থ দিবসে অন্ন গ্রহণ করিতেন। ইহার পর "পঞ্চাহ"—পাঁচদিন অনাহারী থাকিয়া ষষ্ঠ দিবসে ভোজন করিতেন। তাহার পর "নবরাত্রি" অর্থাৎ নয় দিন উপবাসের পর অন্ন গ্রহণ করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় এত দীর্ঘকাল উপবাস করিয়া তাঁহারা কিরূপে অবস্থান করিতেন, এই বিষয় সাধারণ বুদ্ধিতে উপলব্ধি করা সুকঠিন। ব্রহ্মচারিবাবা বলিয়াছেন, "উপবাসের কালে যাহাতে আমাদের কোনরূপ অঙ্গসঞ্চালন করিতে না হয়, সে বিষয়ে গুরুদেব সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। এমন কি মল ও মূত্র ত্যাগের জন্যও শরীর নড়া চড়া করিতে গুরুদেবের নিষেধ ছিল। মল মূত্র ত্যাগ হইলে, গুরুদেব আসিয়া জল শৌচাদি সমাধা করাইয়া দিতেন এবং আমাদিগকে ধরিয়া তুলিয়া পরিষ্কার স্থানে বসাইতেন,

তৎপর বিষ্ঠা দূরে ফেলিয়া স্থান পরিষ্কার করিতেন।” আমরা দেখিয়াছি এই সকল কথা বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারিবাবার চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইত। বারদীর ব্রহ্মচারিবাবার ন্যায় লোকও যেমন কোথাও দৃষ্ট হয় না, তাঁহার গুরুভক্তির তুলনাও কোথায় মিলে না। গুরুদেবের কথা স্মরণ করিয়া যে তিনি কিরূপে গলিয়া যাইতেন তাহা পার্শ্বস্থ সকলে বোধহয় টের পাইত না। ধন্য গুরুভক্তি! বলিহারি যাই! আমি তাঁহার গুরুভক্তি দেখিয়া গুরুভক্তির গুরুত্ব অনুভব করতঃ আর তাঁহাকে গুরুদেব বলিতে ভরসা পাই নাই। আমাদের গুরুদেব সম্বোধন কথার কথা মাত্র, তাঁহার কিন্তু গুরুভক্তি তেমন সহজ নহে, উহা তাঁহার হৃদয়ের সহিত জড়িত ছিল।

ব্রহ্মচারীবাবা বলিতেন, “ব্রহ্মচর্য্যের প্রথমাবস্থায় যেমন আমাদিগকে নির্জ্জনস্থানে বসাইয়া রাখা হইত, শেষে গুরুদেব তাহার বিপরীত করিতেন। তিনি আমাদিগকে লইয়া যেখানে মেলা হয়, বহুলোকের জনতা হয়, তথায় বসাইয়া দিতেন। গুরুদেবের নিকট বহুলোকের মধ্যে মনঃসংযম করা কঠিন বলিয়া আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন, ‘নির্জনে যেমন চিত্ত স্থির করা অভ্যাস করিয়াছ, জনতার কলরবের মধ্যেও তেমন করিতে হইবে।’ তখন তাঁহার অভিপ্রায় মতে মনঃসংযোগ করিতে যত্নপর হইতাম। এইরূপ করিয়া মশা ও পিপীলিকার উৎপাত সহ্য করিতেও অভ্যাস করাইয়াছেন। এক সময়ে কোন জঙ্গলে অবস্থান কালীন বলিয়াছিলাম, “এখানে পিপীলিকার বড় যন্ত্রণা, স্থানান্তরে গেলে হয় না?” তাহার পরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া থাকিয়া দেখিলাম গুরুদেব আমার অগোচরে চিনি ছড়াইয়া দিয়া পিপীলিকাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছেন। তখন বুঝিলাম পিপীলিকার দংশন অভ্যাস করার জন্য এরূপ করা হইতেছে। তদবধি পিপীলিকা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান নিরূপণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলাম। এইরূপে মশার

বিজ্ঞানও পাওয়া গিয়াছে।

এইভাবে ব্রহ্মচারীরা বাহিরে উপবাস অভ্যাস ও ভিতরে সমাধি অবলম্বন এবং বিজ্ঞানানুসন্ধান করিতেন। এ বিজ্ঞান—জড় বিজ্ঞান নহে, ইউরোপীয় সভ্যদিগের পরিজ্ঞাত মনোবিজ্ঞানও নহে—ইহার অস্তিত্ব অদ্যাপিও পাশ্চাত্য সমাজের অগোচর রহিয়াছে।

"নবরাত্রি" করাই ব্রহ্মচর্য্যের চরম কঠোরতা বুঝিতে হইবে না। লোকনাথ ও বেণীমাধব "নবরাত্রি" ব্রত সমাধা করিয়া "দ্বাদশাহ" ব্রত করিলেন। ইহাতে বার দিবস উপবাসী থাকিয়া পরে অন্নাহার পাইতেন। তাহার পর "পক্ষাহ" অর্থাৎ পনর দিবস উপবাসান্তে অন্ন ভক্ষণ করিতেন। ব্রহ্মচারিবাবা ও বেণী-মাধব এই ব্রত অনুষ্ঠানেও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে "মাস-ব্রত।" সাধারণ বুদ্ধিতে মনুষ্য একমাস উপবাস করিতে সমর্থ, একথা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। এজন্যই "অসম্ভবং ন বক্তব্যম্" বলিয়া এসকল কথা প্রচার করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

এরূপ নিষেধ সত্বেও যে লিখিতেছি তাহার কারণ এই যে, আমাদের এই সকল লেখা সচরাচর অসাধারণ লোকেই পাঠ করিয়া থাকে, সাধারণ লোকের পাঠ্য ইহাতে কিছুই নাই। তাহারা নাটক, নভেল ও সংবাদপত্র পাঠ করিয়াই তৃপ্ত থাকে। এই সকল কথা প্রকাশ্য পত্রিকায় বাহির হইলেও সাধারণের নিকট অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়।

কেবল একথা কেন তাহার জীবনী লেখা সম্বন্ধেও এরূপ নিষেধ ছিল। শ্রীমান্ প্রেমানন্দ ভারতী (যিনি পরে আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বাবাভারতী নামে সুপরিচিত) আমার শাসনাধীন হইয়া চলিতে ভালবাসিতেন। উক্ত শ্রীমান্ একসময়ে আমার সঙ্গে ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রমে বারদীতে তাঁহাকে দেখিতে যায়।

পূর্ব্বাশ্রমে প্রেমানন্দ ভারতী সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জীবনী প্রভৃতি লিখিতে বেশ অভ্যস্ত ছিলেন। সেই অভ্যাস ও সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কাগজ কলম নিয়া ব্রহ্মচারীবাবার নিকট বসিয়া গেলেন এবং বাবার জীবনের ঘটনাগুলি বলিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া বলিলেন যে তদীয় জীবনের ঘটনাবলম্বনে একখানা জীবনী লিখিতে তাহার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে। এই প্রস্তাবে ব্রহ্মচারিবাবা অত্যন্ত বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "উঠ্, উঠ্, এখান থেকে। আমার আবার একটা জীবনী! "রামায়ণ" রহিয়াছে, "মহাভারত" রহিয়াছে তাহাতে চলে না? রামায়ণ পড়িয়া কয়টা লোক রাম লক্ষ্মণ বনিয়াছে? মহাভারত পড়িয়া কয়টা লোক যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় সত্যপরায়ণ হইয়াছে? কয়টা প্রহ্লাদ, কয়টা ধ্রুব জন্মিয়াছে? যা যা রেখে দে তোর দোয়াত কলম, আমার জীবনী লিখিতে হইবে না। এইটী আদেশের স্থল, উপদেশের স্থল নহে।" এরূপ নিষেধ সত্ত্বেও কেন এই বহি লিখিতেছি তাহার কারণ পরে প্রকাশিত হইবে।

"নক্তব্রত" অনুষ্ঠান ৩০।৪০ বৎসরকাল অভ্যাস করা হইয়াছিল, একথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী উপবাসের ব্রত সকল তত অধিক বৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয় নাই। উপবাসের ব্যাপককাল যতই ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইতেছে, তাদৃশ ব্রতের সংখ্যাও ততই ন্যূন পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মচারিবাবা বলিয়াছেন "মাস-ব্রত" মোটে দুইবার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। বেণীমাধব, ব্রহ্মচারিবাবার ন্যায় প্রথমবার একমাস-কাল উপবাসী ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বারে সম্পূর্ণ একমাস উপবাস করিতে পারেন নাই।

জাতিস্মরতা লাভ

ব্রহ্মচারিবাবা যখন চিত্ত একাগ্র করিয়া দ্বিতীয়বার একমাস

উপবাস করিতে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনোমধ্যে এক অদ্ভুত ছবি প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি আমার নিকট বলিয়াছেন, "আমি তখন স্বপ্নের ন্যায় দেখিতে পাইলাম যে, বর্দ্ধমান জেলার মধ্য দিয়া, দামোদর নদ তর তর করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাহার তীরে বেরুগাঁ নামে এক বৃহৎ পল্লী। সেই গ্রামে এক বন্দোপাধ্যায় পরিবারের মধ্যে আমি সীতানাথ বন্দোপাধ্যায় নামে বিচরণ করিতেছি। গুরুদেবের নিকট এ সকল কথা ব্যক্ত করিলে তিনি দোয়াত কলম আনিয়া দিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সকল কথা লিখিয়া দিতে বলিলেন। আমিও তাহাই করিলাম। ইহার অনেক দিন পরে তিনজন ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলাম। অনেক দিন পরে আমরা কোন অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইলে, গুরুদেব একটি নদী দেখাইয়া বলিলেন, 'এস্থান কখনও দেখিয়াছ কি?' আমি মাস-ব্রতের সময় পরিদৃষ্ট সেই কথা স্মরণ করিয়া বলিলাম, 'আপনাকে যে দামোদর নদের কথা লিখিয়া দিয়াছি ইহাই সেই দামোদর নদ বলিয়া বোধ হইতেছে।' তাহার পর বেরুগ্রামও চিনিতে পারিয়া, তথায় প্রবেশ করিলাম। ফলতঃ মাসব্রত করার সময়ে যে দৃশ্য হৃদয়ক্ষেত্রে উদিত হইয়াছিল, তাহা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন নহে। অতীত ঘটনার স্মৃতির উন্মেষস্বরূপ বুঝিতে পারিলাম।"

"বেরুগ্রামে যে সকল প্রাচীন লোক জীবিত ছিল, তাহারা সীতানাথ বন্দোপাধ্যায়ের কথা বিশেষ করিয়া যতই বলিতে লাগিল, ততই আমার স্মৃতির বিকাশ হইতেছিল। তাহাদের কথিত সীতানাথের পিতার নাম প্রভৃতির সহিত আমার লিখিত কথার ঐক্য হইল। তৎকালে সীতানাথদিগের বাস্তুভিটাতে তাহার পিতার বংশধর কেহই বিদ্যমান ছিলনা, উহা ছাড়াবাড়ী হইয়াছিল। জ্ঞাতিগোষ্ঠিরা ঐ বাড়ীর নিকটে বাস্তব্য করিতেছিলেন।"

বর্ত্তমান সময়ের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মচারিবাবা স্বীয়

পূর্ব্ব-জন্মস্থান বেরুগ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার মুখে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শুনিয়া তাঁহার পূর্ব্বতন জন্মস্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমি বর্দ্ধমান জেলার দামোদর নদের তীরবর্ত্তী বেরুগাঁতে গিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধীধারী কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ দেখিয়া আসিয়াছি। তাহাদের বাসস্থানে অনেকগুলি দেবমন্দির দৃষ্ট হইল। তাহা যে একশত বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে এমন বুঝা যায় না। আমি ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মচারি-বাবাকে বেরুগাঁয়ের বর্ত্তমান অবস্থা বলিলাম। তিনি যখন তথায় গিয়াছিলেন, তখন যে ঐ সকল মন্দির বিদ্যমান ছিল এমত বলিতে পারিলেন না।

ব্রহ্মচারিবাবা বলিয়াছেন, "মাস-ব্রতের সময়ে যে পূর্ব্বজন্মস্মৃতির উদয় হইয়াছিল বেরুগ্রামে গিয়া তাহা প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তাহার পর সেই দিকে স্মৃতি পরিচালন করিয়া ক্রমে ক্রমে আনুসঙ্গিক সকল ঘটনা ইহ জীবনের অতীত ঘটনার ন্যায় স্মৃতিপথে আসিয়াছে।" আমি বিশেষ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এতৎ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি পরিস্কাররূপে বুঝাইয়া বলিয়াছেন, "বেরুগ্রামের সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রূপে জীবিত থাকিয়া যাহা যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এবং মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান জীবনে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সমস্ত স্মরণ হইতেছে। কিন্তু ইহজীবনে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অবধি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত শৈশবকালের অবস্থা এখন পর্য্যন্ত স্মরণ হইতেছে না। ঐ কয়েক বৎসরের পরে ধীরে ধীরে তোমাদের যেমন বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে, আমারও তেমন রহিয়াছে।"

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তুমি সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইয়া এমন কি কি কার্য্য করিয়াছিলে, যাহার ফলে এই জীবনে ব্রহ্মচারী হইয়া সিদ্ধিলাভ করতঃ মনুষ্য জীবনের

চরম পথে গমন করিতে সমর্থ হইতেছে?" তিনি বলিলেন, 'তেমন কার্য্য সীতানাথের দ্বারা কিছুই অনুষ্ঠিত হয় নাই। বোধ হয় তাহারও পূর্ব্বে কোন জন্মে বিশেষ উত্তম কার্য্য করিয়াছিলাম। আমি গত জন্মেও ভ্রাতাদিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর ছিলাম। তখনও বিবাহ করিয়াছিলাম না। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূগণ আমাকে বিবাহ করার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতেন। আমি ৪০।৫০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় সীতানাথ দেহ ছাড়িয়া আসিয়াছি। বধূঠাকুরাণীগণ শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ করার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছেন। আমার গত জীবনের এই একটা বিশেষ প্রকৃতি ছিল যে, আমি কাহারও সহিত মিশিতাম না। দশ জনে মিশিয়া কোথাও যাইতাম না। একাকী ঘরে পড়িয়া থাকিতে ভাল বাসিতাম এবং সেইভাবে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছি। অনেক সময় গ্রামস্থ সমবয়স্ক পুরুষগণ দল বাঁধিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমাকে নিয়া যাইতে চাহিয়াছে, কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছে, কিন্তু আমি প্রায়শঃ তাহাদের সহিত যাই নাই।"

সীতানাথের দেহান্তে লোকনাথ জন্মগ্রহণ

আমি বিশেষ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মচারিবাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক দেহ পরিত্যাগ করিয়া মরণান্তে কি অবস্থায় ছিলেন?" তিনি বলিয়াছেন, "আমি মরণের পরবর্ত্তীকালে সুখে বিভোর ছিলাম। মাতৃগর্ভে আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার এই সুখ সমভাবে বিদ্যমান ছিল।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার তাদৃশ সুখভোগ কোথা হইতে আসিত?" তিনি আমার প্রশ্নের ভাব ভাল করিয়া না বুঝাতে বিশেষ করিয়া বলিলাম, "আপনার যে সুখভোগ হইতেছিল তাহা

কি কোন উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণদ্বারা উৎপন্ন হইত? না, কোন স্বর্গীয় যুবতী জনের সংসর্গে অনুভূত হইত? অথবা কোন সুললিত গীতবাদ্যাদি শ্রবণে সুখে বিভোর হইতেন? কিম্বা এ সকলও অন্যান্য ভোগ্য বস্তুর একত্র উপভোগ দ্বারা সেই সুখোদয় ঘটিত? তাহা স্মরণ করিয়া দেখুন।" ব্রহ্মচারিবাবা বলিলেন "তৎকালে যে কিরূপে এতাদৃশ সুখের সমাবেশ ঘটিত তাহা আমি অবগত নহি। তখন যে সুখে ছিলাম, একথা বিলক্ষণ স্মরণ আছে। কিন্তু কি উপায়ে এই সুখের সমাগম ঘটিত, তাহা আমি স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না; সুখে ছিলাম, এই পর্য্যন্ত জানি।"

ব্রহ্মচারিবাবা সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক দেহত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পরে "সুখে ছিলাম" মাত্র বলিয়াছিলেন, বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে পারেন নাই। তাঁহার তাদৃশ অবস্থা কি স্বর্গভোগ, অথবা আর কোন ভাবের ছিল, এই কথার মীমাংসা করা আবশ্যক।

এ দিকে নব্যগণ মনুষ্য বিশেষের (Medium) দেহ মধ্যে মৃত মনুষ্যের প্রেতাত্মা আনয়ন করিলে সেই সকল প্রেতগণ বলিয়া থাকে, "আমি সপ্তম স্বর্গে সুখে বা অমুক স্বর্গে সুখে আছি।" সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেইরূপ প্রেত হইয়াছিলেন কিনা দেখিতে হইবে।

শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে মৃত মনুষ্যদিগের প্রধানতঃ দুইটি অবস্থা জানা যায়। প্রথম গতিহীন বা প্রেতাবস্থা। দ্বিতীয় গতিলাভ অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতি মধ্যগতি বা অধোগতি। যাহারা অহিন্দু বা বেদের প্রতি আস্থাহীন কিম্বা যাহারা পরলোক মানিতে পারে না অথবা যে সকল মনুষ্য স্বধর্ম্মচ্যুত, এবম্প্রকার ও অন্যান্য দুষ্কর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিরা মরণান্তে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। কলিযুগের পূর্ব্বতন দ্বাপরাদিযুগে এতাদৃশ নষ্টমতি লোক অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিত। অতএব শাস্ত্রে সেই সকল যুগে প্রেতের প্রাদুর্ভাব ছিল না বলিয়া

কথিত আছে। কলিতেই অধর্ম্ম বাহুল্যবশতঃ প্রেতবাহুল্য ঘটিয়াছে। প্রেতদের বায়ব্যদেহের মধ্যে ইন্দ্রিয় দ্বার সকল বিকাশিত থাকে না, সুতরাং অন্য দেহের সাহার্য্য ভিন্ন বাক্যবল, ভোজন করা প্রভৃতি ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ হয় না। এজন্য নিস্তেজ জীবিত মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া নিজেরা শান্তিলাভ করিতে যত্ন করে। যাহাদের শরীরে প্রবেশ করে, তাহারা ভূতাবিষ্ট বা হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত বলিয়া লোক সমাজে কথিত হয়। হিন্দুরা মৃতব্যক্তির প্রেতত্ব দূর করিয়া গতি সম্পাদনের জন্য শ্রাদ্ধ ও গয়ার পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। তাহাতে প্রেত-দিগের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ হয়। কিন্তু হিন্দু ভিন্ন অপরাপর জাতীয় মনুষ্যগণ শ্রাদ্ধাদি করার সংকেত বিদিত নহে। তজ্জাতীয় প্রেতগণ চিরকাল প্রেতাবস্থায় গতিহীন থাকিয়া যায়। তাহাদের পুনর্জ্জন্ম সম্ভাবনা একরূপ রহিত হয়। এজন্য হিন্দু ভিন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে পুনর্জ্জন্ম কথা প্রচলিত নাই।

(Medium) মনুষ্যের মধ্যে যে সকল প্রেতাত্মা আসিয়া "আমি অমুক স্বর্গে আছি" ইত্যাকার বাক্য বলিয়া থাকে তাহাদিগের সত্যবাদিতার প্রতি আমি অধিক নির্ভর করিতে পারি না। শাস্ত্র-মতে সত্যনিষ্ঠ লোকগণ প্রেত হয় না। অসত্যপরায়ণ মনুষ্য-দিগেরই মরণান্তে প্রেতত্ব সংঘটিত হয়। তাহারা জীবিতাবস্থায় যেমন সংস্কার অর্জ্জন করিয়া থাকে, মরণের পরও তাহাদ্বারাই চালিত হয় বলিয়াই অবগত আছি। এজন্য প্রেতাত্মার কথিত কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমি বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। তবে কি না, প্রেতদিগের মধ্যে অবস্থার ইতর বিশেষ থাকা সম্ভব। তদনুসারে অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রেতগণ নিকৃষ্ট প্রেতাত্মার তুলনায় আপনাদের অবস্থাকে স্বর্গ বলিতে পারে। এতাদৃশ স্বর্গ শব্দে ইংরেজী (Heaven) পর্য্যন্ত ধরা গেলেও শাস্ত্রোক্ত স্বর্গ বুঝাইতে পারে না। শাস্ত্রমতে গতিহীন প্রেত কিরূপে স্বর্গ লাভ করিবে?

সীতানাথ যে প্রেতত্ব লাভ করে নাই, তাহা ব্রহ্মচারিবাবার কথা দ্বারা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

৺সীতানাথের দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ গতিলাভ ঘটিয়াছিল। তিনি উর্দ্ধগতিতে স্বর্গে যান নাই, অধোগতিতে নরকে পতিত হন নাই। তাহা হইলে স্বর্গীয় বিলাসাদির কথা বা নরকের কঠোর যাতনার কথা জানিতে পারিতেন ও স্মরণ করিয়া বলিতে সমর্থ হইতেন। সুতরাং অবশিষ্ট মধ্যগতির মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিতে হইবে।

যোগীদের জন্য যেমন দেবযান ও পিতৃযান নামক দুই প্রকার পথ পরলোকের জন্য প্রসারিত আছে, সাধারণ কর্ম্মীদিগের যমলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত তেমন বিশেষ পথ বর্ণিত আছে। যাহারা মরণান্তে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না, অথচ স্বর্গ বা নরক ভোগের জন্য উর্দ্ধ বা অধোলোকেও গমন করে না, তাহারা মৃত্যুর পর পুনরায় মর্ত্ত্য-লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কি প্রকারে যে মৃতজীব মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, এ রহস্য অনেকে অবগত নহেন। কেহ কেহ মনে করে, বানর যেমন লম্ফদ্বারা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে নিপতিত হয়, জীবও সেইরূপ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া, নূতন দেহ ধারণের জন্য মাতার গর্ভে প্রবেশ করে। এক্ষণকার কল্পনাপ্রিয় মনুষ্যগণ প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতে যায় না, যাহা মনের পছন্দ মত বোধ হয়, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। বানর লম্ফ দিয়া যেমন কিয়ৎ-কাল নিরাশ্রয়ে অবস্থান করতঃ অন্য বৃক্ষে উপনীত হয়, উহাদের মতে জীবাত্মাও তেমন মৃত্যুর পরে মাতৃগর্ভে প্রবেশের পূর্ব্বে কোনও রূপ দেহ ধারণ না করিয়া অবস্থান করে; তাহার পর মাতৃগর্ভে আসিয়া নূতন দেহ ধারণ করিয়া থাকে। আমরা একল কথার বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতে পারি না। শাস্ত্রমতে বদ্ধজীব কোন অবস্থাতেই দেহ ভিন্ন একাকী অবস্থান করিতে পারে না। মৃত্যুর পরে মাতৃগর্ভে প্রবেশের পূর্ব্বেও জীব, পঞ্চভূতদ্বারা পরিবৃত

হইয়াই গমন করিতে বাধ্য হয়। এজন্য ভগবান্ বেদব্যাস, বেদান্তদর্শনের একটি সূত্রে বলিয়াছেন, "তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাম্।" ১ম সূত্র, ১ম পাদ, ৩য় অধ্যায়। বেদান্তদর্শন। ইহার ভাবার্থ এই যে, জীব মরণের পর অন্য দেহে জন্মগ্রহণের জন্য ভূতসমূহবেষ্টিত হইয়া গমন করিয়া থাকে। এই বিষয়টি বেদান্ত প্রশ্ন ও উত্তর বাক্যদ্বারা নিরূপিত হইতেছে।

বেদশাস্ত্রে দেহান্তর গমন-সম্বন্ধে জলৌকার দৃষ্টান্ত দেওয়াতে বানরের ন্যায় লাফাইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করার অনুমান করা উচিত হয় না। জলৌকা যেমন এক মুখদ্বারা কোন তৃণ আশ্রয় করিয়া, শেষে উভয় মুখ ঐ তৃণে স্থাপন করতঃ পূর্ব্বতন স্থান ত্যাগ করে এবং এইভাবে বহু তৃণ অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হয়; জীবও সেইরূপ মরণ সময়ে জ্যোতিঃ, ধূম বা বায়ু প্রধান আশ্রয় বিশেষকে ধরিয়া, পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং পরে সেই আশ্রয়কেও পশ্চাদ্বর্ত্তী করতঃ নূতন আশ্রয় গ্রহণ করে; এইভাবে কয়েক প্রকারের পরিবর্ত্তনের পরে অবশেষে মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে দেহপ্রাপ্ত হয়।

বেদোক্ত জলৌকার উদাহরণ দ্বারা দেহান্তর সঞ্চারের ভাব গ্রহণ করা লোকের পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বোধ বিধায়, অন্যপ্রকার দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যাইতেছে।

আমরা ভেকদিগকে অনেক প্রকার অবস্থা ভোগের পর, প্রকৃষ্ট ভেক দেহ ধারণ করিতে দেখিতে পাই। তাহারা মাতৃগর্ভ হইতে প্রথমে ডিম্বরূপে বহির্গত হয়, পরে ফুটিয়া পুচ্ছবিশিষ্ট বেঙাচিরূপ ধারণ করে, তাহার পর দুই খানি পা জন্মিলে, এক অভিনব আকার প্রাপ্ত হয়। শেষে যখন চারি খানি পা জন্মে ও লেজ খসিয়া যায়, তখন যথার্থ বেঙ্ হইয়া দাঁড়ায়। বেঙ্ সকল মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া ক্রমশঃ ডিম্ব, বেঙাচি ও পুচ্ছবিশিষ্ট দ্বিপদাবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রকৃত ভেকত্ব প্রাপ্ত হয়। এস্থানে ডিম্বাদি ত্রিবিধ অবস্থাকে

অলৌকার উদাহরণের তৃণ স্থানীয় বুঝিতে হইবে। এইরূপ জীবও মৃত শরীর ত্যাগ করতঃ কয়েক প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া মাতৃগর্ভে ভ্রূণ দেহ ধারণ করে। সেই সকল অস্থায়ী অবস্থাগুলিকে যথার্থ দেহ না বলিয়া "অতিবাহিক-দেহ" বলা গিয়া থাকে। তত্তদবস্থা জীবকে নূতন দেহ ধারণের জন্য অতিবাহন করে বলিয়া, সেই সকল অবস্থাকে আতিবাহিক নাম দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার কথিত "ধূমোরাত্রিস্তথা-কৃষ্ণঃষণ্মাসাদক্ষিণায়নম্।" স্বর্গগামীদিগের পক্ষে এই সকল আতিবাহিক অবস্থা বলিয়া বুঝা যায়। আর যাহারা মর্ত্ত্যলোকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা প্রথমে ধূম বা বাষ্পরূপ প্রাপ্ত হয়; পরে বৃষ্টি বা শিশির রূপ ধারণ করে। সেই জল ধান্য যবাদি ওষধি সকল চুষিয়া লওয়াতে তাহারা ওষধির মধ্যে প্রবেশ করে; ওষধি বা ধান্যাদি ফলরূপে তাহাদিগকে প্রসব করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা তাহা হইতে তণ্ডুলাদি নিষ্কাশন করিয়া অন্ন প্রস্তুত করে, তখন জীব সেই অন্ন মধ্যে অবস্থান করিতে থাকে। তথা হইতে অন্নরূপে পুরুষ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া শুক্ররূপে উৎপন্ন হয়।*

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পুরুষের শুক্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহাতে কীটাণুর আকারে জীবের সত্তা উপলব্ধি করা যায়। সেই শুক্র স্ত্রীগর্ভে সিঞ্চিত হইয়া আর্ত্তবশোণিতের সাহায্যে ভ্রূণরূপে পরিণত হয় ও যথাসময়ে সন্তানরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। এই ভাবে মনুষ্য পূর্ব্বদেহ ছাড়িয়া নূতন দেহ ধারণ করে। মরণের পরবর্ত্তী ধূম, জল, ওষধি, অন্ন ও বীর্য্যাবস্থাকে জীবের আতিবাহিক অবস্থা বলা গিয়া থাকে। জীব যখন ঐ সকল অবস্থা আশ্রয় করিয়া

* অন্ন বা আহার্য্য হইতে রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি। যথা—

রসাদ্রক্তং ততোমাংসং মাংসান্মেদং প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততোমজ্জা মজ্জাচ্ছুক্রস্য সম্ভবঃ। আয়ুর্ব্বেদ।

অবস্থান করে, তখন ওষধি ও ফলাদিতে কর্ত্তন পেষণাদি ক্রমে আঘাত করিলে, তদ্দারা জীবের কষ্টানুভব হয় না। যদি তাহা হইত, তবে ওষধি প্রভৃতিকে সেই জীবের আতিবাহিক দেহ না বলিয়া প্রকৃত দেহ বলিয়া গণ্য করা আবশ্যক ছিল।

৺সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকনাথ ব্রহ্মচারী নামক দেহ ধারণ করিতে যাইতেছিলেন, তখনও ধূম বা বাষ্প, ওষধি, ফল, অন্ন এবং বীর্য্যমধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সীতানাথ বা লোকনাথ দেহের মধ্যে যেমন সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন সুতরাং দেহের সুখে সুখ ও দেহের দুঃখে দুঃখানুভব করিতেন; ধূম, জল, ওষধি প্রভৃতিতে তেমন ভাবের সংযোগ না ঘটাতে উহাদের সুখ দুঃখ দ্বারা নিজে সুখী দুঃখী হন নাই; এমন কি ঐ সকল অবস্থা যে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাং সীতানাথ জীবমানে একাকী থাকিয়া যেমন মনের সুখে কাল কাটাইতে পারিতেন, (একথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) মরণের পরও বাহিরের ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধ না থাকা গতিকেই তেমন স্বাভাবিক মানসিক সুখে বিভোর ছিলেন। তাহাতেই তিনি আমার নিকট বলিয়াছেন, "আমি মৃত্যুর পরে সুখে ছিলাম কিন্তু কিরূপে যে সেই সুখ উপস্থিত হইত তাহা বলিতে পারি না।

সকল মনুষ্যই বহির্ব্বিষয়ে লিপ্ত হইয়া সুখভোগ করিতে ব্যস্ত। ৺সীতানাথ যেমন একাকী ঘরে বসিয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। তেমন কয়জন লোকে ভালবাসে? সুতরাং সীতানাথ শূন্য মনে সুখভোগ করিতেছিলেন, আমাদের মধ্যে যেমন প্রত্যাশা নাই, আমরা একটার পর অন্য কার্য্য ধরিতে ব্যাকুল, আমাদের মন সর্ব্বদা চঞ্চল। আমি জানি সীতানাথ পূর্ব্বতন কোন জন্মে যোগাভ্যাস করিয়া একাকী শূন্য মনে সুখে থাকিতে শিখিয়াছিলেন, তাহাতেই

সীতানাথ জন্মে একাকী থাকিতে ভালবাসিতেন এবং লোকনাথ জন্মে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারিবাবার কথা দ্বারা জানা যায় যে, যাঁহারা মরণান্তে প্রেতত্ব প্রাপ্ত না হইয়া একেবারে মানবযোনিতে গমন করেন, তাঁহারা আতিবাহিক অবস্থায় অনেকটা নিদ্রা বা তন্দ্রাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় মনের বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা জীবদ্দশায় বাহ্য বস্তুর সংযোগ ভিন্ন মনের সুখে থাকিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা আতিবাহিক শরীরে সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা ওষধি প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিলে পর সেই সকল ওষধিকে ছেদন করাতে তাঁহাদের কষ্টানুভব হয় কি না, এতৎসম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যগণ বিচার মীমাংসা করিয়াছেন।

"ত ইহ ব্রীহিযবাওষধি বনস্পতয়স্তিলমাষা ইতিজায়ন্তে"

এই বেদবাক্যে ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল মাষ হইয়া জন্মে। (জায়ন্তে) জন্ম শব্দ উল্লেখ থাকায়, তদবস্থায় কর্ত্তনপেষণ জন্য কষ্টানুভব হওয়ার আশঙ্কা দেখা যায়। এই স্থলে "জায়ন্তে" শব্দ বেদে থাকিলেও আচার্য্যগণ ওষধির মধ্যে প্রবেশ করে মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ ওষধির জীবাত্মাকে পৃথক বলিয়া বুঝাইতেছেন। "অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ।" বেদব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের ৩য় অধ্যায়স্থ ২৫ সূত্র।

এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—

"অন্যৈর্জীবৈঃকৃতমাধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদি-দেহে তেষাং সংশ্লেষমাত্রমেব স্যাৎ। নতু তে ভোগায় তত্র উৎপদ্যন্তে।" যে সকল ধান্যাদি ওষধি বৃষ্টির জলরূপে স্থিত আতিবাহিক ভাবাপন্ন জীবকে চুষিয়া লয়, সেই সকল ওষধি উহাদের আগমনের পূর্ব্বও জীববিশিষ্ট ছিল, সুতরাং তাহারাই ওষধি সম্বন্ধীয় কর্ত্তন-পেষণ প্রভৃতি জনিত দুঃখ ও সুখের ভোক্তা, আতিবাহিক ভাবাপন্ন জীবেরা তাহাতে

প্রবেশ করে মাত্র, কিন্তু উহাতে ভোগ সম্বন্ধ থাকেনা। শঙ্করাচার্য্যও এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন। অতএব আতিবাহিক অবস্থাকে জন্মগ্রহণ ধরিতে হয় না। তদবস্থায় জীব তন্দ্রাগত ব্যক্তির ন্যায় মানসিক ভাব লইয়াই অবস্থান করিয়া থাকে। তখন তাহার যে মৃত্যু হইয়াছে, এই কথার খেয়াল হয় না। আমরা যখন তন্দ্রা বা স্বপ্ন ভোগ করি, তখন যেমন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি স্মরণ হয় না, এখানেও তেমন বুঝিতে হইবে। ৺সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর এই ভাবেই মাতৃগর্ভে প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছিল। তিনি যে মাতার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন, ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন না, অথবা এই বিষয়ে কোন খেয়ালই করেন নাই। এতৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মচারিবাবা বলিয়াছেন, "মৃত্যুর পরবর্ত্তী আমার সেই সুখান্বিত অবস্থা ভোগ করিতে করিতে শেষভাগে কিছু চাপাচাপি ভাব অনুভূত হইয়াছিল, আমাকে যেন চারিদিক হইতে কিসে চাপিতেছে এমনটা বুঝা যাইত। যতই সময় যাইতে লাগিল, সেই চাপাচাপি ক্রমে ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। অবশেষে যখন সেই ভাবটি আমার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল, তখন আমার এই অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভের উপায় চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল। তখন এমন বুদ্ধি হইল যে আর এই সঙ্কীর্ণ স্থানে থাকিব না। আমি বাহির হওয়ার জন্য রাস্তা অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। স্মরণ আছে নিকটেই একটি পথ পাইয়া তদ্দ্বারা বেগে ধাবিত হইয়াছিলাম। তাহার পরের কথা কিছুই স্মরণ হয় না। ফলতঃ জন্মাবধি ৮।৯ বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থা আমার অদ্যাপি স্মরণ হইতেছে না।"

বলাবাহুল্য ব্রহ্মচারিবাবার সেই চাপাচাপি অবস্থাই গর্ভবাসজনিত কষ্টানুভব। মনুষ্য গর্ভবাস হইতে বহির্গত হইলেই বিষ্ণুমায়ার আয়ত্ত হইয়া পূর্ব্ব কথা সকল ভুলিয়া যায়। পরে ক্রমশঃ মাতাকে চিনিয়া উঠে; পরে ধীরে ধীরে চুষী প্রভৃতি খেলনায়

সম্পর্ক হইতে থাকে, এইরূপে ভাইভগিনীদিগের সহিত পরিচয় ঘটে এবং শিশু নূতন সংসারে প্রবেশ করিয়া থাকে।

জাতিস্মরতার উদাহরণ

বারদীর ব্রহ্মচারিবাবার সহিত আলাপ করিয়া "জাতিস্মর ব্যক্তির পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ থাকে" এই প্রাচীন লোকপ্রবাদের সত্যতা অনুভব করিলাম। আজকালকার লোকের পক্ষে পূর্ব্ব-জন্মের অস্তিত্ব মানাই মূর্খতা! তাহার উপর পূর্ব্বজন্মস্মৃতির কথা বলিলে উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া গণ্য হয়।

আমাদের জানা ছিল যে, জাতিস্মর ব্যক্তিরা বাল্যকাল হইতেই পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া থাকেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারী কিন্তু তেমন ছিলেন না। তিনি বাল্য বা তরুণ বয়সে স্বীয় পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে আমাদের ন্যায় অজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং তাহা স্মরণ করিতে পারিতেন না। পরে সাধন বলে জাতিস্মরতা লাভ করিয়াছিলেন। তবে বাল্যাবধি জাতিস্মর হওয়ার প্রসঙ্গ যে অলীক এমনও বলা যায় না। ব্রহ্মচারী এমন দুইজন পুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা ইহজন্মে কোন সাধনাদ্বারা জাতিস্মরতা লাভ করেন নাই, অথচ জন্মাবধি আপনা হইতেই তাঁহাদের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ হইত। তাঁহাদের মধ্যে একজন তিনজন্ম ও অন্যজন চারি-জন্ম পর্য্যন্ত স্মরণ করিতে পারিতেন। ব্রহ্মচারিবাবা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছেন যে তাঁহারাও প্রথমে ব্রহ্মচারীর ন্যায় সাধন বলেই জাতিস্মরতা লাভ করেন, পরজন্মে সেই দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া জাতিস্মরতাসহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ পাতঞ্জলি "সংস্কার সাক্ষাৎ করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্" বিভূতিপদের এই ১৮শ সূত্রে বলিয়াছেন যে সংস্কার নামক চিত্তধর্ম্মবিশেষের প্রতি ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সন্নিবেশরূপ

সংযম করিলে পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আবার কৈবল্যপাদের প্রথম সূত্রে তাদৃশ সিদ্ধি সকল জন্ম, ওষধি, তপস্যা বা সমাধিদ্বারা বিকাশিত হয় বলিয়া বিশেষ করিয়াছেন। অতএব এক জন্মে সমাধিদ্বারা জাতিস্মরতা প্রাপ্ত হইলে, পরজন্মে তাহা জন্মাবধি স্মৃত হয় বলিয়া তাহা জন্মোপলক্ষে সিদ্ধি বলিয়া কথিত হয়। ব্রহ্মচারিবাবার যদি আবার জন্ম হয় তবে হয় ত আগামী জন্মে তিনি জন্মসিদ্ধ-জাতিস্মর হইবেন। তখন আর এই বারের ন্যায় সমাধিদ্বারা জাতিস্মরতা অর্জ্জন করিতে হইবে না। সংস্কারের প্রতি সংযম করিয়া যে কেবল একজন্মই স্মরণ পড়িবে এমন কোন বাঁধা নিয়ম নাই। ভগবান্ বেদব্যাস পূর্ব্বকথিত পাতঞ্জল যোগ-সূত্রের (বিভূতিপাদ ১৮শ সূত্রের) ভাষ্যে ইহার একটি উদাহরণ দিয়াছেন। "অত্রেদমাখ্যানং শ্রূয়তে ভগবতোজৈগীষব্যস্য সংস্কার সাক্ষাৎ করণাদ্দশসু মহাসর্গেষু জন্মপরিণাম ক্রমমনুপশ্যতো বিবেকজং জ্ঞানং প্রাদুরভবৎ।" এতৎসম্বন্ধে এই আখ্যান শুনা যায় যে, ভগবান্ জৈগীষব্য সংস্কার সাক্ষাৎকরণদ্বারা দশকল্পের অবস্থা স্মরণ করিতে পারিয়াছেন এবং তাহাতে যে যে কর্ম্মদ্বারা যে ভাবে যেরূপ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে অনুধ্যান করিতে করিতে তাঁহার বিবেকজজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। একজন্মে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ হইলে যে তাহা ভাবী সমস্ত জন্মেই স্মরণ থাকিবে এমনও কোন নিশ্চয়তা নাই। নানাস্থান পর্য্যটন ও বিবিধ অনুসন্ধান পূর্ব্বক এই ব্রহ্মচারিবাবা ভিন্নও এমন বহুলোকের সঙ্গলাভ করিয়াছি যে, তাহাদের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত কিয়ৎ পরিমাণে স্মরণ রহিয়াছে। ইঁহাদের পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি ব্রহ্মচারিবাবার ন্যায় সাধনদ্বারা আগত হয় নাই, তবে কাহারও কাহারও ধ্যানাবলম্বনে অন্তর্ম্মুখ হওয়ার দরুণ ঐ স্মৃতি উদিত হইয়াছে। কাহারও বা আপনা হতেই স্মরণ হইয়াছে। যাঁহাদের বাল্যকালে এই স্মৃতি স্বতঃই উদিত

হয়, সাধন অভাবে তরুণ বয়সে সেই স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

(১) ত্রিবেণী সংলগ্ন বাগহাটী-গ্রাম-নিবাসিনী আমাদের কোন পূজনীয়া ব্রাহ্মণ কন্যার প্রমুখাৎ তদীয় কনিষ্ঠা ভগিনীর পূর্ব্বজন্ম স্মৃতির প্রসঙ্গ এইরূপ শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—

"আমার মাতার সহিত ঠাকুরমার বড় বনিবনাও ছিল না। আমার পিতার অর্জ্জুনের টাকাগুলি তাঁহার হস্তে না পড়িয়া আমার মার হস্তগত থাকায়, শাশুড়ী-পুত্রবধূতে বিশেষ মনোবাদ ঘটিয়াছিল। ঠাকুরমা সর্ব্বদা আমার মাকে বলিতেন, "এখন ত টাকাগুলি আমার হাতে দিলি না, আমি মরিয়া গিয়া তোর নিকট হইতে ঐ সকল টাকা গ্রহণ করিব।" ইহার পর ঠাকুরমার মৃত্যু হয়। ঠাকুরমার মরণের অল্পকাল পরে, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী জন্মগ্রহণ করে। সে ৪।৫ বৎসর বয়সের সময় আমাদের ঘরের দেওয়ালের একটা বিশেষ গর্ত্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'এখানে এ গর্ত্তটা কেন করা হইয়াছিল আমি বলিতে পারি।' বলিতে বলিতে বলিল, 'ঠাকুরমার শ্রাদ্ধে লুচী ভাজার সময়ে এই স্থানে গর্ত্ত করিয়া প্রদীপ রাখা হইয়াছিল।' আমরা বলিলাম, 'সে যে তোর জন্মিবার পূর্ব্বে করা হইয়াছে, তুই কেমন করিয়া সেই কথা বলিস?'

ছোট ভগিনী—'আমি দেখিয়াছিলাম।'

আমরা—'কোথা হইতে দেখিলি?'

ছোট ভগিনী—'এখানে থাকিয়াই দেখিয়াছি।' কিন্তু ঠিক কোথায় থাকিয়া দেখিয়াছে, তাহা বলিতে পারে নাই; আমরা সেই বালিকার মুখে তাহার জন্মিবার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্ব সময়ের কৃত সেই গর্ত্তের যথার্থ কারণ শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

"শৈশবে তাহার বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এক সময়ে বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল। ডাকাতেরা টাকা বাহির

করিয়া দেওয়ার জন্য বাবাকে আক্রমণ করিল; তখন আমার সেই বালিকা ভগিনী অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রদর্শন করিয়া পিতাকে ডাকাতের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। সেই বালিকা ডাকাতদিগকে বলিতে লাগিল, 'অমন করিয়া বাবাকে কষ্ট দিও না, বাবার টাকা আমি দেখাইয়া দেই।' এই বলিয়া বহু বস্ত্র খণ্ডে জড়িত একটী বাক্স দেখাইয়া দিল। তাহার ভিতরে চিত্র-কার্য্যের সরঞ্জাম প্রভৃতি থাকায় তাহা অতিশয় ভারযুক্ত বোধ হইল। ডাকাতেরা বালিকার কথায় প্রত্যয় করিয়া বাবাকে ছাড়িয়া দিল এবং টাকার বাক্স মনে করিয়া সেই বাক্সটী লইয়া প্রস্থান করিল।"

"আর একদিন আমার ছোট ভগিনী বলিতে লাগিল 'আমার ভাত খাওয়ার সেই কানভাঙ্গা পাতরখানা কোথায় গা?' তখন ঠাকুরমার সেই ভোজন পাত্র খানা যে তুলিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা আমাদের লক্ষ্য হইল। আমরা অন্যান্য জিনিষ পত্রের সহিত তাহা বাহির করিলে পর, সেই বালিকা তাহার পূর্ব্বজন্মের ভোজনপাত্র চিনিয়া লইতে পারিয়াছিল। এইরূপে ৭।৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ ছিল। শেষে ১২।১৪ বৎসরের কালে আমরা ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি তাহার কিছুই স্মরণ নাই।

ঠাকুর মা যে মরিয়া গিয়া মায়ের টাকা গ্রহণ করিবেন বলিয়া মাকে ধম্‌কাইতেন, তাহাও ছোট ভগিনীদ্বারা ফলিতে দেখা গিয়াছে। কালচক্রে মায়ের হাতের টাকাগুলি সমস্ত ছোট ভগিনীর হাতে আসিয়াছিল, আমরা কেহই তাহা পাই নাই।"

এই আখ্যানটি দ্বারা পূর্ব্বজন্ম স্মরণ হইলেও পুনরায় বিস্মৃত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মচারিবাবার সম্বন্ধে তেমন আশঙ্কা করা যায় না, তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ যোগ বিদ্যমান ছিল।

(২) এখানে আমার দুইজন উদাসীন বন্ধুর কথা বলিতেছি। ইহারা বর্ত্তমান জীবনে সম্মিলিত হইলে পর, কনিষ্ঠ ব্যক্তির হৃদয়ে ‘বরাবর’ নামক পাহাড়ের স্মৃতি সমুদিত হয় এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে বরাবর পাহাড় দেখার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। বয়োজ্যেষ্ঠের নাম সচ্চিদানন্দ অরণ্য। ইনিও বরাবর পাহাড় দেখিতে উৎ-কণ্ঠীত হইলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল ‘বরাবর’ পাহাড় গয়ার নিকট অবস্থিত; তখন উল্লিখিত দুইবন্ধু বাঁকিপুরে আসিয়া রেল যোগে গয়া অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। ট্রেন ‘বেলা’ নামক ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলে, গাড়ী হইতে অনেকগুলি পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইল। বেলা গয়া হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী। বন্ধুদ্বয় গাঁড়ীতে বসিয়াই অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে বরাবর পাহাড় চিনিতে পারিলেন। পরে অপর ব্যক্তিগণ উহাকেই ‘বরাবর’ পাহাড় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। বেলা ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে বন্ধুদ্বয় তথায় অবতরণ করিয়া অনুরাগভরে পদব্রজে বরাবর পাহাড়াভিমুখে চলিতে লাগিলেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া উহারা বারাবরে আরোহণ পূর্ব্বক ঐ পর্ব্বত দর্শনে এত প্রীত হইলেন যে, সেই ব্যাঘ্র ভল্লক সেবিত নির্জ্জন পাহাড় তাঁহারা সহজে ত্যাগ করিয়া আসিতে পারিলেন না। তখন বন্ধুদ্বয় প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে পর্ব্বতোপরি পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক সুরম্যগুহা অবলোকন করেন; উহা উৎকৃষ্ট বৃহৎ মর্ম্মর প্রস্তরে বিরচিত। গুহাতে পালিভাষায় লিখিত প্রস্তর ফলক সকল দৃষ্ট হইল এবং জানাগেল, যে পাটুলীপুত্র নগরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধনরপতি অশোক কর্ত্তৃক উহা সুসজ্জিত হইয়াছিল। তাঁহারা গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্মরণ করিতে পারিলেন, এই গুহাতেই দুইজনে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। গুহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও তাহাদের সুপরিচিত বলিয়া বোধ হইল। অতঃপর বন্ধুদ্বয় এজন্মেও উহাকে তপস্যার স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। অনুসন্ধানে বন্ধুদ্বয় শুনিলেন

যে, বরাবরের অন্যান্য গুহাতেও অপর ২।৪ জন তপস্বী অবস্থান করেন। অতঃপর ইহারা অত্রত্য অন্যান্য সাধু ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী বৃদ্ধদিগের মধ্যে আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহাদের অধ্যুষিত গুহাতে পূর্ব্বে দুইজন প্রাচীন মহাপুরুষ তপস্যা করিতেন; তথায়ই তাঁহাদের দেহপাত ঘটিয়াছে। আমার বন্ধুদ্বয় তখন স্থির করিতে পারিলেন যে সেই দুইজন মহাপুরুষই মরিয়া তাঁহাদের দুইজন হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বন্ধু সচ্চিদানন্দ বলিয়াছেন, "এক্ষণে সেই পাহাড়ে জলের অভাব ভোগ করিতে হওয়ায়, আমি স্মরণ করিতে লাগিলাম যে পূর্ব্বদেহে তপস্যা করার সময় আমরা কোথা হইতে জল সংগ্রহ করিতাম। অনেক চিন্তার পর একটী স্থানে জলের ক্ষুদ্র কূপ ছিল বলিয়া মনে হইল; তখন সেই স্থান খনন করিয়া ২।১ হাত নিম্নে এক জলময় গর্ত্ত বিশেষ পাওয়া গেল। তাহার জল দুগ্ধের মত শুভ্র।" সেই উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে শত হস্ত খনন করিলেও জললাভের সম্ভাবনা নাই। ঐ স্থানটি আমার বন্ধুবরের পূর্ব্বজন্মের পরিচিত না হইলে, এবার তাহা এভাবে ও এত সহজে আবিষ্কার করিতে পারিবেন কেন? বন্ধুদ্বয় আপনাদের তপস্যার কথা স্মরণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই জন্মের অন্যান্য কথা কিছুতেই তাহাদের স্মৃতিপথে সমুদিত হয় না। এই দুইবন্ধু এখনও জীবিত আছেন।

(৩) এখানে "২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ" হইতে "বসুমতীর" ১৩১৬ সনের ১২ই চৈত্রে ক্রোড়পত্রে জাতিস্মরতা সম্বন্ধে যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

"২৪ পরগণার ভাঙ্গর থানার অধীন কুড়ুলবেড়ে গ্রামে রামসাধন গাইনের বাস। উহার স্ত্রী মনোমোহিনী দাসী ১২ বৎসর হইল, কলেরারোগে মরিয়া যায়। মনোমোহিনীর পিত্রালয় বেগুরা, পিতার নাম দীপচাঁদ মণ্ডল। মনোমোহিনীর মৃত্যুরপর বলাগোড়

নিবাসী তাহার মেসো ও মাসীর একটি কন্যা জন্মে। ঐ কন্যাটি যখন একাদশ বর্ষীয়া তখন তাহার মাতার সহিত, গত পৌষমাসে বামন মল্লার মেলা দেখিতে যাইতেছিল; পথিমধ্যে কুড়ুলবেড়ে গ্রাম দেখিয়া প্রকাশ করিল যে ঐ পুকুর, তালবাগান ও ঐ বাটী তাহার পূর্ব্ব-জন্মের স্বামীর। এরূপ প্রকাশ করায় তাহার মাতা ও অন্যান্য সহযাত্রী সহ তাহারা ঐ বাটীতে প্রবেশ করে। ঐ কন্যাটি তাহার পূর্ব্বজন্মের শাশুরীকে প্রণাম করিয়া প্রকাশ করিল 'ইনি আমার শাশুড়ী, এবং এই ঘর ও ছেলেরা আমার ছিল।' সে রামধন গাইনকে বলে 'তুমি আমার স্বামী। তুমি আমাকে বিবাহ কর, তুমি আমাকে বিবাহ না করিলে আমি আত্মহত্যা করিব।' রামধন কহিল, 'তুমি যে আমার স্ত্রীছিলে তাহার প্রমাণ কি?' তখন মেয়েটি বলিল, 'আমার মৃত্যু সময়ে আমার আঁচলে ৬৲ টাকা বান্ধাছিল, তুমি তাহা খুলিয়া লইলে এবং মৃত্যুসময় আমার বড় ছেলেকে একবাক্স গহনা ও টাকা দিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ কর। দেওয়ালের মুড়লিতে মাথার চুলের দড়ি ও সিন্দুরের কৌটা রাখিয়া দিয়াছিলাম, সিন্দুকের ভিতর আমার মাথার দুইটা কাটা রাখিয়া দিয়াছিলাম, তাল্লাস করিয়া দেখ।' উক্ত গাইন সেই কাটা আরসুলার নাদির সহিত পাইয়াছে। তৎপর মেয়েটি বলিল, 'তোরঙ্গ খোল, আমার রেসমী কাপড় আছে কিনা দেখি, তোরঙ্গ খোলা হইলে রেসমী কাপড় দেখিয়া বলিল আমার কাপড় ১ জায়গায় ছেড়াছিল, দুই জায়গায় হইল কেন? তখন তদন্তে জানাগেল যে, তাহার বধূমাতা অপর স্থান ছিড়িয়াছে। তাহার পুত্রদিগকে ও অপরাপর আত্মীয়দিগকে চিনিল। ও তাহাদের কাহার কি নাম বলিল। একটি স্ত্রীলোক বলিল 'আমি তোমার কি ছিলাম বল দেখি?' তখন কন্যাটি বলিল, তুমি একদিন কিছু খেতে না পাইয়া আমার কাছে খাইতে চাহিয়াছিলে, আমি তোমাকে সন্ধ্যাকালে একপালি চাউল দেওয়ায় তুমি আমাকে

ধর্ম্ম-মা বলিয়াছিলে; এখন আমাকে চিনিবে কেন? রামধন বলে 'এখন আমার বয়স ৪৫ বৎসর, আর তোমার বয়স ১১ বৎসর; আমার কি এখন তোমাকে বিবাহ করা উচিৎ?' মেয়েটি বলে, 'তোমার অবর্ত্তমানে ছেলেরা আমার ভরণ-পোষণ করিবে। তোমার কোন চিন্তা নাই।' সে এখানকার পিত্রালয়ে যাইতে চাহেনা। এবং এজন্মের পিতামাতাকে মেসো-মাসী বলিয়া ডাকে। তাহারা তাহাকে জোর করিয়া রামসাধনের বাড়ী হইতে লইয়া যায়। রামসাধন এখন ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবাহ করিতে মত দিয়াছে। শীঘ্রই বিবাহ হইবে।"

কোরাণ শিক্ষা

আমি দেখিয়াছি, একদিন ব্রহ্মচারিবাবার বারদীর আশ্রমে একজন জগন্নাথ দেবের পাণ্ডা উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখে জগন্নাথের প্রসাদ অর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। পাণ্ডার বিশ্বাস যে, হিন্দুমাত্রই দেবদেবীর প্রসাদ ভক্ষণের জন্য লালায়িত। কেবল পাণ্ডার কেন, খাঁটি হিন্দুমাত্রেই তাদৃশ ধারণা বিদ্যমান দেখা যায়। ব্রহ্মচারী পাণ্ডাকে ধাবমান দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমি মুসলমান।" পাণ্ডা অমনি প্রত্যাবৃত্ত হইল। পরে পাণ্ডাকে দুই চারি আনা পয়সা দিয়া বিদায় করা গেল। তাঁহার মুখে "আমি মুসলমান" এই কথা শুনিয়া, সেখানকার সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল; সেজন্য বাবা তাদৃশ উক্তির এই ব্যাখ্যা করিলেন; "মুছল্লুম্ ইমান্ মুসলমান।" আমার ষোলআনা ইমান্ বিদ্যমান আছে, ইমান্ পাওয়ার জন্যই প্রসাদ ভক্ষণের প্রয়োজন হয়; সুতরাং আমার পক্ষে তাদৃশ প্রয়োজনাভাব। এইজন্য 'মুসলমান' বলিয়া প্রসাদ ভক্ষণের অনাবশ্যকতা দেখাইয়াছি।"

ব্রহ্মচারীকে আরবীভাষায় অভিজ্ঞ দেখিয়া, তাঁহার তাদৃশ

জ্ঞানলাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—"আমরা গুরুশিষ্য মিলিয়া কাবুলে গিয়া মোল্লাসাদীর বাড়ীতে অবস্থান করিয়া তাঁহার নিকট রীতিমত কালেমোল্লা (কোরাণ) পাঠ করিয়াছি।

ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া কোরাণ শিখিতে হইল কেন? এই প্রশ্ন করাতে বাবা বলিলেন,—"আমার গুরুদেব সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। মহম্মদীয় ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভের কোন বিশেষ উপায় বর্ণিত আছে কি না, এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য তিনি নিজেও আমাদের সঙ্গে কোরাণ অভ্যাস করিয়াছিলেন। ফলতঃ জ্ঞানবান্ মানুষ্যের পক্ষে সন্দেহগুলিকে সর্ব্বতোভাবে নিরসন করা কর্ত্তব্য।"

সিদ্ধি কাহাকে বলে?

আমি এ প্রশ্ন অনেকবার ব্রহ্মচারিবাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি; কিন্তু আমাদের বোধগম্য ভাষায় উত্তর পাই নাই। তিনি বলিয়াছেন—"যেমন তোমরা ওকালতীতে সিদ্ধ।"

সংস্কৃত সিদ্ধি কথাতে যোগ্যতালাভ বুঝা যায়। সেই সিদ্ধি প্রধানতঃ দুই প্রকার। প্রথম জ্ঞানযোগ্যতালাভ ও দ্বিতীয় বিশেষ বিশেষ ক্ষমতালাভ। জ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ হয়, এজন্য জ্ঞানসিদ্ধিই যথার্থ সিদ্ধি; ক্ষমতালাভকে বাজে সিদ্ধি বলা যায়। ভাগবদ্গীতাতে "সংসিদ্ধি নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি" "সিদ্ধিং প্রাপ্ত যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে" প্রভৃতি স্থলে জ্ঞানসিদ্ধিই কথিত হইয়াছে।

এই জ্ঞানসিদ্ধি বেদান্তশাস্ত্র বিচার দ্বারা অথবা কর্ম্মযোগ দ্বারাও লাভ করা যাইতে পারে।

ক্ষমতা লাভ বা ঐশ্বর্য্য সিদ্ধি মুক্তির অনুকূল নয় বলিয়া বিজ্ঞ লোকেরা তদর্থ যত্ন করেন না। উহার নাম বাজে সিদ্ধি। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতি পাদে এই সকল সিদ্ধির কথা বর্ণিত আছে।

পাতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন "জন্মৌষধি মন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ"। কেহ জন্মাবধি সিদ্ধ থাকেন। বঙ্গদেশের অর্দ্ধকালীদেবী জন্মসিদ্ধা ছিলেন। বেদব্যাস বলেন অসুরেরা ঔষধি সিদ্ধ; এখনকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি সেই ঔষধি সিদ্ধির উদাহরণ স্থল। শাক্ত প্রধান সর্ব্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দগিরি প্রভৃতি মন্ত্র-সিদ্ধ ছিলেন। এই পুস্তকের বিষয়ীভূত লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জাতিস্মরতা লাভকে তপস্যাজাত সিদ্ধি বলা যাইতে পারে। পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম পাদে সমাধি সিদ্ধির বাহ্য ফল, বাজে সিদ্ধি; জ্ঞান-সিদ্ধিই মুখ্য বলিয়া কথিত আছে। এই সমাধি কর্ম্ম যোগী ও জ্ঞান যোগী উভয়ের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। লোকনাথ ব্রহ্মচারী কর্ম্ম যোগী ছিলেন। তিনি এই সমাধির মুখ্য ফল জ্ঞান-সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

তিন সহস্র বৎসরের পূর্ব্বতন বুদ্ধাবতার হইতে এ পর্যন্ত নাগার্জ্জুন, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, শঙ্করাচার্য্য, বিদ্যারণ্য, মধুসূদন সরস্বতী, সর্ব্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দগিরি, অর্দ্ধকালী এবং যিশু, নানক, চৈতন্য, মনাই ফকীর, সুধারাম বাউল, শম্ভু কৈবর্ত্ত প্রভৃতি আমাদের নিকট সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত।

আমরা ব্রহ্মচারিবাবার জীবনী লিখিবার উপলক্ষে এই সকল সিদ্ধপুরুষদিগের অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। এই সকল আলোচনা করিলে সিদ্ধির ভাবটা কতক হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ব্রহ্মচারীর কথিত—"তোমরা যেমন ওকালতীতে সিদ্ধ" এই কথা দ্বারা এইমাত্র বুঝিয়াছিলাম যে ওকালতী করার পক্ষে বিলক্ষণ উপযুক্ত বহুলোক বিদ্যমান থাকিলেও যেমন যাহারা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারাই কেবল কোর্টে গিয়া ওকালতী করিতে পারে অন্যেরা পারেনা, তেমন বহুবিধ মনস্বী লোক বিদ্যমান থাকিলেও যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কোন উপায়ে ক্ষমতা লাভ করিয়া উঠিতে পারে, তাঁহারাই সিদ্ধ নামে খ্যাত হয়।

বারদীর ব্রহ্মচারিবাবা কর্ম্মযোগ দ্বারা জ্ঞানসিদ্ধি ও তপস্যাদি

দ্বারা জাতিস্মরতা প্রভৃতি বাজে সিদ্ধি উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিবিধ প্রাণীর ভাষাজ্ঞান প্রভৃতি বাজে সিদ্ধির যে সকল পরিচয় বারদীতে জানা গিয়াছে, তাহা পশ্চাৎ সন্নিবেশ করা যাইবে। অতঃপর জ্ঞানসিদ্ধির প্রসঙ্গ করা যাউক।

সিদ্ধিলাভের চেষ্টা

লোকনাথ ব্রহ্মচারী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সিদ্ধিটা যে কি বস্তু তাহা আমার নিকট খুলিয়া বলেন নাই। তাঁহার ভাবে বুঝা গিয়াছে যে দুগ্ধের আস্বাদ যেমন না খাওয়াইলে অন্যকে বুঝান যায় না, তেমন সিদ্ধ না হইলে সিদ্ধির ভাব বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। তাঁহার নিকট সমাগত অন্যান্য ব্যক্তিদিগের প্রশ্নমতে তিনি "সিদ্ধি" কথার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, "যে যাহা চায় সে তাহা পাইলেই তাহাকে 'সিদ্ধমনোরথ বলে। ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে ওকালীতে সিদ্ধ বলা যায়।"

ব্রহ্মচারিবাবা পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিতে পারিতেন, শরীর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারিতেন। ইহাও এক রকম সিদ্ধি বটে, কিন্তু ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত সিদ্ধি নহে। তিনি যে পরমার্থ বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এগুলি তাহার আনুষঙ্গিক বাজেসিদ্ধি বই নহে। পাতঞ্জলযোগসূত্রের বিভূতি পাদে এই সকল সিদ্ধি-লাভের ক্রম বর্ণিত আছে। এই সকল সিদ্ধির সহিত জ্ঞান প্রাপ্তির কোন সম্বন্ধ নাই। ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৫ ও ৪৯ শ্লোকে সংসিদ্ধি ও নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি বলিয়া দুই প্রকার সিদ্ধির উল্লেখ আছে।

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। ৪৫।"

তন্মধ্যে ব্রাহ্মণাদি জাতি চতুষ্টয়, আপন আপন জাতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সংসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। এই "সংসিদ্ধি"

শব্দে শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানযোগ্যতালাভ অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির উপযুক্ত হওয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি। ৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা। ৫০।"

আর কর্ম্মসংন্যাস করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়-ব্রহ্ম কিরূপ, তদ্বিষয়ক জ্ঞান পাওয়া যায়। ৫০ শ্লোকে ইহা জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা বলিয়া কথিত হইয়াছে।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী কর্ম্মসংন্যাস দ্বারা এই নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এই সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁহাকে হিমালয়ে গিয়ে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, "হিমালয়ে যাইবার পূর্ব্বে আমরা বর্দ্ধমানে অবস্থান করিতেছিলাম। সেখানকার কোন কালীদেবীর পূজহরি দেবতাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রচারিত ছিল। তিনি মলত্যাগ করিয়া জলশৌচাদি করিতেন না, জলশৌচাদি না করিয়াই ৺কালীদেবীর পূজা করিতেন। আমি তাহার মর্ম্মাবগত হওয়ার নিমিত্ত তাঁহার পিছনে লাগিলাম; তিনি কিছুতেই প্রকাশ করিতে চান না, আমিও নাছোড়বান্দা। একটা মনুষ্যকে উপাসনা করিয়া বশ করিতে আর কয় দিন লাগে? পরিশেষে তিনি আমার বাসনা পূর্ণ করিলেন। বলিলেন তাঁহার প্রতি কোন দেবতা তুষ্ট হইয়া প্রত্যহ ৷৹ আনা প্রদান করেন এবং প্রশ্ন করিলে উত্তর দিয়া থাকেন। তখন আমি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি হিমালয়ে থাকিব, সেখানকার দারুণ শীত আমার সহ্য হইবে কি না? আমার সমক্ষেই প্রশ্ন করা হইল। উত্তর পাওয়া গেল 'শীত সহ্য হইবে।' এই উত্তরটী আমিও শুনিতে পাইয়াছিলাম। তখন পূজহরিকে বলিলাম, "আমি স্বয়ং আর

একটী প্রশ্ন করিতেছি, দেখিব আমার কথার জবাব দেন কি না?' কোন উত্তর পাইলাম না। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর না পাওয়াতে সেই সিদ্ধ পুরুষহরিকে প্রশ্ন করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি প্রশ্ন করিবামাত্র উত্তর হইল, 'হা, হিমালয়ে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে।' তখন আমি আশ্বস্ত হইয়া প্রস্থান করিলাম।"

সিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ

বর্দ্ধমানে কালীসিদ্ধের সাহায্যে লোকনাথ যে সিদ্ধ হইবেন এই ভাবী ঘটনা জানিতে পারিলেন। তৎপরে গুরু ভগবান্, লোকনাথ ও বেণীমাধব তিন জনে হিমালয়ে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তদবস্থাতে যথাসময়ে লোকনাথ সিদ্ধি লাভ করিলেন।

ব্রহ্মচারিবাবা বলিয়াছেন যে তিনি কর্ম্মযোগ দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কি করিতে করিতে যে এই পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া উঠিলেন একথা আমি তাঁহাকে খুলিয়া বলিতে অনুরোধ করি নাই, তিনিও বলেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বাপর ভাবের সহিত শাস্ত্রবাক্য মিল করিয়া এখানকার ব্যাপারে আমাদের প্রবেশ করিতে হইবে। ব্রহ্মচারিবাবা যে কর্ম্মযোগ দ্বারা এই জ্ঞান-সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

কর্ম্মযোগের স্বরূপ এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল। গীতাতে কথিত আছে "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" কর্ম্মের মধ্যে বিশেষ কৌশলের নাম যোগ। সেই কৌশলটী কি? সকলেই কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু সেই কৌশলটী কেহই পাইতেছে না; যিনি তাদৃশ কৌশল সহকারে কর্ম্ম করিয়া কৃতকার্য্য হন, তাঁহাকে যোগী বলিতে হয়। অন্যেরা কর্ম্মী, কিন্তু যোগী নহে।

শাস্ত্রে সেই কৌশলটী এইভাবে বর্ণিত আছে; কর্ম্ম করিয়া যাও, ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না। যদি নেহাত ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত

কর্ম্ম করিয়া উঠিতে না পার, তবে অন্যের মত কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলটী বিষ্ণুতে অর্পণ কর। ইহা করিতেও না পারিলে অগত্যা ভগবানেরই জন্য সমস্ত কার্য্য করিতে থাক। ইহার একটীও কিন্তু হইয়া উঠেনা। "ডুব দিয়া জল খাইলে একাদশীর বাপেও জানেনা"। ডুবদিয়া জল খাওয়ার ন্যায় অনেকেই অভিসন্ধিটী গোপন রাখিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম বা ভগবানে অর্পণ ভাবে কর্ম্ম অথবা ভগবানের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। কাজেই তাহা কৌশলও নয়, যোগও নয়।

ব্রহ্মচারিবাবার অবস্থা অন্যরূপ ছিল। তিনি বাল্যেই পিতামাতা কর্ত্তৃক গুরু ভগবানের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে চিরকালের জন্য বাধ্য হইয়াছিলেন। ভগবান্ গাঙ্গুলী তাঁহার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। গুরু তাঁহাকে কলের পুতুলের ন্যায় যেমন চালাইতেন তেমনই চলিতেন। এই করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিতে করিতে সমাধি পর্য্যন্ত অভ্যস্ত হইয়াছিল। স্বমুখেই বলিয়াছেন মাস-ব্রত করার সময়ে সমাধিস্থ থাকিয়া স্বপ্নের ন্যায় পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছিল।

যোগ সাধনের উপায় স্বরূপ "কর্ম্মসু কৌশলং" নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানকে কর্ম্মের কৌশল বলা হইল। সেই কৌশল গুরুতে আত্মসমর্পণ দ্বারা ব্রহ্মচারীর পক্ষে সুলভ হইয়াছিল।

যোগশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট কৌশল অন্যরূপ। তাহাতে গুরুরা শিষ্যদিগকে যোগাঙ্গ অভ্যস্ত করাইয়া থাকেন। সেই যোগাঙ্গের মধ্যে সর্ব্বোচ্চাঙ্গের নাম সমাধি। গুরুর অনুগ্রহে ব্রহ্মচারী তাহাও করিতে পারিয়াছিলেন। এই সমাধি পর্য্যন্ত যোগাঙ্গানুষ্ঠান করিতে পারিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা হয়। একথা পাতঞ্জল যোগসূত্রের সাধন পাদের ২৮ সূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে। যথা—

"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাৎ অশুদ্ধি ক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।"

ভাবার্থ—যোগের অঙ্গগুলি অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে সাধকের

অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইতে পারে এবং সেই শুদ্ধান্তঃকরণে বিবেক খ্যাতি পর্য্যন্ত জ্ঞান প্রদীপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

যোগাঙ্গ কোন্‌গুলি? কোন মতে যোগের অঙ্গ ছয় প্রকার; কোন মতে আট প্রকার; কোন মতে ইহারও অধিক। আমরা এখানে অষ্ট প্রকার যোগাঙ্গের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছি। যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যম হইতে সাধন আরম্ভ করিয়া পরে নিয়ম আসনাদি ক্রমে সমাধিতে গিয়া যোগের অঙ্গ সাধন করিতে হয়।

এগুলিকে যোগ না বলিয়া যোগের অঙ্গ বলে কেন? এই সমস্ত প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া যদি ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়, যদি সাধক আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া জানিতে পারেন তবে ব্রহ্মের সহিত তাঁহার যোগ হইল বলা যায়। আর যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন এসকল ক্রিয়া করা বাজে কাজের মধ্যে গণ্য; ততদিন এগুলিকে যোগ বলিবার উপায় নাই। এতদ্দারা কাহারও কাহারও যোগ সাধিত হইয়া থাকে এজন্য ইহাদের নাম যোগাঙ্গ বলিতে হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "জ্ঞান প্রদীপ্ত হইবার সম্ভাবনা"। সম্ভাবনা বলি কেন? অন্যেরা বলেন কর্ম্ম জ্ঞানের প্রসূ হইতে পারেনা, কর্ম্ম অচেতন পদার্থ, আর জ্ঞান চেতন। সেই অচেতন কর্ম্ম চেতন জ্ঞানের কারণ হইবে কিরূপে?

মহামুনি ব্যাস এই সকল অনুষ্ঠান হইতে যে ভাবে জ্ঞান বিকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা এইরূপ বুঝাইয়াছেন। যথা—"তেষাং অনুষ্ঠানাৎপঞ্চপর্ব্বণোবিপর্য্যয়স্য অশুদ্ধিরূপস্য ক্ষয়োনাশঃ তৎক্ষয়ে সম্যগ জ্ঞানস্যাভিব্যক্তিঃ। যথা যথা সাধনান্যনুষ্ঠীয়তে তথা তথা তণুত্বমশুদ্ধেরাপদ্যতে। যথা যথা চ ক্ষীয়তে তথা তথা ক্ষয়ক্রমানুরোধিনী জ্ঞানস্যাপিদীপ্তির্বিবর্দ্ধতে। সা খলু এষা বিবৃদ্ধিঃ প্রকর্ষমনুভবতি আবিবেক খ্যাতেঃ আগুণ পুরুষবিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ সেই সমুদায় যোগের অঙ্গ অনুষ্ঠান করিলে, জ্ঞানের বিপরীত বা জ্ঞান বাধক অশুদ্ধতা ক্ষয় হইতে থাকে। সেই জ্ঞান রোধ বিপর্য্যয় বা অশুদ্ধি কথাতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটীকে বুঝিতে হয়। ঐগুলি নষ্ট হইলে সম্যক্ জ্ঞান বিকাশ পায়। যে পরিমাণে যোগাঙ্গ সকলের সাধন হয় সেই পরিমাণে ঐ সকল অশুদ্ধতা ক্ষয় পাইতে থাকে। আবার যতটা ক্ষয় পায় সেই ক্ষয়ের পরিমাণানুসারে জ্ঞানজ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জ্ঞানধর সূর্য্য, আর অবিদ্যাদি দোষধর মেঘ। মেঘ হইতে যতই ক্ষয় হইতে থাকে সূর্য্যও ততই প্রকাশ পাইবে। এখন দেখিতে হইবে সমস্ত অশুদ্ধি কাটা গেলে সম্যক্ জ্ঞান প্রকাশের সীমা কোথায়? ব্যাস বলিলেন, "আগুণ পুরুষ বিজ্ঞানাৎ।" অর্থাৎ সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ও গুণাতীত পুরুষ এই দুই রাশির পরস্পর পার্থক্যানুভব পর্য্যন্ত। আমরা তিন গুণের নাম ও পুরুষের নাম মাত্র জানি, কিন্তু তাহাদিগকে চিনিনা। যদি সেই ত্রিগুণকে ও পুরুষকে পৃথক করিয়া চিনিয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কারণ ত্রিগুণদ্বারা জগৎ রচিত হইয়াছে। জগৎ আমাদের সম্মুখে থাকাতে গুণাতীত পুরুষকে বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের জ্ঞান প্রদীপ্ত হইতে হইতে যদি তাহার দৌড় গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া নির্গুণ পুরুষ পর্য্যন্ত ধাবিত হয়, তাহা হইলে আমিই যে সেই পুরুষ তাহা বুঝা যাইতে পারে। এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানোদয় হইলেই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায়। যোগের অঙ্গ অনুষ্ঠান হইতে এতদূর পর্য্যন্ত অর্থাৎ জ্ঞানের চরম সীমা পর্য্যন্ত জ্ঞান বিকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এজন্য সিদ্ধান্ত হইয়াছে যোগাঙ্গ কিম্বা ফলাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে তদ্দ্বারা জ্ঞানের আবরণরূপ অশুদ্ধি দূর

হইতে পারে, সুতরাং জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ হওয়ায় সম্ভাবনা করা যায়।

ব্রহ্মচারিবাবা হিমালয়ে গিয়া গুরুদ্বারা চালিত হইয়া একরূপ ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন কর্ম্ম করিতেছিলেন। সেই কর্ম্ম আবার যোগ-শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সমাধি পর্য্যন্ত যোগাঙ্গ। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত-শাস্ত্রের কথিত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনও চলিতেছিল। আমি যে কারণে এতটা বলিতে পারিতেছি তাহাও এখানে প্রকাশ করিব। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের ব্যাখ্যা স্মৃতিশাস্ত্রে এরূপ পাওয়া যায়।

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেন মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন হেতবঃ॥

" গুরু মুখ হইতে বেদবাক্য দ্বারা আত্মাকে শুনিতে হইবে। আত্মার স্বরূপ শ্রবণ করিয়া তাহাই যে ঠিক এই বিষয়টীর জ্যামিতির ন্যায় উপপত্তি করিতে হইবে। এইভাবে মনন ব্যাপার সাধিত হইলে, সর্ব্বদা আত্মধ্যান করিতে হয়, তাহা হইলে আত্ম দর্শন ঘটিয়া থাকে।

ব্রহ্মচারিবাবা যে আমাকে দীক্ষা দিয়াছেন, তাহা আর কিছুই নহে, গুরু মুখ নির্গত বিশিষ্ট প্রকারের শ্রুতিবাক্য দ্বারা আত্মাকে শ্রবণ করা। আমাকে সেই দীক্ষা দিয়া বলিলেন, গুরুবাক্য পাইলে এখন বেদান্ত বাক্যের সহিত মিলাও। ইহাদ্বারা নিদিধ্যাসন পর্য্যন্ত করিতে পারিবে।" ঐ যে বেদন্তে বাক্যের সহিত মিলাইতে বলিলেন তাহাই উপপত্তি সহকারে মনন করার উপদেশ। তাহার পরে নিদিধ্যাসন।

আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তুমি যে আমাকে এই অদ্ভুত দীক্ষাতে দীক্ষিত করিলে ইহা পাইলে কোথায়?" তাহাতে উত্তর করিলেন, "গুরু আমার উপনয়ন করিয়াই এই দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং ইহার বলেই আমার দীর্ঘ জীবনলাভ ঘটিয়াছে।', ব্রহ্মচারী আমার দীক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গেই মনন করিতে আদেশ করিয়া

ছিলেন। এতদ্বারা বুঝাযায় তাঁহার গুরু ও তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াই অনতিবিলম্বে তাঁহাকে মনন কার্য্যে নিয়োগ করিয়া ছিলেন এবং খুব সম্ভব তদবধি হিমালয়ে বাস পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ব্রহ্মচারী নিদিধ্যাসনেও অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। বেদান্তের নিদিধ্যাসনটী য়োগশাস্ত্রের ধ্যান বা সমাধির অনুরূপ ব্যাপার। ব্রহ্মচারী যখন হিমালয়ে যাওয়ার পূর্ব্বেই সমাধি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তৎসহ যে নিদিধ্যাসন ও হইতে ছিল, ইহা সহজেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে ব্রহ্মচারিবাবা গুরুর সহায়তা সহকারে হিমালয়ে সমাধিস্থ থাকিয়া নিদিধ্যাসন নামক আত্মধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। সমাধি বলিতে স্থিরচিত্ততা বুঝিতে হয়। মনুষ্য বিষয়াভিমুখ হইয়া ও স্থিরচিত্ত হইতে পারে। ব্রহ্মচারী সমাধিস্থ হইয়া নিদিধ্যাসনে নিমগ্ন ছিলেন কথাতে আত্মাভিমুখ হইয়া স্থিরাচিত্ত ছিলেন বুঝিতে হইবে। তদবস্থাতে সহসা সাংখ্য যোগের ফল স্বরূপ দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাতে বিকাশ পাইল।

ইহাই তাঁহার উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ সিদ্ধি শব্দের বাচ্য

ব্রহ্মচারী সমাধিতে অনেকক্ষণ থাকিয়া এই সিদ্ধিভোগ করিলেন। সিদ্ধিলাভ করিয়াই তিনি গুরুদেবের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিয়াছিলেন। গুরু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "গুরু! আমি পার পাইয়াছি, তুমি এখনও সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছ? তুমি এত খাটিয়া আমাকে পার করিলে আমি মুক্ত হইলাম। তুমি কিন্তু যেমন তেমনটী রহিয়াছ। তোমাকে দেখিয়া আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। তোমার উদ্ধার যে কবে হইবে তাই ভাবিয়া আকুল হইতেছি।"

গুরু বলিলেন, "আমি চিরকাল জ্ঞানপথাবলম্বী। কর্ম্মদ্বারা যে এরূপ সিদ্ধিলাভ হইতে পারে এতকাল আমি এ কথা মানিতাম

না; সুতরাং সিদ্ধিলাভের এতাদৃশ যত্ন করিতে পারি নাই।" এক্ষণে তোমাকে কর্ম্ম-পথে চালাইয়া কর্ম্মযোগে এই পরম-সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিয়া আমি শিক্ষালাভ করিলাম।"

এখানে দেখা যাইতেছে ব্রহ্মচারিবাবা যেমন কর্ম্মযোগ করিয়াছিলেন, তেমন আবার বেদান্তবিহিত শ্রবণ মননাদি জ্ঞান পথেও চলিয়াছিলেন; তবে তাহাকে কেবল যোগী ও কর্ম্মযোগে সিদ্ধ বলা হয় কেন? জ্ঞানী ও সাংখ্যযোগ সিদ্ধ একথা একবার ও বলা যাইতেছে না কেন? এই বিষয় চিন্তা করিলে উত্তর স্বরূপ পাওয়া যায় যে লোকনাথ স্বভাবতঃ কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন। প্রকৃতির পরিচালনাতেই তাঁহাকে বাল্যে গুরুর হাতে সমর্পণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ফলে অন্যদের মত কামনাপূর্ব্বক এক এক কর্ম্মে প্রবেশ করার সুযোগ তিনি হারাইয়াছিলেন। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া দুইবার মাস-ব্রত উদযাপনে ও তৎসঙ্গে সমাধি অনুষ্ঠানে তিনি যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাঁহার গুরুভাই বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তেমন পারিয়া উঠিয়াছিলেন না। তজ্জন্য ব্রহ্মচারীকে স্বাভাবিক কর্ম্মযোগনিষ্ঠ বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মচারিবাবা যে শ্রবণ মননাদি ক্রমে বেদান্ত বিচার করিয়াছিলেন, তাহা তদীয় গুরুর নিয়োগ মতে করিতে হইয়াছিল বুঝা যায়। যে সকল মনুষ্য সাংখ্যনিষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, বিচার তাঁহাদের স্বাভাবিক। তাহারা কাহাকর্ত্তৃক নিযুক্ত না হইয়াও বিচারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং বিচার করিতে সমর্থ হয়। তাঁহারা ব্রহ্মচারীর ন্যায় কর্ম্মযোগ না করিয়াও তত্ত্বদর্শী গুরুর সাহায্যে, অথবা জন্মান্তরীয় বিদ্যার বলে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। তাহার পরে শ্রবণ মনন, নিদিধ্যাসনদ্বারা ব্রহ্মকে অপরোক্ষ করিতে সমর্থ হয়। ব্রহ্মচারিবাবার গুরু ভগবান্

গাঙ্গুলী এই শেষোক্ত শ্রেণীর সাংখ্যনিষ্ঠ ছিলেন। (পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের ব্যাখ্যা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য)।

লোকনাথ যে শ্রেণীর ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন তাহাদের পথাবলম্বীদিগকে বিদ্যাসহ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, এবং তাহার ফলে দেহান্তে দেবযান পথে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে গতি ঘটে। ইঁহাদের আর পুনরায় মর্ত্ত্যদেহধারণের সম্ভাবনা থাকে না। ব্রহ্মচারিবাবার গুরু ভগবান্ সাংখ্যনিষ্ঠ। সাংখ্যনিষ্ঠেরা কর্ম্মযোগানুষ্ঠান না করাতে মরণান্তে দেবযান (উত্তরমার্গাশ্রয়) সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা। কাজেই তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞদিগের পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণব্যাপার শাস্ত্রে শুনা গিয়া থাকে।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেই মুক্তি হয়; সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি দেহপাত হইলেই নির্ব্বাণ মুক্তি হইয়া থাকে এই কথা সকলেরই ধারণা। আমরা এখানে বলিতেছি, অনেক ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মরিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। একথাতে যে কেবল এখনকার মনুষেরা প্রত্যয় করিবেনা এমন নয়, শঙ্করাচার্য্যের সময়েও অনেকের এইরূপ ভাব ছিল। তাতেই বেদান্ত সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়স্থ তৃতীয় পাদের ৩২ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এতাদৃশ ভাবকে পূর্ব্ব পক্ষ করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। যথা ঃ—

"বিদুষো বর্ত্তমানদেহপাতানন্তরং দেহান্তরমুৎপদ্যতে ন বেতি চিন্ত্যতে। ননু বিদ্যায়াঃ সাধনভূতায়াঃ সম্পত্তৌ কৈবল্যনিবৃত্তিঃ ন বেতিনেয়ং চিন্তোপপদ্যতে। নহি পাকসাধন সম্পত্তৌ ওদনো ভবেৎ ন বেতি চিন্তা সম্ভবতি। নাপি ভুঞ্জানস্তৃপ্যেৎ ন বেতি চিন্ত্যতে। উপপন্নাত্বিয়ং চিন্তা ব্রহ্মবিদামপি কেষাঞ্চিৎ ইতিহাস পুরাণয়োর্দ্দেহান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ। তথাহ্যপান্তরতমা নাম বেদাচার্য্যঃ পুরাণর্ষির্বিষ্ণুনিয়োগাৎ কলিদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নঃ সম্বভূবেতি স্মরণম্। বশিষ্ঠশ্চ ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রঃ সন্নিমিশাপাৎ অপগত পূর্ব্বদেহঃ পুনর্ব্রহ্মাদেশাৎ মিত্রাবরুণাভ্যাং সম্বভূবেতি।

ভৃগ্বাদীনামপি ব্রহ্মণ এব মানাসানাং পুত্রাণাং বারুণে যজ্ঞে পুনরুৎপত্তিঃস্মর্য্যতে। সনৎ কুমারোহপি ব্রহ্মণ এব মানসঃ পুত্রঃ স্বয়ং রুদ্রায় বরপ্রদানাৎ স্কন্দত্বেন প্রাদুর্বভূব। এবমেধ দক্ষ নারদ প্রভৃতীনামপি ভূয়সী দেহান্তরোৎপত্তিকথা তেন তেন নিমিত্তেন ভবতি স্মৃতৌ। শ্রুমাবপিমন্ত্রার্থবাদয়োঃ প্রায়েনোপ-লক্ষ্যতে। তেচ কেচিৎ পতিতেপূর্ব্বদেহে দেহান্তরমাদদতে কেচিত্তু স্থিতএব তস্মিন্ যোগৈশ্বর্য্যবশৎ অনেকদেহাদান ন্যায়েন। সর্ব্বৈচৈতে সমধিগত সকল বেদার্থাঃ স্মর্য্যন্তে। তদেতেষাং দেহান্তরোৎপত্তি-দর্শনাদিত্যাদি।

অর্থাৎ ব্রহ্মদিৎদিগের বর্ত্তমান দেহপাত হইলে অন্য দেহধারণ করিতে হয় কিনা চিন্তা করা যাউক। আচ্ছা, ব্রহ্মবিদ্যার ফল কৈবল্য; সেই কৈবল্য হইবে কিনা, এ বিষয়ে ত কোন দ্বিধা নাই তবে এখন বিচার অবতারণের আবশ্যকতা কি? চাউল পাক করিলে ভাত হইবে কিনা; এমন চিন্তা ত আসে না! এবং আহার করিলে পেট ভরিবে কিনা ইহারও চিন্তা নাই। ইহার উত্তরস্বরূপ বলা যাইতেছে, ব্রহ্মজ্ঞদিগের দেহপাত হইলে পুনর্জ্জন্ম ঘটে কিনা? এমন সংশয়েরও কারণ রহিয়াছে। ইতিহাস পুরাণে অনেক ব্রহ্মবিদের দেহান্তর গ্রহণ ব্যাপার দেখা যায়; যথাঃ পুরাতন ঋষি অপান্তরতমা বিষ্ণুর নিয়োগানুসারে কলি ও দ্বাপরের সন্ধিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ নামক বেদব্যাস হইয়াছেন। ইহা স্মৃতিশাস্ত্র নির্দ্দেশ বিশেষ। ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠ নিমির শাপে পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করেন, পুনরায় ব্রহ্মার আদেশ মতে মিত্রাবরুণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মার অন্য মানসপুত্র ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বরুণের যজ্ঞে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও স্মৃতিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমারও স্বয়ং রুদ্রকে বর দিয়া স্কন্দ নামে মহাদেবের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপ দক্ষ ও নারদ প্রভৃতিও বিশেষ বিশেষ কারণ বশতঃ জন্মগ্রহণ

প্রসঙ্গ স্মৃতিতে জানা যায়। স্মৃতি কেন, শ্রুতির মন্ত্র এবং অর্থবাদের মধ্যেও প্রায়শঃ ঐরূপ ঘটনা লক্ষিত হয়। সেই সকল ব্রহ্মজ্ঞানীদের কেহ কেহ পূর্ব্বদেহপাত হইলে নূতনদেহ গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহবা পূর্ব্বদেহ বিদ্যমান থাকিতেই যোগৈশ্বর্য্যদ্বারা এককালে বহু দেহ ধারণ করার ন্যায় নূতন শরীর ধারণ করিয়াছেন। ইহারা যে সমস্ত বেদার্থ আয়ত্ত সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাও স্মৃতিতে পাওয়া যায়। এই সকল জ্ঞানীর নূতন দেহ ধারণ দেখিয়া আরব্ধ বিষয়ের বিচার আবশ্যক হইয়াছে।

এতদ্দ্বারা ব্রহ্মচারীর গুরুরও পুনর্জ্জন্ম সম্ভাবনা দেখা যায়। সাংখ্যনিষ্ঠদের এই ভাব। তদুপরি ব্রহ্মচারিবাবার যেমন সমাধি আয়ত্ত ছিল, গুরু ভগবানের তেমন সমাধি ছিল না মনে করিতে হয়। থাকিলে দুই শিষ্য লইয়া এত দীর্ঘকাল বিচরণ করিতে পারিতেন না। এই শ্রেণীর ব্রহ্মবিদেরা জ্ঞানলাভের পরেও সংসার করিয়া থাকেন; কিন্তু বিশেষত্ব এই যে পূর্ব্ববৎ সংসার না করিয়া উদাসীন ভাবে বিচরণ করেন; এজন্য সহজে তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদিগকে চেনা যায় না। জনক ব্রহ্মবিদ্ হইয়াও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরেও রাজর্ষি জনকের যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া জনক রাজার পণস্বরূপ সহস্র গোগ্রহণ পূর্ব্বক কুরুপঞ্চালবাসী ঋষিমুনিদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞেরা শুক, শক্তি প্রভৃতির জন্মদান করিয়া কত কার্য্য করিলেন। বশিষ্ঠ এখন সপ্তর্ষি পদে রহিয়াছেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যে আগামী মন্বন্তরে সপ্তর্ষির কার্য্য করিবেন ইহাও অবধারিত হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস প্রভৃতি

জগতের যে সকল মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার অনেক বিষয় অদ্যাপিও লোক সমাজে প্রচারিত রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে অজ্ঞেরা মনে করে লোকহিতকরা বশিষ্ঠ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণাদি ব্রহ্মজ্ঞদিগের অবশ্য-করণীয় ব্রত বিশেষ। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মজ্ঞেরা লোকহিত করা আপনাদের কর্ত্তব্য বলিয়া জানেনা তাঁহাদের স্বাভাবিক গতিতে লোকের অনেক মঙ্গল সাধিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু থাকিতে পারেনা, জগদুদ্ধার বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি যদি ব্রহ্মবিদ্‌-দিগের প্রতি আরোপিত হয়, তবে তাহা অজ্ঞদিগের কল্পিত কথা মনে করিতে হইবে। শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, "কর্ত্তব্য-মস্তিচেৎ তত্ত্ববিন্নসঃ।" যাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান রহিয়াছে সে তত্ত্ববিৎ নহে। এজন্য জগতের সহিত ব্যবহার দেখিয়া ব্রহ্মজ্ঞদিগকে চিনিবার উপায় নাই। অথচ তাঁহারা সাধরণের ন্যায় উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছেন।

এই শ্রেণীর অনেক ব্রহ্মবিদ্‌ মরণান্তে দেবযান পথে আরোহণ করেন না; বরং অন্যান্যদিগের ন্যায় পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী নিজে বিশিষ্টতা লাভ করতঃ গুরুকে অপর সাধারণের ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহার জন্য আক্ষেপ না করিয়া পারেন নাই। গুরু ভগবান্‌ও আপনার এই বহির্ম্মুখতা হ্রাস করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতেই শিষ্য লোকনাথের আক্ষেপ শুনিয়া বিশেষ করিয়া বলিলেন, "আমি এই দেহপাত করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করতঃ তোমার শিষ্য হইব, কিন্তু তখন তুমি আমাকে এইরূপ পথে চালাইও।" তখন লোকনাথ অতি কাতরস্বরে বিনীতভাবে কহিলেন, "গুরো এত কঠিন কর্ম্মের ভার আমাকে দিও না। তুমি আমাকে আজও এমন করিয়া প্রস্তুত কর নাই যে, তোমার মত অদ্বিতীয় পণ্ডিত ব্যক্তির মত পরিবর্ত্তন করিতে আমি সমর্থ হইতে পারিব। তুমি এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাবুদ্ধি সহ জন্মগ্রহণ করতঃ যখন আমার নিকট শিষ্য হইয়া উপনীত হইবে,

তখন আমি কিরূপে তোমার মত ফিরাইয়া তোমাকে কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত করাইব ?"

গুরু ভগবান্ বলিলেন, "এ বিষয়ে তোমাকে ভাবিতে হইবে না, আমি নিজেই ঐ ভার গ্রহণ করিব। কিন্তু সহজে নয় ; সেজন্য তোমায় তিনবার লাথি মারিতে হইবে, তাহার পর আমি মত পরিবর্ত্তন করিব।"

ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মবিদ্যা

লোকনাথের বাজে সিদ্ধির কথা পরে বলা যাইবে। ব্রহ্মচারী হিমালয়ে গিয়া যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই সিদ্ধিটা প্রকৃত প্রস্তাবে যে কি পদার্থ তাহা কিছু বুঝা গেলনা। অতঃপর সেই কথার আলোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া যাওক। এইস্থানে সেই সিদ্ধির ভাব যদি যথাযথ চিত্রিত করা যাইতে পারিত, তবে ব্রহ্মচারীর জীবনের অন্য যে সকল কথা জনা যায় নাই, সেই অসম্পূর্ণতা দ্বারা কিছুমাত্র হানি হইত না ; কারণ ইহাই তাঁহার জীবনের সারলাভ। তিনি চরম বস্তুরূপে যাহা লাভ করিয়াছেন তাহার স্বরূপ কি ? তদীয় ভাষা অবলম্বন করিয়া এতদ্বিষয়ের বিচার মীমাংসা করিতে হইবে। লোকনাথ সেই চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াই ভেউ ভেউ করিয়া কান্দিয়া ফেলিলেন এবং স্বীয় গুরুকে বলিলেন, "আমি পার পাইয়াছি, সংসার সমুদ্র হইতে অপর তীরে উত্তীর্ণ (মুক্ত) হইয়াছি।" ইহাদ্বারা কি বুঝা যায় ? নব্যবিজ্ঞান মুক্তি সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মেরই মুক্তির কথা নাই, থাকিতেও পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মে নির্ব্বাণ মুক্তির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকিলেও, তাহাকে মুক্তি না বলিয়া বিনাশ বলিতে হয়। বর্ত্তমানকালের হিন্দুমতের উপাসকগণ ত মুক্তির প্রসঙ্গও শুনিতে পারেন না। পাঞ্জাব অঞ্চলে মুক্তির প্রাদুর্ভাব বড় বেশী,

তাহা কেবল নামে; কাজে কিছুই নয়। "ঈশ্বর হইয়া যাওয়া" বলিলেও চলে না। শাস্ত্রীয় ভাষা অন্যরূপ, তাহাতে ঈশ্বরাবস্থার পরে মুক্তি।'

সাধারণ জীবগণ কর্ত্তব্যজ্ঞানদ্বারা বদ্ধ; ব্যাধি, জরা, মৃত্যু প্রভৃতির ভয়ে ভীত; যে অবস্থাতে তেমন কোন বন্ধন বা ভয় থাকে না, ঈশ্বরাদি কাহারও পরাধীনতা করিতে হইবে না, সমস্ত জগতের সম্রাট হইয়া সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন থাকা যায়, তাহাকে মুক্তির ছায়া বুঝিতে হয়। এক্ষণকার ঈশ্বরবাদীদিগের হৃদয়ে মুক্তির সেই ছায়াও স্থাপন করার উপায় নাই। তাহারা জানে স্রষ্টা ঈশ্বর এক পদার্থ, সৃষ্ট মনুষ্য অন্য পদার্থ, সেই যথার্থের ব্যত্যয় হইয়া মনুষ্য ঈশ্বর হইবে কিরূপে? ফলতঃ নব্যদিগের হৃদয় যে উপাদানে রচিত সেই হৃদয়ে এতাদৃশ সিদ্ধির বা জীবনমুক্তির ভাব অঙ্কিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

ব্রহ্মচারী স্বভাবতঃ আস্তিকতা সহকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া হৃদয়কে এমন ভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে, তদ্বারা সর্ব্বত্র ওতপ্রোত সর্ব্বশক্তি হইতে সেই সিদ্ধি অভিব্যক্ত হইয়া উঠিল। তদীয় গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলীও আস্তিক ছিলেন; তাঁহার যোগ্যতাও কোন অংশেই ন্যূন দেখা যায় না; তথাপি শিষ্যের মুখের কথা শুনিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারিলেন না। সে জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে সংকল্প করিলেন।

ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মবিদ্যা হইয়াছিল কিনা, এ কথার মীমাংসা করে কে? প্রসূতি না হইলে, যেমন প্রসব বেদনা বুঝিতে পারে না, ব্রহ্মবিদ্ না হইলে তেমন ব্রহ্মজ্ঞকে চিনিবার উপায় নাই। উপনিষদে নির্গুণ ও সগুণ উভয়বিধ ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাখ্যা রহিয়াছে; তন্মধ্যে উদ্দালক আরুণিকর্ত্তৃক পুত্র শ্বেতকেতু এবং যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক জনক, নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন অথর্ব্ববেদীয় মাণ্ডুক্য উপনিষৎ প্রভৃতিতেও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

গায়ত্রীবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা, দহরপুণ্ডরীকবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা, মধুবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, ষোড়শকলবিদ্যা, ভার্গবীবারুণীবিদ্যা প্রভৃতি সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া খ্যাত। শঙ্করাচার্য্য ও বিদ্যারণ্যের গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি, মধুসূদন সরস্বতীর ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি সন্দেহ আছে; সর্ব্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দগিরি, অর্দ্ধকালী এবং যীশু, নানক ও চৈতন্য প্রভৃতির ব্রহ্মবিদ্যালাভের সম্ভাবনাও করা যায় না। একে ত ইহাদের অনেকেই বেদ বিমুখ, তাহার পর প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ঈশ্বর বা দেবতা বিশেষের উপাসনা করিতেন। এই বিষয়ে বৈদিক শ্রুতি এই যে—"যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽ সাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ।" যে ব্যক্তি উপাস্যোপাসকের মধ্যে একত্ব দেখে না, ঐ আমার উপাস্য· এই আমি; এরূপ ভিন্নতা সংস্থাপন করিয়া উপাসনা করে, সে মূলতত্ত্ব জানে না। উক্ত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ উপাসক হইতে উপাস্যকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতেন; এজন্য তাঁহারা গুহ্যতত্ত্ব জানিতেন না বলা হইল।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে একটা· স্থির মীমাংসা করিতে হইবে। তাঁহার চরম সিদ্ধির ব্যাপার বুঝিতে হইলে, এতৎ সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরস্বরূপ তদীয় স্বমুখনির্গত বাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক তৎসহ বেদাদিশাস্ত্রের বাক্য সমন্বয় করা আবশ্যক।

আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "মোটের উপর কি আছে, অর্থাৎ এত সাধন সিদ্ধি করিয়া তুমি কি দেখিতেছ? ও কি চাও?" তদুত্তরে লোকনাথ বলিলেন—"আমি ও আমার দেহ এবং আমার কর্ম্ম আছে, আর কিছু নাই। এই কর্ম্মক্ষয় হইলেই আমি একক থাকিব,—তাহাই আমি চাই।"

আমি—'কর্ম্ম কি?' এই প্রশ্ন বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়ি নাই। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহার মুখে কর্ম্মের যে সকল ব্যাখ্যা পাইয়াছি তদ্দারা মোটের উপর ধরিয়া লইয়াছি যে,

সাংখ্যের প্রকৃতি, পুরাণোক্ত শক্তি, বেদান্তের মায়া তাঁহার কর্ম্ম শব্দের লক্ষ্য। * আমি প্রশ্ন করিয়াছি, "তোমার শরীরের সঙ্গে বাহ্যজগতের যতদূর সংশ্রব ঘটে, ততদূর পর্য্যন্ত জগৎকে তোমার কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, যাহা তোমার অগোচর বা বহু দূরবর্ত্তী অর্থাৎ জগতের যে ভাগের সহিত তোমার সংশ্রব আদবে ঘটে না, তাহাকে তোমার কর্ম্ম বুঝিব কিরূপে?" ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "আমরা যোগী, নিজ প্রত্যক্ষ ভিন্ন, অন্য কিছু মানি না। যাহা আমার গোচর নহে তাহা আছে বলিয়া, তোমাদের মত ধারণা আমার নাই।" ইহাতে বিচার করিয়া বুঝিলাম তিনি যে সর্ব্বদা নির্নিমেষ নয়নে শূন্য অন্তঃকরণে থাকেন, তখনকার জন্য আপনাকে কর্ম্মহীন দেখেন, আবার যখন বাহ্য ব্যাপার সংযোগে সেই দিকে নীত হন, তখন আপনার কর্ম্ম উপস্থিত দেখিতে পান। আমরা যেমন অমুক ঘটনা দ্বারা অমুক ফল পাইব, ইত্যাকার চিন্তায় বদ্ধ হইয়া ক্ষণে এদিকে ক্ষণে ওদিকে আকৃষ্ট হই, ব্রহ্মচারীর লক্ষ্য

---

* এক সময়ে বারদী গ্রামের ৮।১০ মাইল দূরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে একটী লোক আসিয়া ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিল, এবং ব্রহ্মচারীর প্রশ্ন মতে বলিল, 'আপনার কথা শুনিয়া আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি, আর কোন প্রয়োজনে আসি, নাই!" আমি কিছু অন্তরালে থাকিয়া আগন্তুকের কথা শুনিয়া ভাবিলাম, বিষয়ীদিগের মধ্যে এমন লোক কি আছে যে অন্য প্রয়োজন ছাড়া কেবল সাধুদর্শনের জন্য ৮।১০ মাইল পথ চলিবার কষ্ট স্বীকার করে? এজন্য একটু মনোযোগ সহকারে তাহার আলাপ শুনিতে লাগিলাম। ব্রহ্মচারী তাহাকে বসিতে বলিলেন, এবং টের পাইলেন এ ব্যক্তি বারদীতে তাহার জামাতাগৃহে যাত্রা করিয়া, পথে আশ্রম দর্শন করিতে আসিয়া ঐরূপ কথা বলিতেছে। তখন সমাগত অন্যান্য লোকদিগকে উপদেশস্বরূপ বলিতে লাগিলেন—"কর্ম্মই চালক, কর্ম্ম সকলকে ঘুরাইয়া ফিরিতেছে, সেই কর্ম্মের আকর্ষণ কে অতিক্রম করিবে?" একদিকে আগন্তুকের কন্যা দর্শনের স্পৃহা বলবতী হইলে, জামাতৃগৃহে যাইতে উতলা হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিতে চাহিল। ব্রহ্মচারী মিষ্টবাক্যে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া ঐ সকল কথা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আগন্তুক যতই যাইতে চায়, ব্রহ্মচারী ততই তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া বলেন, "তোমরা কর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পাও না, জীব কেমন ছটফট করিয়া তাহার অনুসরণ করে?" আগন্তুক ব্রহ্মচারীর নির্ব্বন্ধ দর্শনে আপনার প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া বিদায় চাহিতে লাগিল। আমি তখন উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে আগন্তুকের ব্যবহার দ্বারা, কর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধীয় কথা বুঝাইয়া দিলাম।

সেইরূপ ফলের দিকে ছিল না, কেবল ব্যাপারে প্রবৃত্তি দ্বারা আপনার কর্ম্ম অনুভব করিতেন। "নিদেশং ভৃত্যকো যথা।" চাকর যেমন নিজের হিতাহিত না ভাবিয়া, আজ্ঞামাত্র প্রভুর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ব্রহ্মচারী তেমন ফলাকাঙ্ক্ষা বিহীন হইয়া, উপস্থিত ব্যাপারে রত হইতেন। জানিতেন, "এইরূপ করিতে করিতে যখন আমার জন্য কোন ব্যাপারই উপস্থিত হইবে না, আমাকে কোন বিষয়েই প্রবৃত্ত হইতে হইবে না, তখন কর্ম্মক্ষয় হইয়াছে বুঝা যাইবে। তাহার পর হইতে আমি একক থাকিব। তাহা হইলেই আমি মুক্ত থাকিব; তাহাই 'একমেবদ্বিতীয়ম্।" এখন দেখিতে হইবে, ব্রহ্মচারী যে, নিজের সংশ্রবে যাহা আসিত তাহাকে কর্ম্ম বলিয়া মানিতেন, তাহার বাহিরে কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, আমাদের ন্যায় বাহ্যপদার্থের সত্তা স্বীকার করিলে বন্ধন ঘটে বুঝিতেন; এই মতটি কি নেহাত মূর্খের কল্পিত, না ইহার বুনিয়াদে কোন সূক্ষ্মদর্শন নিহিত রহিয়াছে; এই কথার বিচারে পাওয়া যায় আমার চক্ষু আছে বলিয়া, চক্ষুর সাহায্যে জগতের রূপ দেখিতেছি; ত্বক্ আছে বলিয়া হস্তার্পণ করিয়া ত্বকের সাহায্যে জগৎকে স্পর্শ করিতে পারি, এইরূপ মন, কর্ণ, প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগতের যে কিছু অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকি; যদি জীবগণের মধ্যে কাহারও উক্ত একাদশের কোন ইন্দ্রিয়ই না থাকিত, তবে জগতের বর্ত্তমান সত্তা স্বীকার করার আবশ্যকতা থাকিত না; আমরা কিন্তু এই বিষয়টির বিচার না করিয়া, দশজনের দেখাদেখি, জগতের একটী বিশেষ অস্তিত্ব ধরিয়া লই, ভাবি—পটে যেমন ছবি অঙ্কিত থাকে, তেমন কোন আধার বিশেষের মধ্যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ প্রতিভাত হইতেছে। এরূপ আধার থাকার কোন প্রমাণ নাই; কাজেই বৈজ্ঞানিকগণ, জীবের ইন্দ্রিয় পথে প্রাপ্ত অনুভূতির উপর জগতের সত্তা নির্ভর করিতেছে বলেন। অতএব যতদূর পর্য্যন্ত অনুভূতি প্রসারিত

থাকে, ততদূরই জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন, তাহার বাহিরে কিছু মানিতে নারাজ। ব্রহ্মচারীর অন্তর্নিহিত এতাদৃশ বিজ্ঞান অনুসারে, তাঁহার অনুভূতির এলাকাস্থিত বিষয়গুলিকে কর্ম্ম (জগৎ) বলিয়াছেন; যাহা তাহার অনুভূতির মধ্যে আসে নাই, তাহার অস্তিত্ব মানিতে পারেন নাই।

তাঁহার কথিত পূর্ব্বোক্ত "আমি, দেহ ও কর্ম্ম" এই তিন বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম 'কর্ম্ম ত বুঝিলাম, এখন তুমি কে, কি পদার্থ, তাহা বুঝাইয়া বল। উত্তর—"আমাকে আমি জানিতে পারি না, অতএব বলিতেও পারি না।" এ কথার ভিতরে গূঢ় বিজ্ঞান নিহিত রহিয়াছে। 'আমি কে' এ কথার চিন্তা করিলে বুঝা যায়— কতকগুলি অনুভূতির সমষ্টিই আমার আমিত্ব, আমি জন্মিয়া যতগুলি অনুভূতি করিয়াছি, এবং পরে করিব ইহাকে আমার আমিত্ব বলিয়া ধরা যায়। আরও সূক্ষ্ম বিচার করিলে এই আমিত্বকে তিন ভাগ করা যায়, যথা—অনুভূত বিষয়গুলি (কর্ম্ম), অনুভব ব্যাপারটী (ক্রিয়া), অনুভবের সম্পাদক (কর্ত্তা); এতন্মধ্যে যে অনুভব করিলে, অর্থাৎ যাহার সত্তা দ্বারা অনুভব ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল, সেই চেতন বস্তুই যথার্থ আমি অর্থাৎ বিজ্ঞাতা। সেই আমি বা চেতনবস্তু অথবা বিজ্ঞাতা ভিন্ন যাহা অনুভব করা যায়, তৎসমুদায় নিশ্চয়ই চেতন নহে অর্থাৎ অচেতন বা জড়। আর একথাও প্রমাণিত হয় যে, সকল দেহে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞাতা নাই—একই বিজ্ঞাতা (আমি বা চেতন বস্তু), দেহগত ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই জগৎকে অনুভব করিতেছে। এখন সেই বিজ্ঞাতা বা চৈতন, আর জগৎ এই দুইটী রাশি হইল। বিজ্ঞাতাই জগৎকে জানিতে পারে, জগতের কিন্তু বিজ্ঞাতাকে জানিবার সামর্থ্য নাই। এজন্য সংসারে জগৎকে জানা যায়, বিজ্ঞাতাকে (চেতনকে) জানার উপায় নাই! তাহাতেই বেদে কথিত হয় "বিজ্ঞাতারমরেকেন-বিজানীয়াৎ ?" বিজ্ঞাতারে কি দিয়া জানিবে ? ব্রহ্মচারী

আপনাকে সেই একমাত্র বিজ্ঞাতা বলিয়া টের পাইয়াছিলেন, তাহাতেই বলিলেন "আমাকে আমি জানিতে পারি না। এই কথাটী হৃদয়ঙ্গম করা বড় শক্ত। সাধারণ মনুষ্যগণও "আমি কে" একথা জানে না, তবে ব্রহ্মচারীর সহিত অন্যদের বিশেষ এই যে ব্রহ্মচারী যেমন আপনাকে কর্ম্ম বা জগৎ হইতে পৃথক করিয়া আত্মার অজ্ঞেয়তা বুঝিতেন, অন্যেরা আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক্ করে না বলিয়া আত্মার ভাব বুঝে না। আমি অন্য একটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম, 'ভাল, তুমি (আমি, দেহ ও কর্ম্ম) তিনটা রাশি না করিয়া দুইটা করিতে পার কি? দেহকে আমি বা কর্ম্ম ইহার একটার মধ্যে রাখিতে পারি কি? দেহকে জানা যায়, অতএব সে আমি হইবে না, দেহকে কর্ম্ম সংজ্ঞার অন্তর্গত কর না কেন?" ব্রহ্মচারী দেখিলেন সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্ত্তমান লোকনাথ ব্রহ্মচারী এই দুইটী ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করা, তাঁহার স্মরণই আছে; অন্যান্য কর্ম্মের ন্যায় দেহ ও তাঁহার ব্যবহারের জন্য জন্মে জন্মে সংঘটিত হয়; অতএব উহা কর্ম্ম মধ্যে না ধরিবেন কেন? এজন্য প্রকাশ্যে বলিলেন—"হাঁ, দেহকে কর্ম্মের সামিল করিতে পার।" অতঃপর ব্রহ্মচারী, 'আমি' ও 'কর্ম্ম' এই দুইটি মাত্র দেখিতে লাগিলেন।

সাধারণ লোকে শরীরকে আমি (আমি) মনে করে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনকে আত্মা বলে, বৌদ্ধেরা বুদ্ধিকে আত্মা স্থির করিয়া থাকে। বেদবেদান্ত দ্বারা সেই বিজ্ঞতার সত্তা নির্ণয় করিতে হয়, এজন্য বিজ্ঞাতা বেদান্তের জ্ঞেয়; সেই জ্ঞেয় (Unknown) তত্ত্বটীই তোমার আমার ও জগতের আত্মা; দেহ মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই নির্জ্জীব জড়পদার্থ। সেই জ্ঞেয়তত্ত্বের মধ্যে, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ, স্তরে স্তরে ভাসমান থাকাতে, সে জ্ঞেয় তত্ত্বের (আত্মার বা ব্রহ্মের) চৈতন্য জ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া বুদ্ধি, চৈতন্যময়ী

সজীবা বা আত্মবতী হইয়াছে; আবার সেই বুদ্ধির আভাস দ্বারা মনঃ, মনের চেতন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়ের জ্যোতিঃ দ্বারা দেহ, সজীব আত্মবান্ দেখা যায়। যাঁহারা সেই জ্ঞেয়তত্ত্ব (আত্মতত্ত্ব) ধরিতে পারেন, তাঁহারা জ্ঞেয়তত্ত্বকে (আপনাকে) বুদ্ধি, মনঃ ইন্দ্রিয় ও দেহ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু হইতে পৃথক (আলগ্) দেখেন। এইজন্যই ব্রহ্মচারী বলিতেন, "আমি যখন শরীর হইতে আলগ্ থাকি, তখন সাধারণের অগোচর বিষয় সকল জানিতে পাই।" *

বেদান্তে সেই জ্ঞেয় (Unknown) তত্ত্বটী জগতের অজ্ঞেয় বলিয়া সাধারণের ভাষার অজ্ঞেয় (Unkown) শব্দে বলা হইল; তাহা নানা সময়ে নানা শব্দ দ্বারা উক্ত হয়। এই পুস্তকেও তেমন সেই তত্ত্বটী লক্ষ্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে; এখানে সেই একার্থবাচক শব্দগুলি বলা যাইতেছে যথা—জ্ঞেয়তত্ত্ব, চরম বস্তু, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, বিজ্ঞাতা, আত্মা, পরমাত্মা, পুরুষ, পরমপুরুষ জ্যোতিরজ্যোতিঃ ইত্যাদি।

অতঃপর ব্রহ্মচারীর কথিত "আলগ্ থাকার" ভাবটা বুঝিতে যত্ন করা যাউক। শাস্ত্রদ্বারা মিমাংসিত হয় যে, আত্মা বা পুরুষ প্রকৃতি হইতে আলগ্ থাকিতেন কিরূপে? এখানে আলগ্ থাকা।" কথার ভাব এই যে, ব্রহ্মচারী আপনাকে বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে পৃথক দেখিতেন, তাহাই 'আলগ্ থাকা'; তেমন আলগ্ থাকিয়াই সকল সমাচার জ্ঞাত হইতেন। এই সম্বন্ধে পাতঞ্জলদর্শনে

* "এই বিষয়টী বারদীতে যে সকল বাজে সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে" এই শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। ঐ রূপ সিদ্ধি না থাকিলেও, অনেক সময়ে পরের মনের কথা বলা যাইতে পারে। কেহ (Thought Reader) কেমন করিয়া দুই চারিটা কথা বলিতে পারিলেই তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছে মনে করা উচিত নয়।

একটী সূত্র রহিয়াছে "সত্ত্বপুরুষাণ্যতা খ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ।" অর্থাৎ অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) ও আত্ম-পুরুষের মধ্যে পরস্পর ভিন্নতা দৃষ্ট হইলে, সর্ব্বভাবের অধিষ্ঠাতা ও সকলের জ্ঞাতা হওয়া যায়। আমরা সাধারণ মনুষ্যগণ, শরীরের সহিত আত্মার পার্থক্যই বুঝিতে অপারগ। লোকনাথ কিন্তু আপনাকে ও অন্তঃকরণকে জল দুগ্ধবৎ একত্র মিশ্রিত দেখিয়াও এই মিশ্র পদার্থ মধ্যে, আমি দুগ্ধ স্বরূপ সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু বলিয়া অনুভব করিতে পারিতেন। তাহাতেই সেইক্ষণের জন্য তিনি সর্ব্বভাবের অধিষ্ঠাতা ও সকলের জ্ঞাতা হইতে পারিতেন। আমরা দেখিয়াছি তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য যত্ন করিয়া সেই অবস্থা আনয়ন করিতেন। আমরা তাহা না বুঝিয়া বারংবার তাঁহার সহিত কথা বলিয়া তাঁহাকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছি; তখন তিনি বলিয়াছেন, "এমন করিয়া যদি তোমরা আমাকে নীচেরদিকে টানিয়া রাখ তবে ত আমি তোমাদের মতই থাকিয়া যাই।"

বলা হইয়াছে তিনি সর্ব্বভাবের অধিষ্ঠাতা ও জ্ঞাতা হইতেন; তাঁহার সর্ব্বটা কিন্তু আমাদের সর্ব্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র ছিল। লোকনাথ আপনার সংশ্লিষ্ট বিষয় ভিন্ন, বাহিরের বস্তুর সত্তা মানিতেন না। সুতরাং তাঁহার সংশ্রবের বিষয়গুলিই তাঁহার সর্ব্ব ছিল। এবং তিনি তাহার অধিষ্ঠাতা ও জ্ঞাতা হইতেন। আমাদের সর্ব্ব অন্যরূপ; আমাদের দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত যাহা কিছু, তাহাই সর্ব্ব। তিনি অধিষ্ঠাতা হইয়া রোগ দূর করণাদি দ্বারা আশ্রিতদিগকে রক্ষা করিতেন। আমরা দেখিয়াছি তিনি বারদী অঞ্চলের প্রতি যেমন আপন ভাব প্রকাশ করিতেন, অন্য স্থানের প্রতি তেমন কিছুই করিতেন না। আমি উদারহৃদয় সাধুর এইরূপ একদেশ-দর্শিতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতাম, পরে তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম তিনি অপরাপর স্থান সমূহের অস্তিত্বই মানেন না। তবে আপনভাব

দেখাইবেন কিরূপে? এ সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীর নিত্যসেবক মহাত্মা ৺জানকীনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রমুখাৎ যে বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, এস্থলে তাহা বলা যাইতেছে। লোকনাথ একদা আশ্রমের একপার্শ্বে ঘরের বাহিরে উপবিষ্ট আছেন, এমনকালে দেখিলেন একটী রক্তবস্ত্র-পরিহিতা স্ত্রীলোক তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। মেয়েটী শীতলমুখা অর্থাৎ মুখে বসন্ত রোগের দাগ সকল অঙ্কিত আছে। স্ত্রীলোকটীকে শীতলাদেবী বলিয়া বুঝিলেন। দেবী বলিলেন, "আমি এখান দিয়া যাইব।" লোকনাথ—"না, এখান দিয়া যাইতে পারিবে না।" কিছুকাল উভয়েই নিস্তব্ধ, পরক্ষণে দেবী লোকনাথের সম্মুখদিকে এক পা বাড়াইলেন। লোকনাথ গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আমি যে এখানে আছি, আমি কি কিছুই নই?" দেবী তৎক্ষণাৎ পা উঠাইয়া পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আমি কি যাওয়ার পথ পাইব না? এখানে কি আবদ্ধ থাকিব? লোকনাথ—"না, বদ্ধ থাকিতে হইবে না; এই যে নিকটবর্ত্তী ছাওয়াল বাঘিনী নদী (খাল) ইহার পার্শ্বস্থ ঢালু ভূমি দিয়া চলিয়া যাও, উচ্চতর সমভূমিতে উঠিও না।" এই ঘটনার কয়েকদিন পরে আশ্রমের অনতিদূরবর্ত্তী এক ভুঁইমালীর (হাড়ীর) বাড়ীতে বসন্ত হইয়া বহুলোক বিনষ্ট হয়, তখন গৃহস্বামী লোকনাথের নিকট নালিশবন্দি হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন তাহার বাড়ীটী ঐ নদীর তীরে হেলানিয়া ভূমির উপর স্থাপিত সুতরাং আদেশ করিলেন, "বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা কর।" সে তাহাই করিল।

লোকনাথ, এক সময়ে কোন লোকের সহিত, একটা বাড়ী নদীর পার্শ্বস্থ নিম্নভূমিতে কি তীরের উচ্চ সমতল স্থানে অবস্থিত, এই কথার আলোচনা করিতেছিলেন, তৎকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। তাহা বর্ণিত কি অন্য বিষয় উপলক্ষে হইয়াছিল আমি সেই বিষয় লক্ষ্য করি নাই। লোকনাথ যদি দেশের অন্যান্য

স্থানকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন তবে বারদী অঞ্চলের জন্য শীতলা দেবীর সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেন না।

লোকনাথ যে অন্তঃকরণ হইতে আত্ম-সত্তাকে পৃথক দেখিতেন, ইহাকে সামান্য ব্যাপার মনে করা উচিত নহে। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বেদাদিশাস্ত্রে যে আত্ম-দর্শন বা ব্রহ্মদর্শনের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তদনুসারে ইহাও একভাবের ব্রহ্মদর্শন।

ব্রহ্মচারিবাবা আমাকে যে ভাবে দীক্ষিত করিয়াছেন তদ্বিষয় "আমার সহ ঘনিষ্ঠতা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। এতদ্বারা আমাকে নিদিধ্যাসনে সমর্থ করাই তাঁহার অভিপ্রেত বুঝা যায়। গুরু ও বেদবাক্যদ্বারা সেই জ্ঞেয়বস্তুর (পরব্রহ্মের) অস্তিত্বাবধারণ করিতে পারিলে, তাদৃশ অবধারণকে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কহে; আর পরোক্ষব্রহ্মবিদ্ হইয়া নিম্নলিখিত উপায়ে যদি কেহ সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মকে 'আমি' বলিয়া স্থির করিতে পারেন, তবে তাঁহার অপরোক্ষ ব্রহ্মবিদ্ বা আত্মদর্শী বলিয়া থাকে। দেবান্তদর্শনের "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।" এই সূত্রে এই কথা সূচিত হইয়াছে। তথাচ,

শ্রুতিঃ—শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

স্মৃতি ঃ—শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেন মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।

মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥

বেদবাক্যদ্বারা প্রথমে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হয়। সেই তত্ত্ব জগৎ ও ঈশ্বরাদির বহির্ভূত; সুতরাং একমাত্র বেদই তাহার প্রমাণ। বেদে যাহাদের নিষ্ঠা নাই তাহারা কস্মিন্‌কালেও মুক্তির অধিকারী হইতে পারে না। ঐরূপ বেদবাক্যদ্বারা শ্রবনের পরে বেদের সেই সকল কথাদ্বারা চরমে কি নির্ণীত হইতেছে, ইহা জ্যামিতির উপপত্তির ন্যায় বুঝিতে হয়, ইহার নাম মনন। সেই উৎপন্ন বিষয় কি হইল সর্ব্বদা তাহার ধ্যান অর্থাৎ সেই দিকে

অন্তঃকরণকে ধাবিত করিতে হয়, ইহার নাম নিদিধ্যাসন। এই ভাবে আত্মার (ব্রহ্মের)অপরোক্ষ দর্শন ঘটে।

ব্রহ্মচারী নিজে এই ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিলে আমাকে সেই নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত করিতেন না। তিনি অপ্রত্যক্ষ মানিতেন না, নিদিধ্যাসন না করিলে আমাকে তাহা বলিতেন না।

তিনি আমাকে সাধনের জন্য যে বিদ্যা দিয়াছেন, তাহা হিমালয়ে গিয়া সংসিদ্ধিলাভ করার পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বুঝা গেল।

লোকনাথ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় ঠিক বিচারাবলম্বনে যে আত্মদর্শন করিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। তিনি কর্ম্মযোগী ছিলেন; হিমালয়ে যাইয়া কর্ম্মযোগাবলম্বনে বিশেষভাবে সমাধি বা চিত্ত স্থির করিয়া রসায়নিক ফলোদয়ের ন্যায় সহসা শ্রবণ-মনন নিদিধ্যাসনের ফল প্রাপ্ত হইলেন। এতকাল সেই ব্রহ্মের সত্তাবধারণ করিয়া যে তৎপ্রতি অন্তঃকরণ চালনা করিয়া আসিতে-ছিলেন, অন্তঃকরণের অগম্য বলিয়া কিছু করিতে পারিয়াছিলেন না, আপনি কি বস্তু তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ ছিলেন, এখন সহসা দিক্‌ভ্রম রহিত হওয়ার ন্যায় তাঁহার চট্‌কা ভাঙ্গিয়া গেল, আমি সেই বেদবেদান্তের জ্ঞেয় ব্রহ্মপদার্থ এই সত্য জাগিয়া উঠিল। তিনি আপনাকে জগদ্ব্যাপার হইতে বহির্ভূত সুতরাং মুক্ত দেখিতে পাইলেন। জগতের অজ্ঞের সেই ব্রহ্ম আপনিই হইয়া উঠিলেন। গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলী তখনও এই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না, সুতরাং অন্যের ন্যায় বদ্ধ জীব ছিলেন; তাহাতে গুরুর জন্য কান্দিয়া আকুল হইলেন। তিনি এইভাবে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার অন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এখন আর তাঁহাতে পূর্ব্বের ভাব নাই, তিনি আর সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় আপনাকে কর্ম্মের কর্ত্তা ও

ফলভোক্তা দেখিলেন না, কর্ম্ম বা জগৎ হইতে তিনি পৃথক পদার্থ, এসকল তাহা হইতে পৃথক্ বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতেছে; পদ্মপত্র জলমধ্যে বাস করিলেও যেমন তাহাতে জল লিপ্ত হইতে পারে না, তিনি কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও তেমন কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হন না। তিনি সকলের দ্রষ্টা বা সাক্ষীপুরুষ। তাঁহাতে আর সংসারের কোনরূপ বাধ্যবাধকতা রহে নাই; তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন বলিতে যেন কেহ দেবতাদর্শনাদির ন্যায় কোন পৃথক্ বস্তুর উপলব্ধি মনে না করেন। আত্মদর্শন সম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্য এই যে—

"তিলেষু তৈলং দধিনীবসর্পিরাপঃস্রোতঃস্বরণীযুচাগ্নি।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেহসৌ সত্যেনৈনং তপসা যো হনুপশ্যতি॥"

অর্থাৎ তিলের মধ্যে তৈল, দধির মধ্যে ঘৃত স্রোতের মধ্যে জল ও কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি যে ভাবে পাওয়া যায়, সেইরূপ সমস্ত জগৎ মন্থন করিয়া নিজের হৃদয়ে আত্মাকে গ্রহণ করিতে হয়। এইভাবে গ্রহণ করার অধিকারী কে? যিনি সত্যরূপ তপস্যাবলম্বনে উহাকে দেখিতে পাইয়া থাকেন।

লোকনাথের কথিত কর্ম্ম ও সাংখ্যের কথিত প্রকৃতি একই জিনিষ, জীবের দেহ, মন, হৃদয় প্রভৃতি উহারই অন্তর্গত। পূর্ব্বকথিত বিজ্ঞানদৃষ্টিতে বা কর্ম্মকে আমাদের অনুভব সমষ্টি বুঝিলে আপনাকে (আত্মাকে) তাহা হইতে পৃথক্ বুঝা যায়। আত্মা চেতন, প্রকৃতি জড়; প্রকৃতসম্ভূত বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ প্রভৃতি সেই জড় বই নয়। চিন্ময় আত্মা (ব্রহ্ম) পদার্থের সন্নিধানে থাকাতে বুদ্ধিতে আত্মার চেতনা প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাতেই বুদ্ধি বুঝিতে সক্ষম হয়; আবার বুদ্ধিগত চেতনাদ্বারা মন, মনোগত চেতনাদ্বারা ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গত চৈতন্যদ্বারা শরীর সচেতন হইয়া থাকে; কাষ্ঠখণ্ডাদিতে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়পথদ্বারা চেতনা সেইভাবে পঁহুছিতে পারে না বলিয়া তাহা অচেতন থাকে।

যাহাদের এতাদৃশ বিচারদৃষ্টি জন্মিয়াছে, তাঁহারা স্থিরচিত্তে ঐ সকল জড়ের সত্তা বাদ দিয়া কেবল চৈতন্যসত্তা ধরিতে পারেন। এই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বেদ বলেন, "দধির মধ্যে ঘোলের সত্তা বাদ দিয়া যেমন অবশিষ্ট ঘৃত সত্তা গ্রহণ করিতে হয়, দীপশলকাস্থিত কাষ্ঠ ও ফস্‌ফরসের সত্তা বাদ দিয়া যেমন গূঢ়ভাবে লুক্কায়িত অগ্নির সত্তা অনুমান করা যায়, তেমন অন্তঃকরণ মধ্যে আত্মসত্তা উপলব্ধি হইতে পারে।" লোকনাথ হিমালয়ে সেই ভাবে আত্মদর্শন করিয়াছিলেন। লোকনাথকে কর্ম্মযোগদ্বারা এইভাবে আত্মলাভে সমর্থ দেখিয়া গুরু ভগবান্ বিস্ময়সহকারে বলিয়াছিলেন, "আমি জ্ঞানপথাবলম্বী; কর্ম্মযোগদ্বারা যে এরূপ সিদ্ধি (আত্মজ্ঞান) লাভ করা যায় একথা আমি এতকাল মানিতাম না।" জ্ঞানমার্গীরা বলেন, কর্ম্ম জ্ঞানকে প্রসব করিতে পারে না।" কর্ম্ম—অজ্ঞান। সেই অজ্ঞান কখনও জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। তবে যে কোন কোন ব্যক্তিকে কর্ম্ম করিতে করিতেও জ্ঞানলাভ করিতে দেখা যায়, সে কেবল জন্মান্তরে যাহাদের জ্ঞান বিচারদ্বারা আত্মজ্ঞান বিকাশোন্মুখ হয় অথচ প্রতিবন্ধকতা বিশেষ দ্বারা জ্ঞান ফুটিতে অবকাশ পায় না, তাঁহারা ইহজন্মে সামান্য কর্ম্মদ্বারা সেই প্রতিবন্ধকতা রহিত করিতে পারিলে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানবিচারের ফলস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন।

লোকনাথের সীতানাথ জন্মে কোন জ্ঞান বিচার হইয়াছিল না। কোন অপ্রকাশ্য দৈব উপায়ে জানা গিয়াছে যে লোকনাথ তাহারও পূর্ব্বে জনলোকে ছিলেন, তথা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্তে্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই কথা সত্য ধরিলে, সেখানে জ্ঞান বিচারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখা যায়।

লোকনাথ যোগী হইলেন কিসে? এই প্রশ্নেরও উত্তর সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছি— সাধারণে জানে পরমাত্মার সহিত

জীবাত্মার ঐক্য করার নাম যোগ। আমরা এই দেহের মালিককে জীব বলিয়া বুঝি; পরমাত্মার কথা কিছুই জানি না। লোকনাথ এই চরম সিদ্ধির পূর্ব্বে যাহাকে জীবাত্মা বলিয়া জানিতেন, সেই সিদ্ধির পরে আর তাঁহাকে খুজিয়া পাইলেন না। কারণ তখন আর তিনি মালিক রহিলেন না, সকলের অজ্ঞেয় সেই বিজ্ঞাতা (পরমাত্মা) হইয়া উঠিলেন। তাহাতেই বলিতেছি লোকনাথের জীবাত্মা, পরমাত্মাতে লুকাইয়া গিয়াছিল। যদি বল লোকনাথ ব্রহ্মচারী পরমাত্মারূপে যখন মুক্ত হইয়া গেলেন তবে তিনি পরমাত্মাই, তাঁহাকে যোগী বলিব কেন? উত্তর এই যে—পরমাত্মা পরব্রহ্মের সহিত জগতের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা নিত্যমুক্ত; ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা সে ভাবে থাকিতে পারেন নাই। পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে জীবের মত ব্যবহার করিতে হইত। এই অভ্যাস ক্ষয় হইলেই ব্রহ্মচারীর ভাষাতে কর্ম্মক্ষয় হইল, তখন তিনি একক (মুক্ত) থাকিবেন। আর সেই অভ্যাস (প্রারব্ধকর্ম্ম) থাকা পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরমাত্মাস্বরূপ মুক্ত বা আমাদের মত বদ্ধ জীব না বলিয়া মাঝামাঝি কথায় পরমাত্মযোগী বলা যায়। এজন্য বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় লোকনাথেরও পাপপুণ্যের বিচার ছিল না। লোকে যোগীদিগের এই ভাব বুঝিতে না পারিয়া যোগীদিগের চরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া বিভ্রাটে পতিত হয়। পতঞ্জলি, যোগদর্শনের সূত্র করিয়াছেন যে—

"কর্ম্মাশুক্লকৃষ্ণযোগীনাং ত্রিবিধমিতরেষাম্॥"

যোগীদিগের কর্ম্মে পাপ ও পুণ্য থাকে না, অন্যেরা পাপ, পুণ্য ও পাপপুণ্যমিশ্র এই তিন প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে। যোগীরা পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ অন্যান্য মনুষ্যের মত কর্ম্ম করিয়া যান; কিন্তু তাঁহারা বুঝেন, জন্মার্জ্জিত সংস্কারদ্বারা গঠিত প্রকৃতি ইহা না করিয়া পারে না। ("প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি"—গীতা) প্রাণি সকল আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে

চলে, তাহাতে বাধা দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। যোগীরা আপনাকে ও আপনার সংস্কারার্জ্জিত প্রকৃতিকে পৃথক্ দেখেন বলিয়া কর্ম্মজনিত পাপ পুণ্য তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। সাধারণ মনুষ্যের এই দৃষ্টি না থাকাতে তাহারা কর্ত্তা হইয়া কর্ম্ম করে এবং পাপ পুণ্যের ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়। বর্ণিত যোগী বা জ্ঞানীরা দেখেন প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে, আমি মুক্ত পুরুষ, কিছুই করি না।

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥" গীতা। ১৩।২৯

যে ব্যক্তি দেখে যে প্রকৃতি দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, সে আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া দর্শন করিয়া থাকে। এজন্য মুক্ত পুরুষেরা হাত পা দ্বারা কার্য্য করিয়াও বলেন, "ইহা আমার প্রকৃতি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমি কিছুই করি না।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি ঈশ্বর বা দেবতাগণ সকলেই উত্তমরূপ জ্ঞানী বা যোগী, অথচ সকলেই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। বিষ্ণু রক্ষা করেন বলিয়া পুণ্যবান্ ও রুদ্র সংহার করেন বলিয়া পাপী হন না। এই ত গেল কর্ম্ম করা না করার কথা; তাহার পর তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত মত আত্ম-দর্শন বা যোগদৃষ্টিও সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ থাকে না।

"তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ।" পাতঞ্জল যোগসূত্র।

আত্ম-দর্শনের ফাঁকে ফাঁকে পূর্ব্বসংস্কার দ্বারা জগদ্দর্শন (লৌকিক ব্যবহার) ঘটিয়া থাকে। তখন যোগস্মৃতি আনয়ন করা দুর্ঘট হয়। অর্জ্জুন (অশ্বমেধ পর্ব্বে) শ্রীকৃষ্ণের নিকট পুনরায় ভগবদ্‌গীতা শুনিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, "তুমি যে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া সে সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, ইহা বড় পরিতাপের বিষয়, তখন আমি যোগযুক্ত চিত্ত হইয়া (যোগযুক্তেন চেতসা) গীতা বলিতে পারিয়াছিলাম, এখন আর সেই স্মৃতির উন্মেষ হইবে না।"

জ্ঞানী বা যোগী পুরুষেরা কখন যোগদৃষ্টির কখন বা লৌকিক দৃষ্টির কথা বলিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদের কথার ঐক্য দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতাকে একবার বহুজন্ম গ্রহণ করেন বলিলেন, অন্যত্র আপনাকে অজ অর্থাৎ জন্মহীন বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

ব্রহ্মচারী এইভাবের যোগী হওয়াতে, তাঁহার ও সাধারণের ব্যবহারে রাতদিন তফাৎ হইয়া যায়। সাধারণের কথা এই যে পাপ করিয়া অনুতাপ করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইল। ব্রহ্মচারী বলিতেন, কার্য্য করিয়া অনুতাপ করাই পাপ (দোষ)। তিনি দেখিতেন উপস্থিত মত কতকগুলি কার্য্য শরীরদ্বারা নিষ্পাদন করিতে হয়, তিনি নিজেও কিছু করেন না, সুতরাং তাহার ফলভোগীও নহেন। অনুতাপ আসিলেই বুঝা গেল আত্মদৃষ্টি ঘুচিয়া, লোকদৃষ্টি জন্মিয়াছে; তাহাতে অনুতাপ যাতনা ভোগ হইতেছে, তবে তাহা পাপভোগ না বলিবেন কেন?

একদা লোকনাথ, সাধারণের নিকট, অসাধারণ (মুক্তদিগের) কথা বলিতেছিলেন তাহাতে তাহাদের অনিষ্ট করা হয় দেখিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম, "তুমি একজন কসাই। এই সকল গোবেচারাদিগকে নষ্ট করিতে বসিয়াছ। আমি এমনস্থানে কিরূপে থাকি?" তিনি বলিলেন, "তুই যে বেটা ব্রহ্মহত্যাকারী। তুই ব্রহ্মকে গোপন করিয়া কথা বলিস্।"

তিনি নিভৃতে আমাকে বলিলেন, "আমি তোমার সহিত যখন মুক্তিসম্বন্ধে প্রসঙ্গ করি, তখন তোমাকেই উপস্থিত দেখি, অন্যান্য লোকদিগকে দেখি না, আমি ভাবি নির্জ্জনবনে বসিয়া দুইজনে কথা কহিতেছি।"

এই সকল কথা দ্বারা তদীয় ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতে পারে, নতুবা একজনের জ্ঞান, অন্যের প্রত্যক্ষ করাইয়া দিবার উপায় নাই।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, "কর্ম্ম ক্ষয় হইলেই আমি একা থাকিব, তাহাই আমি চাহি।" এই কথাটী আমি অন্য ভাষাতে বুঝাইতেছি। মরুভূতি মরীচিকা দেখা যায়। মরুভূমি ধর অক্ষর ব্রহ্ম, আর মরীচিকা ধর ক্ষয় জগৎ। আমার দেহটী মরীচিকা জলের একটী তরঙ্গ। মরীচিকা যখন দেখিবনা তখন আমি মরুভূমিরূপে একক থাকিব; ইহাই অদ্বৈতবাদের কথা। দ্বৈত বাদীরা ইহা বলিতে পারেনা, তাহারা মরীচিকারও মূল্য ধরে। অদ্বৈত বাদীরা বলে মরীচিকা (জগৎ) প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার বস্তুত্ব নাই।

ষড়দর্শনের একমাত্র বেদান্ত দর্শনই এই অদ্বৈতবাদ প্রকাশ করে। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য করিয়া অদৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগে অদ্বৈতবাদ প্রচলিত আছে, কলিরাজ তাহা সহ্য করিতে পারেনা। এজন্য কলিচরেরা এই যুগে অদ্বৈতবাদকে ঢাকিয়া রাখিতে যত্ন করে। কলির মাধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, রামানুজও নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদকে ঢাকিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন চারিরকম ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে উহা স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় নাই।

গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলীর দেহত্যাগ

এই ঘটনার পর ভগবান্‌চন্দ্র শিষ্যদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া ৺কাশী ধাম যাত্রা করেন। পথে হিতলাল মিশ্র নামক এক মহাত্মার সহিত মিলন হয়। এই হিতলাল মিশ্র এক সময়ে কাশীর তৈলঙ্গ-স্বামী ছিলেন। লোকনাথের দুই জন্ম স্মরণ ছিল, হিতলাল আপন তিন জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিতেন। এখন ভগবান্, লোকনাথ,

বেণীমাধব ও হিতলাল এই চারি মহাপুরুষ একত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। কাশীতে আসিয়াও তাঁহারা একত্রে রহিলেন। তখন লোকনাথ ও বেণীমাধবের বয়স ৯০ কি ১০০ পরিমিত হইয়াছিল। তথাপি ভগবান্ তাঁহাদিগকে বালক বলিয়া মনে করিতেন। ভগবান্ অশ্রুপূর্ণনয়নে লোকনাথ ও বেণীমাধবের হস্তদ্বয় হিতলালের হস্তোপরি স্থাপন করিয়া বলিলেন, "আমার এই বালক দুইটীকে আজ তোমার হাতে তুলিয়া দিলাম; তুমি আজ হইতে ইহাদিগের ভার নেও।" হিতলাল ও 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি দিলেন।

তাহার অল্পকাল পরে ভগবান্ একদিন শিষ্যদ্বয়কে কহিলেন, "আমি অদ্য গঙ্গাস্নান করিয়া কিছুকাল জপ করিব, তোমরা আমার অপেক্ষায় অবস্থান কর।" এই বলিয়া গঙ্গাতে স্নান করতঃ কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে জপ করিতে বসিলেন। বাবা লোকনাথ বলিয়াছেন, "আমি তাঁহার প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম, শেষে গুরুদেবকে গঙ্গার ঘাটে জপে নিবিষ্ট দেখিয়া ভাবনা দূর করিলাম। কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার শরীর ধরিয়া বলিলাম, 'উঠ তোমার আবার জপ?' আমার হস্তের সংস্পর্শে তাঁহার শরীর পতিত হইল, তখন বুঝিলাম গুরুদেব দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার জন্য শোক করি নাই। তাহার পর যথারীতি তদীয় দেহের সংস্কার সম্পাদিত হইল।"

ভ্রমণ বৃত্তান্ত

পশ্চিম দিকে যাত্রা

বারদীর ব্রহ্মচারীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিশেষতঃ তাঁহার উত্তর ও পূর্ব্বদিক যাত্রার কথা নব্য সমাজের পক্ষে বিশ্বাসের অযোগ্য এবং প্রচলিত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ।

আমরা প্রথমে তাঁহার পশ্চিম-দিক্ যাত্রার বিষয় বর্ণনা করিতেছি। এই ব্যাপার ব্রহ্মচারীর গুরুর মৃত্যুর পূর্ব্বে কি পরে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার জানা যায় নাই। তবে কিনা, এই ভ্রমণবৃত্তান্তে তিনি যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গুরুর বিষয় কিছু ব্যক্ত করেন নাই। উত্তর ও পূর্ব্বদিক যাত্রার সময়ে যে তাঁহার গুরু বিদ্যমান ছিলেন না তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা অনুমান করি তাঁহার পশ্চিম যাত্রাতেও গুরু ছিলেন না। এই জন্য এই বিষয়টি গুরুর মৃত্যুর পরবর্ত্তী ঘটনা মধ্যে সন্নিবেশ করা গেল। ব্রহ্মচারী আমার জিজ্ঞাসা মতে বলিয়াছেন, "আমার পশ্চিম যাত্রার সীমা সমুদ্র পর্য্যন্ত।" আমি ভাবিলাম, তাহা হইলে আরব সাগরের পূর্ব্বপার পর্য্যন্ত গিয়া থাকিবেন। কিন্তু পরে বুঝিলাম আমার এ অনুমান ঠিক্ নহে। যে সকল মুসলমান মক্কা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহাদিগের সহিত মক্কা ও মদিনার অবস্থাদি জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। তাহাতে যে সকল উত্তর প্রত্যুত্তর হইত, তদ্দ্বারা তাঁহার মক্কা ও মদিনায় গমন স্পষ্টরূপে বুঝিয়াছি। পরে তিনি প্রসঙ্গক্রমে স্পষ্টত তাহা বর্ণনাও করিয়াছেন। পাঠকগণ এ পর্য্যন্ত শুনিয়া, আমাদের ন্যায় ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বতট, তাঁহার পশ্চিম যাত্রার শেষ সীমা মনে করিতে পারেন। কিন্তু তাহাও সমীচীন নহে। একদা কতিপয় ইংরাজশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া আপনাদিগের মধ্যে কথোপকথোন করিতেছিলেন যে, অমুক ইংরেজী শব্দটা ফরাসীগণ কর্ত্তৃক এরূপ ভাবে উচ্চারিত হয়। তচ্ছ্রবণে ব্রহ্মচারী ফরাসীদের এইরূপ ২।৪টি শব্দ উচ্চারণ করিয়া, তাহাদের দেশ পর্য্যন্ত গিয়াছেন এরূপ স্বীকার করিলেন। এতদ্বারা তাঁহার পশ্চিমদিক যাত্রার শেষ সীমা আমরা আটলাণ্টিক মহাসাগরকে স্থির করিতে পারি। তৎসম্বন্ধে আমার সহিত তাঁহার আর বিশেষ কোন প্রসঙ্গ হয় নাই।

মক্কা মদিনায় যাত্রাসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি হাটিতে হাটিতে মক্কাতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। এতদ্দেশীয় হিন্দুদের সংস্কার আছে যে, মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে মক্কায় যাইতে দেয় না। কদাপি কেহ গেলে, যবনান্ন ভক্ষণ করাইয়া, তাহাকে জাতিভ্রষ্ট করিয়া লয়। কিন্তু সে কথা সত্য নহে। আমি তথায় উপস্থিত হইলে, মুসলমানেরা আমাকে বিশেষ যত্ন করিয়া আতিথ্য সৎকার করিয়াছিল। তাহারা আমাকে বলিয়াছিল, "আপনি স্বয়ং রসুই করিয়া খাইতে ইচ্ছা করিতে, সিধা গ্রহণ করুণ। নতুবা আদেশ করিলে, আমরাও রসুই করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।" আমি শেষোক্ত কথায় সম্মত হইলাম। তাহারা অতি পবিত্র হইয়া, কাপড় দিয়া মুখ বাঁধিয়া আমার জন্য রন্ধন করিতে লাগিল। মুখবাঁধার তাৎপর্য্য এই যে রন্ধন করিতে করিতে সহসা কথা কহিলে, পাকদ্রব্য থুথু পতিত হইয়া তাহা অপবিত্র হইতে পারে।"

"তথা হইতে মদিনাতে যাই। সেখানে একস্থানে উপবেশন করিয়া থাকিলাম। তথায় সমাগত মুসমমানগণ, আমার আহারের জন্য বড় বড় লাড্ডু রাখিয়া চলিয়া যাইত। এইরূপ প্রত্যহ আমার নিকট প্রচুর লাড্ডু সমানীত হইত। আমি সামান্য যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলে, ভক্ষ্যাবশেষ তাহারা আদর করিয়া, ভোজন করিত। এখানকার মুসলমানেরাও মক্কাবাসীদের ন্যায় মুখ বাঁধিয়া রসুই করিয়া আমাকে ভোজন করাইয়াছে। ওখানে গিয়া আমার মক্কেশ্বর দর্শনেচ্ছা বলবতী হইল। শুনিলাম পশ্চিমদিকে মরুভূমির মধ্য দিয়া ৩।৪ মাস গমন করিলে মক্কেশ্বর যাওয়া যাইতে পারে। আমি তদুদ্দেশ্যে কিয়দ্দূর গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু মক্কেশ্বর পর্য্যন্ত যাওয়া ঘটে নাই। কয়েক দিনের পথ অতিক্রম করিলে, "আবদুল গফুর" নামক এক মহাপুরুষের সন্ধান পাইলাম। মুসলমানেরা তাহাকে অতিশয় ভক্তি করে; তিনি একস্থানে চুপ

করিয়া বসিয়া থাকেন; কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহেন না। আমি অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার দর্শন পাইয়া নিকটে গিয়া উপবেশন করিলাম; তিনি আমার প্রতি লক্ষ্যও করিলেন না। আমি ধীরে ধীরে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম; তাঁহার কোনও সাড়া শব্দ নাই। তথাপি আমি বিরত হইলাম না। মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কয়দিনের লোক?' আমি ত প্রশ্ন শুনিয়াই অবাক্। বুঝিলাম, নিশ্চয়ই তিনি আমার বয়স জিজ্ঞাসা করেন নাই। ইহার ভিতর জন্মের কথা স্মরণ আছে। আমি চিন্তা-মগ্ন হইলাম। ভাবিলাম কত জন্মের কথা স্মরণ আছে, তাহাই জানিতে চাহিয়াছেন। উত্তর করিলাম, 'আমি দুইদিনের লোক। আপনি কয়দিনের?' তিনি কহিলেন, "আমি চারিদিনের মনুষ্য। অর্থাৎ আমার চারি জন্মের কথা স্মরণ আছে।' পরে বিস্তর আলাপ হইতে লাগিল। জানিলাম দাক্ষিণাত্যে কোন ক্ষত্রিয়বংশে তাঁহার এই জন্ম হইয়াছে।"

পাঠক, এই পর্য্যন্ত পড়িয়া মনে করিতে পারেন যে, ঐ মহা-পুরুষ ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া, পশ্চাৎ মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন; তাহাতে আবদুল গফুর নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাস্তবিক তাহা নহে। যিনি জন্মগ্রহণ করিয়া গত তিন জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারেন তিনি কখনও বাহ্য সমাজ বন্ধনে বাধ্য থাকিতে পারেন না। এই ভাবটি আমার স্বকপোল কল্পিত নহে। গুরুদেব লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ও সমাজ বন্ধন মানিতেন না; স্পষ্ট বলিতেন, আমরা অসামাজিক মনুষ্য। তাঁহার দেখাদেখি পাছে অন্যেরা সমাজ বন্ধন না মানিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, এই জন্য তিনি লোকালয়ে আসিয়া অনেকটা সমাজের অনুসরণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্॥" গীতা।

আমি কর্ম্মক্ষম হইয়াও যদি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকলাপ অতিক্রম করি তবে সকল মনুষ্যই আমার অনুসরণ করতঃ কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিবে; সুতরাং আমার কর্ম্ম না করা হেতু, সমাজ উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

উক্ত মহাপুরুষ সংসারের এই সকল ভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বিদিত হইয়াই জন্মে জন্মে লোক সমাজের বাহিরে অবস্থান করিয়া আসিতেছিলেন। এবং বর্ত্তমান জন্মে ও হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া আরব দেশের মরু প্রদেশে লুক্কায়িত রহিয়াছেন এবং তথাকার মুসলমান সমাজোপযোগী, আবদুল গফুর নামে পরিচিত হইয়াছেন। ব্রহ্মচারীও তাঁহার "আবদুল গফুর" নাম পাইয়াছেন। তিনি গত তিন জন্মে যে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মচারীর নিকট তৎসমুদয় প্রকাশ করিলে, ব্রহ্মচারী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সেই সকল স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

আবদুল গফুরের সহিত ব্রহ্মচারীর বিশেষ প্রকার আলাপ পরিচয় হইলে পর, তিনি ব্রহ্মচারীর ক্ষমতা দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি পাকা লোকের (গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর) হাতে পড়াতে এত উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছ, আমাদের ভাগ্যে এতাদৃশ গুরু প্রাপ্তি ঘটে নাই।"

সম্ভবতঃ আবদুল গফুরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ব্রহ্মচারী পশ্চিমাভিমুখে ইউরোপে প্রবেশ পূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত ফ্রান্স প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্রহ্মচারী গুরুর নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন নাই। কাবুলে গিয়া কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষাতে তাঁহার কিছুমাত্র অধিকার ছিল না। অথচ সংস্কৃত

ভাষা শিক্ষার অভিলাষ তাঁহার হৃদয়ে নিহিত ছিল। তদ্দারা প্রণোদিত হইয়া, যে দেশে সংস্কৃত ভাষাতে কথাবার্ত্তা বলার প্রথা প্রচলিত আছে, এমন স্থানে গিয়া কিয়ৎকাল বাস করিয়া সংস্কৃত কথা বলার অভ্যাস করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণভাগে গমন করতঃ সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত পণ্ডিতজন সেবিত জনপদ বিশেষে কিয়ৎকাল যাপন করিয়া ছিলেন। এইস্থানে অবস্থান কালে প্রাচীন হিন্দু সমাজে চৌর্য্যাদির বিচার কিরূপে নিষ্পন্ন হইত তাহার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটি আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন।

সেকেলে পুলিস যে ভাবে চোর ও চোরা মাল বাহির করিতেন, বর্ত্তমান সময়ে আমরা তাহা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। এখনকার শিক্ষিতেরা জানেন, সমাজ দিন দিন সভ্য ও উন্নত হইতেছে। আমরা অশিক্ষিত মনুষ্য', নব্য সভ্যতা ও উন্নতির ভাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ। আমরা দেখি, দিন দিন জাল, জুয়াচুরী, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার নাম যদি নব্যদিগের সভ্যতা ও উন্নতি হয়, তবে আমরা নাচার। আমরা প্রাচীনদিগের আচার স্মরণ করিয়া, বর্ত্তমান ব্যবহারে তৃপ্ত থাকিতে পারি না।

তিনি বলিয়াছেন, "একদিন প্রাতে শুনিলাম গত রাত্রিতে অমুক বাড়ীতে চুরি হইয়াছে। তচ্ছ্রবণে ঐ দেশবাসীদিগের আচার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করার জন্য ঘটনা স্থানে উপনীত হইলাম। চৌর্য্যগ্রস্ত ব্যক্তি গ্রামপালকে ডাকাইয়া আনিয়া চুরির এজাহার করিলেন। গ্রামপাল চোরের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। গ্রামপাল, গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন। গত কল্য রাত্রিতে অমুকের বাড়ীতে যে চুরি হইয়াছে, কে সেই চুরি করিয়াছে। গৃহস্থেরা বলিল, আমরা কেহ চুরি করি নাই। গ্রামপাল এইরূপ করিয়া, এক বাড়ী হইতে অন্য

বাড়ীতে যাইতে লাগিলেন ও উক্তরূপ উত্তর পাইতে লাগিলেন। অবশেষে এক বাড়ীতে গেলে সেই গৃহস্বামী বলিল,—'আমি চুরি করিয়াছি।' গ্রামপাল, তাহাকে চোরামাল লইয়া ঘটনা স্থলে যাইতে বলিলেন। চোরও তাহাই করিল। আমি দেখিলাম, বেলা একপ্রহর দশদণ্ডের সময়ে গ্রামপাল চোর ও চোরামাল সহ ফরিয়াদীর বাড়ীতে উপনীত হইলেন।

গ্রামের দশ পাঁচ জন লোক সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া গ্রামপাল বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। চোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি চুরি করিলে কেন?' চোর বলিল, আমার এই সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হওয়াতে ফরিয়াদীর নিকট এই গুলি পূর্ব্বে যাচ্ঞা করিয়াছিলাম। ফরিয়াদি না দেওয়ায় অগত্যা চুরি করিয়া আনিয়াছি।' তখন গ্রামপাল ফরিয়াদীকে বলিলেন, 'কেমন হে, একথা কি সত্য? এই ব্যক্তি কি ইতিপূর্ব্বে তোমার নিকট এই সকল দ্রব্য প্রার্থনা করিয়াছিল? ফরিয়াদী বলিল 'হ্যাঁ, সে এ গুলির অভাব জানাইয়া আমার নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিল।'

গ্রামপাল, এই ভাবে দুই পক্ষের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ফরিয়াদী গাত্রোত্থান করতঃ চোরা মাল গুলিকে, সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া. এক ভাগ চোরকে দিল, অবশিষ্ট ভাগ ঘরে লইয়া গেল; মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। গ্রামপাল ও গ্রামিকগণ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।"

সুমেরু যাত্রা

৺লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বেণীমাধব ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন। ভগবান গাঙ্গুলী যত দিন জীবিত ছিলেন,

তত্তকাল তিনি কর্তৃত্ব করিতেন, তাঁহার কাশী প্রাপ্তির পরে, লোকনাথ ও বেণীমাধব এই দুই জনের মধ্যে লোকনাথই নেতা ছিলেন। সমভূমিতে পর্য্যটন করিতে করিতে বিতৃষ্ণা হইল। লোকনাথ সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহার আর মর্ত্ত্যভূমে বিচরণ ভাল লাগিল না। সিদ্ধির বলে বলীয়ান্ হইয়া, সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে চাহিলেন। বেণীমাধবের তাহাতে দ্বিরুক্তি করিবার অধিকার নাই, তিনিও সঙ্গে যাইবেন স্থির হইল। রাজা যুধিষ্ঠির যে পথে প্রস্থান করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে ইলাবৃতবর্ষস্থিত সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হইবে। সেখানে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্যানাদি রহিয়াছে; তথায় গেলে স্বর্গে পৌছিবার সুবিধা ঘটিবে তাঁহারা এইরূপ স্থির করিয়া, দেহকে বরফের উপর দিয়া চলিবার উপযুক্ত করিবার জন্য, যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে বদরিকাশ্রমে কয়েক বৎসর শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে বাস করিতে লাগিলেন। আমরা বদরিকাশ্রমের যে অবস্থা ও শীতাধিক্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য সময়ে তথায় মনুষ্য বাস করিতে পারে না, স্পষ্ট বুঝিলাম। ১৩০৬ সনের ২১ শে আশ্বিন শনিবার প্রাতে আমরা কেদার তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করি। তৎকালে যে সকল লোক তথায় ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ আমাদের সঙ্গে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন; যাত্রীদের যাতায়াত তাহার পূর্ব্বেই একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। পথের চটিগুলি উঠিয়া গিয়াছিল। ফলতঃ ৺কেদার, ৺বদরীনারায়ণ ও ৺গঙ্গোত্রী এই তিন তীর্থে, শীতের ছয়মাস মনুষ্য বাস করিতে পারে না। সুতরাং মনুষ্যকর্ত্তৃক পূজা হয় না। পাণ্ডারা শীতের ছয় মাসের পূজোপকরণ একত্র করিয়া রাখিয়া মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া আসে। ছয় মাস পরে বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়াতে পথ মুক্ত করাইতে থাকে। তখন বরফ সকল গলিতে আরম্ভ হয়। মনুষ্যেরা অনেক স্থানে বরফ কাটিয়া পথ

পরিষ্কার করিতে থাকে। ব্রহ্মচারিদ্বয় বারমাস তথায় বাস করিয়া, বরফে বাস করা অভ্যাস করিয়াছেন।

এইরূপ তিন বৎসরকাল অভ্যাস করিয়া তাঁহারা শরীরকে অনাবৃত রাখিয়া, বরফের উপর দিয়া চলিবার উপযুক্ত করিয়া লইলেন। এইরূপে দেহ অভ্যস্থ করার পর, তাঁহারা পঞ্চ পাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পথ দ্বারা উত্তরাভিমুখে চলিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে পূর্ব্ব কথিত হিতলাল মিশ্র আসিয়া তাঁহাদের সহিত জুটিলেন। তিনিও সুমেরুযাত্রার যাত্রী হইলেন। তখন লোকনাথ ও বেণীমাধব হিতলালকে কহিলেন, "এখান হইতে দেহটাকে বরফের উপর দিয়া চলিবার উপযুক্ত করিয়া না লইলে দেহপাতের সম্ভাবনা। অতএব কয়েক বৎসর এখানে বাস করিতে হইবে।" মহাভারত পাঠে জানা যায়, হিমালয়ের বরফের উপর দিয়া যখন পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করেন তখন প্রথমে দ্রৌপদীর দেহপাত হয়। পরে কিয়দ্দূর গিয়া সহদেবের শরীর নষ্ট হইল; নকুল অর্জ্জুন ও ভীমসহ চারি পাণ্ডবের দেহ, ক্রমে ক্রমে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। পরে বরফ গলিত জলে সেই সকল দেহ ভাসাইয়া কেদারতীর্থে আনীত হইয়াছিল। যেখান দিয়া দ্রৌপদী ও পাণ্ডব চতুষ্টয়ের দেহ কেদারে আনীত হয়, পাণ্ডারা অদ্যাবধি সে স্থান দেখাইয়া দিয়া থাকে। তাহার নাম 'ভৃগুপন্থা'। আমরা দেখিয়াছি, যে পথ দ্বারা পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, ভৃগুপন্থা তাহার পশ্চিমদিকে অবস্থিত। পাণ্ডবেরা এই ব্রহ্মচারীদলের ন্যায় বরফে বাস করা ক্রমশঃ অভ্যাস করিয়া গেলে এতদপেক্ষা অধিক দূর পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হইতেন।

পাণ্ডবদিগের পরে এই ব্রহ্মচারীর দলই যে মহাপ্রস্থানের অনুসরণ করিয়াছিলেন, আর কেহ মহাপ্রস্থান করেন না, পাঠকগণ এমন মনে করিবেন না। আমরা জানি এখনও অনেকে মহাপ্রস্থান করিয়া থাকেন।

কালের মহিমাতে এই মহাপ্রস্থানের সঙ্গেও অন্যদের স্বার্থ সংযোগ রহিয়াছে। এতকাল যাঁহারা মহাপ্রস্থান করিতেন, তাঁহারা ৺কেদার তীর্থে সমস্ত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিঃসম্বল হইয়া, বরফে আরোহণ করিতেন। এইভাবে যে কতদিন জীবিত থাকা যায়, তাহা নির্ণয় করার উপায় নাই। যাঁহারা মহাপ্রস্থান করেন তাঁহাদের ঘটি, বাটী, যাহা কিছু সঙ্গে থাকে তাহা কেদারে রাখিয়া যাইতে হয়। সুতরাং তাহা পাণ্ডাদিগের লাভ। তাহার জন্য লুব্ধ হইয়া পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে মহাপ্রস্থান করিতে উত্তেজিত করে বলিয়া পাণ্ডাদিগের অপবাদ আছে। ইংরেজগণ মহাপ্রস্থান করাকে আত্মহত্যা মাত্র বুঝিতে পারেন; স্বর্গ গমনের ভাব তাঁহাদের বুদ্ধিতে স্থান পায় না সুতরাং উত্তেজনাকারী পাণ্ডাদিগকে তাঁহারা আত্মহত্যার সহায় বলিয়া অবধারণ করেন। এতদুপলক্ষে ৺কেদারের পাণ্ডাদের উপর চাপ পড়াতে, পাণ্ডারা এখন মহা-প্রস্থানের প্রসঙ্গ করিতেও ভয় পাইয়া থাকে।

যাহাহউক, হিতলালের সহিত মিলিত হইয়া যাত্রীদ্বয় আরও তিনবৎসরকাল তথায় থাকিয়া শীত সহ্য করা অভ্যাস করিলেন। এইবার হিতলালের দেহও বরফে চলিবার যোগ্য হইল। তখন হিতলাল, লোকনাথ ও বেণীমাধব এই তিন পুরুষ হিমালয়ের শৃঙ্গস্থিত বরফ রাশির উপর আরোহণ করতঃ মহাপ্রস্থানের পথে চলিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কদাচিৎ ক্ষুধার উদ্রেক হইলে কি করিতে?" গুরুদেব ব্রহ্মচারিবাবা কহিয়াছিলেন, "কখনও ক্ষুধার জন্য আমাদের কষ্ট পাইতে হয় নাই। আমরা যে পথ দিয়া চলিয়াছিলাম তাহা সর্ব্বতোভাবে বরফে আচ্ছন্ন নহে। কখন কখন প্রস্তর-কঙ্করময়স্থান দেখা যাইত। সেই সকল প্রস্তর ও কঙ্কর রাশির মধ্যে কন্দমূল যথেষ্ট রহিয়াছে। কখন কখন ক্ষুধার

উদ্রেক হইলে কিয়ৎ পরিমাণে কন্দমূল খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছি। সেই পথের পক্ষে উহাই যথেষ্ট ভোজন।"

ব্রহ্মচারী আরও বলিয়াছেন,—"তখন আমাদের সঙ্গে কিছুমাত্র শীতবস্ত্র ছিল না, আমরা সর্ব্বতোভাবে উলঙ্গ ছিলাম। এইভাবে দীর্ঘকাল চলিতে থাকায়, আমাদের শরীরের চর্ম্মের উপরে একরূপ শ্বেতবর্ণ চর্ম্মচ্ছদ জন্মিয়া গেল। তজ্জন্য আমাদের শীতজনিত কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। এইরূপে চলিতে চলিতে আমরা মানস সরোবরে উপনীত হইলাম।" ঐ শ্বেতবর্ণ চর্ম্মচ্ছদ যে বারদীতে পৌছিবার পরে ও তাহার ছিল ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ক্রমে ঐগুলি মিলিয়া যাইতে আমরা দেখিয়াছি।

আমি মানস সরোবরের কথা শুনিয়া বলিলাম, "আমি তোমার কথা দ্বারা বুঝিলাম যে, তোমরা তিব্বত দেশ পার হইয়া বহু দূরে গিয়াছ; কিন্তু মানসসরোবর যে তিব্বত দেশের মধ্যে?" তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ওরে তোদের মানস সরোবর যে ঘরের কোণে।" তখন বুঝিলাম ব্রহ্মচারী সুদূরবর্ত্তী অন্য কোন মানস সরোবরের কথা বলিতেছেন। তাহার পরে আমি শাস্ত্রানুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি, "উত্তরমানস" নামে অন্য এক তীর্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মচারী তারই কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আমি ব্রহ্মচারীর কথা দ্বারা বুঝিতে পারিলাম তাঁহারা উত্তরা-ভিমুখে চলিতে চলিতে, রুসিয়ার উত্তরভাগস্থ সাইবিরিয়া অতিক্রম করতঃ উত্তর মহাসাগরের ও উত্তরে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদিগের অনুমান মতে উত্তর মহাসাগরের উত্তরে, পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্র অবস্থিত। তাঁহারা পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ মাইল মনে করেন। হিন্দুদিগের মতে পাশ্চাত্যদিগের পরিজ্ঞাত এসিয়া আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা সংবলিত সাগরবেষ্টিত ভূভাগ "সাগর সংবৃত দ্বীপ" নামে অভিহিত। উহা ভারতবর্ষের এক

নবমাংশ মাত্র। এতদ্ভিন্ন নাগ দ্বীপ* প্রভৃতি তাহতে আরও ৮টী দ্বীপ আছে। সে যাহাই হউক, আমাদের কথিত ব্রহ্মচারীর দল, উত্তরাভিমুখে চলিতে চলিতে অনেক ২৫০০০ মাইল অতিক্রম করিয়াছিলেন।

আমি ইউরোপীয় ভূগোলের সহিত ব্রহ্মচারীদিগের ভ্রমণ ব্যাপার মিলাইতে না পারিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ইউরোপীয়েরা যে মানচিত্র প্রদর্শন করাইয়া থাকে, তাহাতে দেখা যায়, উত্তর মহাসাগর, অতিক্রম করিলেই আমেরিকা নামক দেশ পাওয়া যায়, তাহাতে ত উত্তরদিকে এত দীর্ঘকাল বরফে চলায় সম্ভাবনা নাই ?" তাহাতে লোকনাথ ব্রহ্মচারী বলিলেন, "সাহেবেরা অনুমান করিয়া এ সকল লিখিয়াছেন, তাহা প্রকৃত অবস্থা নহে, আমি সাহেব দিগের নিকট প্রশ্ন করিয়া এরূপ অবগত হইয়াছি।" বস্তুতঃ আমরা শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি, তদ্দ্বারা পাশ্চাত্য দিগের অনুমান রক্ষা পায় না। কিন্তু ব্রহ্মচারীদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তসহ তাহা মিল করা যাইতে পারে।

তাঁহারা উত্তরদিকে চলিতে চলিতে অবশেষে এমন এক স্থানে উপনীত হইলেন যে সেই দেশে সূর্য্য নাই—সুতরাং অন্ধকারময়। তথায় গিয়া আর তাঁহারা চলিতে পারিলেন না। পরিশেষে সে অন্ধকার ভেদ করিয়া যাওয়ার জন্য তাঁহারা তথায় ছাউনী করিয়া বসিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপ করাতে ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে তাঁহাদিগের দৃষ্টিশক্তি খুলিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন 'আমরা সেই দেশে কিয়ৎকাল বাস করিলে পর, আমাদের চক্ষুর তারা পরিবর্ত্তিত হইয়া, বিড়ালের চক্ষু রাত্রিকালে যেরূপ হইয়া থাকে, আমাদের চক্ষুও সেই আকার ধারণ করিল। আমরা তড়িতালোকের ন্যায় নৈশান্ধকারে দর্শন করিবার ক্ষমতা পাইলাম।

* শাস্ত্রোক্ত ভারতবর্ষ, নয়টী দ্বীপের সমষ্টি মাত্র, যথা—ইন্দ্রদ্বীপ কশেরুমান, তাম্রবর্ণ গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বারুণ ও সাগরসংবৃত,—বিষ্ণুপুরাণ ৮

এইরূপে অন্ধকারে দর্শন করার শক্তি পাইয়া, আরও অগ্রসর হইতে লাগিলাম।"

ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, এখানে ছাউনী করিয়া থাকার কালে তাঁহারা অদ্ভুত এক জাতীয় মনুষ্য দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সকল মানব এক বা সোওয়া হাতের অধিক উচ্চ নহে। তাহারা শ্বেতবর্ণ উলঙ্গ দেহে বরফ রাশির উপর বিচরণ করে। তিনি বলিয়াছেন "আমাদের বৃহৎ শরীর দর্শন করিয়া তাহারা প্রথমে ভীত হইয়াছিল। শেষে অনেক দিন আমাদের সৌম্যভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আর আমাদের নিকট হইতে বিপদাশঙ্কা করিত না। তখন আমাদের আহারার্থ কন্দমূল সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিত কিন্তু নিকটে ঘেসিত না। আমরা তাহাদের ভাষা কিছুমাত্র বুঝিতাম না। কিন্তু অনেক সময় তাহাদের কথাবার্ত্তা ও আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি। পরস্পরের ভাষা না জানাতে, আলাপ পরিচয় হইতে পারে নাই। ব্যবহার দেখিয়া স্থির করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে বিবাহাদি সমাজ বন্ধন নাই তাহারা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হইয়া, বিচরণ করে। আমি তাহাদের উচ্চারিত ভাষা বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহাদের উচ্চারিত কয়েকটি শব্দ মুখস্থ করিয়াছিলাম।

ব্রহ্মচারিবাবা এপর্য্যন্ত কহিয়া সেই উচ্চারিত শব্দ কয়টি স্মরণ করিতে যত্ন করিলেন, এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, হাঁ দুইটা শব্দ স্মরণ হইয়াছে, "অম্বাইন্‌" ও "ধোকড়"। এই ধোকড় শব্দটি বঙ্গ ভাষায় "কিছুই না" এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন মাকড় মারিলে ধোকড় হয়, টিকটিকি মারিলে গোবধ হয়। ব্রহ্মচারিবাবা ধোকড় শব্দটী বাঙ্গালাতে যে ভাবে ব্যবহৃত হয় সেই অদ্ভুত মনুষ্যেরা প্রায় সেই অর্থেই প্রয়োগ করে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ধোকড় কথাটি ব্যবহার করিতে

তাহাদের মুখ চক্ষুর যে ভাব লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে ঐরূপ অনুমান হইয়াছিল।

ব্রহ্মচারিত্রয় সূর্য্যোদয় বিহীন সেই ভূমিতে দীর্ঘকাল গমন করিয়াছিলেন। আমি সেই কালের পরিমাণটি স্থির করিবার জন্য অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সূর্য্যোদয়াস্তের দ্বারা তথায় দিবা রাত্রির বিভাগ না থাকাতে, কাল পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন হইয়াছিল। বাবা লোকনাথ আমার প্রশ্ন মতে বলিয়াছিলেন, "দেখিয়াছি, এক সময়ে বরফ গলা সমাপ্ত হইলে, ধীরে ধীরে বরফ জমিয়া পুষ্ট হইতে থাকিত। আমি বরফ গলার সময়কে আমাদের দেশের গ্রীষ্মকাল ও জমিবার সময়কে শীতকাল ধরিয়া লইয়াছি।"

তাঁহার এই কথাগুলি বিশেষ যুক্তিযুক্ত মনে করি। আমি হিমালয়ে ভ্রমণকালে ৺গঙ্গোত্রী, ৺কেদার ও ৺বদরী নারায়ণের যে ভাব লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে বরফ গলা ও বরফ জমাদ্বারা যে এক বৎসর পরিমাণ ধরা যাইতে পারে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তিনি বলিয়াছেন, "সেই অন্ধকার মুলুকে যাতায়াত করিতে প্রায় ২০ বৎসর লাগিয়াছিল, অর্থাৎ কুড়িবার বরফ জমিতে ও বরফ গলিতে দেখা গিয়াছিল, এমন অনুমান হয়।

এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, তাঁহারা প্রায় দশ বৎসর কাল সুমেরু পর্ব্বতের দিকে ইলাবৃতবর্ষে অগ্রসর হইয়াছিলেন ও অন্য দশ বৎসর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ব্যয়িত হইয়াছিল। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এইরূপ সূর্য্যের উদয়াস্ত বিহীন স্থান কোথায় সম্ভব হইতে পারে। পাশ্চাত্যগণ ভূমণ্ডলের যে অবস্থা অনুমান করেন তাহাতে পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রের এক বিন্দু ও দক্ষিণ কেন্দ্রের একটি বিন্দুমাত্র ৬ মাস কাল সূর্য্যোদয় দর্শনে বঞ্চিত থাকিতে পারে। নতুবা সূর্য্যোদয় ও অস্তহীন স্থান পৃথিবীর কুত্রাপি সম্ভবে না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র কর্ত্তা ও সিদ্ধ পুরুষগণের মতে পৃথিবীর অবস্থাদি অন্যরূপ জানা যায়। শাস্ত্র মতে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকাবলী সমন্বিত এই

নভোমণ্ডল যতদূর বিস্তৃত, নিম্নদেশে পৃথিবী মণ্ডল, ততদূর প্রসারিত রহিয়াছে। ভূপৃষ্ঠের আকার একটি ছত্রের উপরিভাগের ন্যায়। মধ্যস্থলে সুমেরু পর্ব্বত মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। উহা ভূপৃষ্ঠের কেন্দ্র স্বরূপ, তথা হইতে লক্ষ যোজন ব্যাস রাখিয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিলে যে স্থান পাওয়া যায় তাহার নাম জম্বু দ্বীপ। জম্বু দ্বীপ একটি সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। আবার সেই সমুদ্রটি একটি ভূমি দ্বারা ঘেরাও, তাহাও অন্য সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এইভাবে সাতটি দ্বীপ ও সাতটি সমুদ্র রচিত আছে। সুমেরু পর্ব্বত সেই সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্রের কেন্দ্র স্বরূপ। সকলের মধ্যবর্ত্তী জম্বূদ্বীপের মধ্যে সুমেরু পর্ব্বত বিদ্যমান। জম্বূদ্বীপ নয়টি বর্ষ দ্বারা বিভক্ত। তাহার সর্ব্ব দক্ষিণ বর্ষের নাম ভারতবর্ষ। "ভারতবর্ষ" বলিতে "হিন্দুস্থান" বা "ইণ্ডিয়া" মনে করিতে হইবে না। ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকগুলি সমুদ্র থাকাতে ভারতবর্ষ নয়টি দ্বীপে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার একটি দ্বীপের নাম "সাগর সংবৃত দ্বীপ"। এই সাগরসংবৃত দ্বীপই অধুনা, এসিয়া আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা নামে বিভক্ত এবং পৃথিবী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

জম্বুদ্বীপের কথিত নয়টি বর্ষের মধ্যে যে বর্ষটি মধ্যস্থানে অবস্থিত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে তাহার নাম "ইলাবৃত বর্ষ।"

শাস্ত্র মতে সূর্য্য অন্যান্য নক্ষত্র সহকারে প্রত্যহ সুমেরু পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, তাহাতে দিবা রাত্রি ঘটীয়া থাকে। ইলাবৃত বর্ষ, সেই সুমেরু পর্ব্বতের নিম্নবর্ত্তী থাকাতে সুমেরু শৃঙ্গদ্বারা আবৃত রহিয়াছে। সেইজন্য ইলাবৃতবর্ষে সূর্য্য দেখা যায় না।

আমাদের কথিত ব্রহ্মচারিগণ সম্ভবতঃ সাগরসংবৃত দ্বীপ অতিক্রম করতঃ অন্য দুই একটি দ্বীপ ছাড়াইয়া ভারতবর্ষের সীমাতিক্রম করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরবর্ত্তী কিম্পুরুষবর্ষ

ও হরিবর্ষ পার হইয়া অবশেষে ইলাবৃত্তবর্ষের অন্ধকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারীরা সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে এমন একস্থানে উপনীত হইলেন যে, তথা হইতে সমভাবে বা উপরের দিকে চলিতে পথ পাইলেন না। তাঁহারা ক্রমশঃ নিম্ন দিকে যাইতে লাগিলেন। এইভাবে বহুদূর চলিয়া তাঁহারা বুঝিলেন, সুমেরু উচ্চস্থান, কিন্তু এই পথ অধোদিকে চলিয়াছে, ইহা হয়ত পাতাল গমনের গর্ত্ত বিশেষ হইবে। তখন তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে স্থান হইতে নিম্নদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন সেই দিকে ফিরিয়া আসিলেন। এবং সুমেরুতে আরোহণ করার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক যত্ন করিয়াও বরফময় ২।৩টি স্তম্ভ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা সেই স্তম্ভের উপর আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকষ্টে তাঁহারা স্তম্ভের শিরোভাগে পৌছিলেন বটে, কিন্তু তথা হইতে সুমেরু প্রাপ্তির কিছুই কিনারা হইল না। তখন ধীরে ধীরে স্তম্ভ হইতে অবতরণ করিলেন। ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, "আমরা স্তম্ভের উপরিভাগে বায়ুর অভিনব ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। সেইখানে বায়ুতে হিল্লোল নাই, তাহা অতি চমৎকারজনক।"

সুমেরুযাত্রী ব্রহ্মচারীর দল এতদূর আসিয়াও সুমেরু পর্ব্বত পাইয়াছিলেন না। তখন তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইয়া যে ভাবে আসিয়া ছিলেন সেইরূপ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে হিতলাল মিশ্র বলিলেন,—"সুমেরু পর্ব্বতে গমন ত ঘটিল না, আমি উদয়াচল দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বদিকে যাইতেছি।"

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও তাঁহার অনুগমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সুতরাং বেণীমাধব ও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিলেন, বুঝা যায়। কিন্তু লোকনাথ ব্রহ্মচারী একথা স্পষ্ট করিয়া আমাকে কিছু বলেন নাই।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া হিতলাল লোকনাথকে বলিলেন, "নিম্নভূমে তোমার কর্ম্ম রহিয়াছে, অতএব আমার সঙ্গে গমন করা তোমার উচিত নহে, প্রত্যাবৃত্ত হও।" লোকনাথ ফিরিলেন। হিতলাল উদয়াচল উদ্দেশে পূর্ব্বাভমুখে চলিতে লাগিলেন। ইহার পরে হিতলালের অদৃষ্টে কি ঘটিল, জানা যায় নাই।

লোকনাথ ও বেণীমাধব, গুরুর কাশীলাভের পর, হিতলালের আশ্রয়ে ছিলেন বলিতে হইবে। কারণ, গুরু ভগবান্ দেহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে হিতলালের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। এখন হিতলাল মিশ্র তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াতে ব্রহ্মচারিদ্বয় অনন্য গতি হইয়া পুনরায় সুমেরুর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা অনেক অনুসন্ধান পাইলেন না। সুতরাং তাঁহাদের দ্বিতীয়বার সুমেরু যাত্রাঘটিল না। ইহাকে বিধি বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি বলা যায়?

কোন্ স্থান হইতে উঁহারা পূর্ব্বদিকে যাত্রা করেন এবং কোথায়ইবা' হিতলালের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অতএব তাহা পাঠক বর্গকে উপহার দিতে পারিলাম না।

লোকনাথের বারদীতে গমন

এই সকল ঘটনার পর, লোকনাথ ও বেণীমাধব বাঙ্গালার পূর্ব্ব দিকস্থ পর্ব্বত হইতে নিম্নভূমিতে অবতীর্ণ হন, এবং কিছুকাল চন্দ্রনাথপাহাড়ে বিশ্রাম করিয়া লোকনাথ ব্রহ্মচারী বারদী গ্রামে আগমন করেন ও বেণীমাধব কামাখ্যাভিমুখে প্রবেশ করেন। এসকল কথা গ্রন্থারম্ভে আমরা উল্লেখ করিয়াছি॥

বারদীতে যে সকল বাজে সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে

১। লোকনাথ ব্রহ্মচারী জাতিস্মর ছিলেন। তিনি এ জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মে যাহা যাহা করিয়াছিলেন তৎসমুদয় স্মরণ করিতে সমর্থ ছিলেন। এমন কি, গত জন্মের মৃত্যু হইতে এ জন্মের ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত যে ভাবে ছিলেন তাহাও স্মরণ ছিল। প্রসবের পর হইতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত শৈশবকালের কথা কিছু মাত্র তাঁহার স্মরণ ছিল না।

"২। তিনি দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ইচ্ছামত কার্য্য সম্পাদন করতঃ পুনরায় দেহেতে আগত হইতেন। তিনি যখন দেহ ছাড়িয়া যাইতেন, তখনও আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন, কিন্তু তখন দেহটা দেয়ালাদিতে ঠেস দিয়া নিদ্রিতবৎ পড়িয়া থাকিত। পার্শ্বস্থ পরিচারকেরা বলিত, "গোসাঞি মরিয়াছেন, কিছুকাল পরেই বাঁচিয়া উঠিবেন।"

এরূপ দেহ হইতে বাহির হওয়ার প্রসঙ্গ তিনি কথার ভাবেও স্বীকার করিয়াছেন। বাহির হইয়া গিয়া কি করিতেন? তৎসম্বন্ধে জানা গিয়াছে,—

(ক) যে সকল ব্যক্তি সেই সময়ে সাধু মহাত্মা বা সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন (যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি) তাহারা বাস্তবিক পক্ষেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানিবার জন্য ব্রহ্মচারিবাবা দেহ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদের ভাব জানিয়া আসিতেন।

(খ) বর্ত্তমান সময়ের প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া, কোন শঙ্কট রোগে

মরনাপন্ন হন। ঢাকাতে এই বিষয়ের টেলিগ্রাম গেলে, গোস্বামী মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ও আমার সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্‌সী বারদীতে গিয়া বাবার চরণে পড়িয়া স্বীয় গুরুর প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারিবাবা পূর্ব্বে না আসিবার দোষ দেখাইয়া আপত্তি করিলেন। শ্যামাচরণ কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলেন, "আমার আয়ু দ্বারা তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিন্।" শ্যামাচরণের গুরুভক্তিতে ব্রহ্মচারিবাবা তুষ্ট ও সদয় হইয়া বলিলেন, "তুমি ঢাকাতে ফিরিয়া যাও, আমি বিজয় কৃষ্ণের নিকট যাইব। আগামী পরশ্ব তোমরা সংবাদ পাইবে।" ইহার পরেও ব্রহ্মচারিবাবার দেহ বারদীতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু অনেক সময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শুশ্রূষাকারীরা ব্রহ্মচারিবাবাকে তাঁহার শিয়রে উপবিষ্ট দেখিত। তাঁহার একজন শিষ্য আমার নিকট বলিয়াছেন—"সেই পীড়াতে গোস্বামী মহাশয়ের এমন অবস্থা ঘটিয়াছে যে, ডাক্তারেরা মৃতজ্ঞানে বাহিরে রাখিতে বলিয়াছেন। বাহির করার পর রোগী পুনর্জীবিত হইয়াছেন। এরূপ ভাব একবার নহে, দুই তিন বার ঘটিয়াছে।" ইহার আভ্যন্তরিক ব্যাপার এই যে, গোস্বামী মহাশয়ের তনুত্যাগ হওয়ার পরক্ষণেই ব্রহ্মচারিবাবা তাঁহাকে পুনরায় পূর্ব্বদেহে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। সেই রুগ্ন দেহে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার যাতনা ভোগ করা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ইচ্ছা না হইলেও ব্রহ্মচারীর বলে তিনি দেহে পুনঃ প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যমযাতনায় অধীর হইয়া পুনর্ব্বার দেহ ত্যাগ ঘটিয়াছে, ব্রহ্মচারী তাহাতেও ক্ষান্ত হন নাই। তিনি পুনরপি গোস্বামীমহাশয়কে দেহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় অল্পদিন পরলোকগত হইয়াছেন, পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় কেহ কেহ এ কথা তাঁহার নিজ মুখেও শুনিয়া থাকিবেন।

(গ) ঢাকা জজ আদালতের উকিল বাবু বিহারীলাল

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রহ্মচারিবাবার আশ্রয় লইয়াছিলেন। কোন সময়ে তিনি স্লুপে চড়িয়া চট্টগ্রাম হইতে আসিতেছিলেন। তখন রেল হয় নাই। পথিমধ্যে ঝটিকা উপস্থিত হইয়া স্লুপখানি আন্দোলিত করতঃ পর্য্যুদস্ত করিবার উপক্রম করে। বিহারীবাবু মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া ব্রহ্মচারিবাবাকে হৃদয়ের সহিত ডাকিয়াছিলেন। তখন হঠাৎ স্লুপখানি স্থির হইল, আরোহীরা আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল। অনেকেই নাকি স্লুপে একখানি অভয় হস্ত দর্শন করিয়াছিল। ঠিক এই সময়ে বাবার নিকট তাঁহার অন্যতম শিষ্য ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু মৌলিক উপবিষ্ট ছিলেন। বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "অনাথ, বিহারী বড়ই বিপন্ন, আমার কৃপা চাহিতেছে। আমি তাহাকে রক্ষা করিতে চলিলাম।" এই বলিয়া কতকক্ষণ সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। কতক সময় পরে বলিলেন, মায়ার কি প্রভাব! বিহারীর জন্য একটু মায়াভিভূত হওয়াতে বিহারী কোথায় আছে প্রথম বারেই ঠিক করিতে পারি নাই। প্রথম ঢাকায় না পাইয়া বাড়ীতে যাই। বাড়ীতেও না পাইয়া জলপথে চট্টগ্রামের রাস্তায় তাহাকে পাইলাম। তাহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া আসিলাম। তাহার সঙ্গে অন্যান্য অনেক লোকও বাঁচিয়া গেল।"

কয়েক মাস পরে, যখন বিহারীবাবু চট্টগ্রাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া বারদীতে উপস্থিত হন, তখন আমি ব্রহ্মচারিবাবার নিকট উপস্থিত ছিলাম। ব্রহ্মচারিবাবা বিহারী বাবুকে দেখিয়া বলিলেন—"কি হে বিহারী! তুমি কি ইহার মধ্যে আমাকে স্মরণ করিয়াছিলে?" বিহারী বাবুর তখন স্লুপে বিপদের কথা স্মরণ হয় নাই। তিনি বলিলেন, "বাড়ীতে আসিয়া আপনার পাদপদ্ম দর্শন করার ইচ্ছা হইয়াছিল বই কি।" বাবা বলিলেন, "তা নয়! জলপথে বিপন্ন হইয়া কখনও মনে করিয়াছিলে কি?" তখন পূর্ব্ব

কথা স্মরণ করিয়া তিনি ব্রহ্মচারিবাবার চরণে নিপতিত হইলেন। এবং সমস্ত বৃত্তান্ত ভক্তি গদ্‌গদস্বরে বিবৃত করিলেন।

(৩) ব্রহ্মচারিবাবা অন্যের রোগ নিজ শরীরে আনিয়া রোগীর রোগ দূর করিতে পারিতেন। আপনি ২।১ দিন ভোগ করিয়াই তাহা শেষ করিয়া দিতেন। আমি তাঁহার এই ক্ষমতা দেখিয়া তাদৃশ রোগগ্রহণকরার সঙ্কেত শিক্ষা করিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, "তোমার কাঁচা শরীর, এ কার্য্যের উপযোগী নহে। এরূপ করিতে গেলে তোমার পিণ্ডপাতের আশঙ্কা আছে।"

(৪) তিনি ইচ্ছমতে অন্যের মনোগত ভাবও বিদিত হইতেন। এমনও প্রকাশ করিয়াছেন যে "তুমি অমুক সময়, অমুক বিষয় চিন্তা করিয়াছ তাহা অতি উত্তম।" জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তুমি আমাদের অন্তরের কথা কিরূপে টের পাও? (বলা বহুল্য যে আমার পরমাত্মীয় ব্রহ্মচারিবাবাকে "তুমি" সম্বোধন করিতাম— "আপনি" বলিতে যেন দূর সম্পর্ক মনে হইত)। ব্রহ্মচারী বলিলেন—"আমি যখন দেহ হইতে আলগ্ হই, তখনই এ সকল জানিতে পারি।" এ আলগ্ হওয়ার অর্থ-দেহ ছাড়িয়া বাহিরে গমন নহে। দেহের মধ্যে দেহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকা। "অশরীরং শরীরেষু" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য দ্বারা এতাদৃশ অবস্থা সম্ভবপর হয়।

আমরা কোন গুরুতর প্রশ্ন করিলে, বাবা যখন চিন্তা একাগ্র করিয়া তাদৃশ অবস্থা আনয়ন করিতে যাইতেন, তখন আমরা বাহ্য লক্ষণে কিছু টের পাইতাম না, আমরা পূর্ব্বের মত আলাপ করিতে থাকিতাম। আমাদের তাদৃশ আলাপ তাঁহার একাগ্রতা বা সমাধির পক্ষে বাধক হইত। তাতেই বলিতেন "আমাকে যদি কথা কহিয়া নীচের দিকে রাখ তবে যে আমি তোমাদের মতই থাকিয়া যাই।"

(৫) তিনি দূর হইতে অন্যকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ ছিলেন।

যখন আমাদের কাহাকে দূর হইতে নিকটে আনয়ন করিতে চাহিতেন, তখন আমাদের অন্তঃকরণ এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিত যে কিছুতেই বারদীতে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না। তথায় গিয়া এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিতেন "আমি তোমায় ডাকিয়াছিলাম।"

এ সকল ভিন্ন ব্রহ্মচারিবাবা এমন কতকগুলি কার্য্য জানা গিয়াছে যে, তাহা কোন্ প্রকার শক্তির কার্য্য সে বিষয় স্থির করা সহজ নহে। দুই একটা উদাহরণ দিয়া পাঠকদিগের সে বিষয়ের কৌতুহল নিবারণ করা যাইতেছে।

(ক) তাঁহার নিকট রাশি রাশি পিপীলিকা উপস্থিত হইত। তিনি তখন পরিচারকদিগকে ডাকিয়া বলিতেন, "ইহাদিগকে কিছু খাইতে দেও।" কখনও বা মুখ নাড়িয়া অস্ফুটস্বরে পিপ্ড়াদিগকে কি বলিতেন, আর তাহারা প্রস্থান করিত।

(খ) এক সময় তাঁহার কৃষিকার্য্য করিতে সখ হইয়াছিল। ভূম্যধিকারীরা তাঁহারা আশ্রিত, অবিলম্বে ক্ষেত্রে চাষ ও ধান্যবপন যথাসময়ে নিষ্পন্ন হইল। চারা সকল পরিণত হইয়া যখন ধান্য প্রসব করিল, তখন পোষিত শূকর সকল ছুটিয়া গিয়া তাহা পয়মাল করিতে লাগিল। তাঁহার আশ্রমস্থ রক্ষিগণ যষ্ঠি সংগ্রহ পূর্ব্বক শূকরদিগকে প্রহার করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিত। ক্ষেত্রে শূকর প্রবেশের শব্দ পাইয়া যষ্ঠি হস্তে যাইয়া দেখিত, তাহাদের আগমনের পূর্ব্বেই বরাহগণ প্রস্থান করিয়াছে। একদিনও তাহাদিগকে ক্ষেত্রে পাইত না—শূকরেরা যেন দূতমুখে প্রহরিদের আগমনের সংবাদ শুনিয়া পলায়ন করিত। আশ্রমবাসীরা ইহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া বিস্মিত হইত এবং আপনারা বলাবলি করিত। ব্রহ্মচারিবাবার একজন পার্শ্বচর ভক্ত এই রহস্য ভেদ করিয়াছিলেন। তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন যে বাবা স্বয়ং আশ্রমে বসিয়া বরাহদিগকে পলায়ন করিতে বলিয়া দেন,

ব্রহ্মচারীবাবার শিষ্য
৺চন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী

রক্ষিরা যখন লাঠি লইয়া তাড়া করার জন্য আশ্রম হইতে বহির্গত হইত, তখন ব্রহ্মচারিবাবা শূকরদিগকে সম্বোধন করিয়া চুপি চুপি বলিতেন, "তোমরা শীঘ্র প্রস্থান কর। তোমাদিগকে মারিতে আসিতেছে।"

(গ) ঢাকা হইতে কয়েকজন শিক্ষিত ভদ্রলোক বাবার আশ্রমে আসিয়া পদব্রজে ঢাকাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপ দর্শনে তাঁহার নানারূপ ইতস্ততঃ করাতে বাবা তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন—"চলিয়া যাও, সূর্য্যোত্তাপ ভুগিতে হইবে না।" তাঁহারা কিয়দ্দুর গিয়া দেখিলেন, একখানা বৃহৎ মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিল। এই ব্যাপারকে ব্রহ্মচারীর আদেশের ফল মনে করিয়া, তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় তাঁহারা আশ্রমে আসিয়া বলিলেন, "প্রভো! আপনার কথা মত মেঘ সূর্য্যকিরণ আচ্ছাদন করিয়া আমাদিগকে ছায়া দান করিয়াছে, কিন্তু আমাদের সন্দিহান চিত্ত ইহাতে তুষ্ট হয় নাই। আমরা জানিতে চাই, আমরা কোন্ স্থানে গেলে মেঘ অপসারিত হইয়া পুনরায় রৌদ্র উঠিবে।" ব্রহ্মচারিবাবা বলিয়াছিলেন, "তোমরা ঢাকা সহরের প্রান্তবর্ত্তী দয়াগঞ্জে উপনীত হইলে পুনরায় রৌদ্র উঠিবে।" বারদী হইতে দয়াগঞ্জ ৮।১০ ক্রোশ ব্যবহিত। তাঁহারা এই পথ অতিক্রম করিয়া ঠিক্ দয়াগঞ্জে উত্তীর্ণ হইবামাত্র খরতর সূর্য্যতাপ প্রকাশিত হইল। তদ্দর্শনে কয়েকটী বাবু বাসস্থানে না গিয়া আবার বারদিতে আসিয়া মহাত্মার চরণে পতিত হইলেন।

৬। একটী ভদ্রলোকের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, যে গুরুদত্ত মন্ত্রে অশুদ্ধতা রহিয়াছে। তিনি ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে ইহার মীমাংসা জানিয়া লইতে সংকল্প করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করেন। আগন্তুক তথায় গিয়া কিছু না বলিয়া দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে বাবা আপনা হইতে বলিতে লাগিলেন, "গুরুদত্ত মন্ত্রের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করা শিষ্যের কর্ম্ম নহে, গুরু যাহা বলিয়াছেন,

কোন দ্বিধা না করিয়া তাহা জপ করিয়া যাওয়াই শিষ্যের কর্ত্তব্য"।

অন্যের মনোগত কথা বলার শক্তি অনেকেরই থাকিতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মচারিবাবা যেমন প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়া বলিয়া দিতেন অন্যেরা তেমন ভাবে বলিতে পারেন না। তাঁহার মনে যেমন উঠে তেমন বলিয়া ফেলে। বোধ হয় বাবাকে লক্ষ্য করিয়া যে যাহা মনে করিত তিনি তাহা টের পাইয়া তাহাদের সহিত তেমন ব্যবহার করিতেন। অন্যেরা কি ভাবে বলে তাহার একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ফৈজাবাদে নন্দগোপাল নামক আমার কোন ভক্ত ব্যক্তি আমার নিকট উপনীত হইলে আমি অন্যমনস্ক ভাবে কয়েকটা কথা বলিয়া ফেলিলাম। তাহাতে সে বিস্মিত হইয়া বলিল "আপনি কি সর্ব্বজ্ঞ! আমি এই কথাটী জানিবার জন্যই বাড়ী হইতে অন্যের সহ তর্ক করিয়া আসিয়াছি।" ব্রহ্মচারী যেমন শরীর হইতে আলগ্ হইয়া জানিতেন এসব জানা সেই শ্রেণীর নহে।

৭। কলিকাতা নিবাসী কোনও বড় ঘরের এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। আমি তাহাদের সম্মান ও সম্পত্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়া, ব্রহ্মচারিবাবার সহিত আলাপ করাইতে যত্ন করিলাম। ব্রহ্মচারিবাবা কিছু কাল চিন্তা করিয়া সেই আগন্তুক ভদ্র লোককে বলিলেন, "তোমরা এখন ভাড়াটীয়া বাড়ীতে থাকিতেছ?" বারদীতে বসিয়া তিনি কলিকাতার একটী বড় ঘরের ব্যক্তিরা যে পৈতৃক ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া ভাড়াটীয়া বাড়ীতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন, এত দূর পর্য্যন্ত অবগত হইলেন দেখিয়া (আমিও তাঁহাদের ভাড়াটীয়া বাড়ীতে থাকার কথা জানিতাম না) সেই আগন্তুক ভদ্রলোক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "হাঁ মহাশয়! অনেক পাকচক্রে পড়িয়া নিজ হিস্যার বাড়ী ছাড়িয়া এখন ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই আছি।"

৮। এক ব্যক্তি জাল করার অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত হন। তিনি অপরাধ অস্বীকার করেন। এদিকে

বারদীতে আসিয়া ব্রহ্মচারীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনার নির্দ্দোষিতা প্রকাশ করেন। মহাপুরুষ অভয় দিয়া বলিলেন, "তুমি মুক্তিলাভ করিবে।" অভিযুক্ত ব্যক্তি তচ্ছ্রবণে হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারীর একজন সেবক অভিযুক্তকে দোষী বলিয়া অবগত ছিলেন। তিনি দেখিলেন, এই লোকটা সাধুকে ফাঁকি দিয়া অভয় বাণী লইয়া যাইতেছে। এই ব্যবহার তাহার নিকট অসহনীয় বোধ হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যাক্তিকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "মহাশয়। আপনি সাধুর নিকট যেমন ব্যবহার করিলেন তেমন ফল পাইতে পারেন, অধিক প্রত্যাশা করিতে পারেন না। আপনি যদি নিজে দোষী হইয়া সাধুর নিকট আপনাকে নির্দ্দোষ প্রতিপাদন করিয়া অভয় বাণী আদায় করেন, তাহা হইলে সাধুর প্রদত্ত অভয়বাণীরও উল্টিয়া সভয় বাণীতে পরিণত হইতে পারে নাকি? আপনি যদি মিথ্যা কহিয়া অভয়বাণী গ্রহণ করেন, তবে সাধুর কথিত কথাও আপনার আচরণে মিথ্যা হইতে পারে।"

অভিযুক্ত ব্যক্তি এই কথায় চকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন সাধারণ লোকের নিকট প্রতারণা করিয়া পার পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সাধুকে ঠকাইতে গেলে নিজেই ঠকিতে হয়। তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গিয়া পুনরায় ব্রহ্মচারীর চরণে পড়িলেন। বলিলেন, "আমি অপরাধী ত আছিই, আপনার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়া, সে অপরাধের মাত্রা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছি। এক্ষণে অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমায় রক্ষা করুন।" বাবা বলিলেন, 'যদি যথার্থই আমার শরণাপন্ন হইয়া থাক, তবে আমি যাহা বলি সেরূপ করিতে পার কি?" অপরাধী বলিল, "অবশ্য পারিব।" ব্রহ্মচারী পুনরায় বলিলেন, "যাও বিচারকের নিকটে গিয়া সম্মুখে দোষ স্বীকার পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত কর, আমি যে বলিয়াছি মুক্তিলাভ করিবে সে কথার অন্যথা হইবে না।" অভিযুক্ত

ব্যক্তি তাহাই করিলেন। বিচারের দিনে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া ফেলিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ভাবিলেন লোকটা ভয় বা প্রলোভন প্রযুক্ত এখন অপরাধ স্বীকার করিতেছে, নথীস্থ প্রমাণের সহিত কিন্তু ঐক্য হইতেছে না।” এজন্য অভিযুক্তের মোক্তার দিগের প্রতি কিছু ইঙ্গিত করিলেন। মোক্তারেরা আসামীকে অপরাধ অস্বীকার জন্য উপদেপ বা অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আসামী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, “আমি দোষী শেষ পর্য্যন্ত আমার দোষ আমি স্বমুখে স্বীকার করিব।” ম্যাজিষ্ট্রেট আর কি করেন? অগত্যা অভিযুক্তকে দায়রায় সোপরর্দ্দ করিতে বাধ্য হইলেন। আসামী সেশনে গিয়াও সেই কথা বলিতে লাগিলেন, “আমি দোষী।”

জুরিগণও ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় আসামী নির্দ্দোষ, কেবল ভয় বা প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া অপরাধ স্বীকার করিতেছে, স্থির করিলেন। সেশন্ জজ জুরীর সহিত একমত হইতে না পারিয়া মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাইলেন। হাইকোর্টের বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া বারদীতে আসিয়া, ব্রহ্মচারিবাবার পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া যখন আপনাকে বিকাইতেছেন, তখন আমি বারদীতে উপস্থিত হইয়া এই সকল ব্যাপার অবগত হইলাম।

৯। বারদীতে এক ব্যক্তির পদদেশে সর্পে দংশন করে। বিষ প্রবল হইয়া অন্যান্য অঙ্গ ছাইয়া উঠিতে থাকে; ওঝা, বৈদ্য আনিয়া বিষ নামাইবার যত্ন চলিল। এ দিকে আরোগ্য হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রহ্মচারীকে কিছু পূজা দেওয়ার মানস করা হইল। ক্রমে বিষ নামিয়া আসিল, রোগী আরোগ্য লাভ করিল। তখন রোগীর আত্মীয়েরা মনে করিল, চিকিৎসার গুণে বিষ নামিয়াছে। ব্রহ্মচারীর কৃপায় নহে; অতএব পূজা দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। এইভাবে ব্রহ্মচারীর জন্য মানসিক পূজা দেওয়ার সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সকলে নিশ্চিন্ত আছে। বৎসরৈক কাল পরে, সেই সর্প

দষ্ট ব্যক্তি প্রয়োজন উপলক্ষে কিছু দূরে গিয়াছিল; ফিরিয়া বাড়ী আসিবার কালে, অকস্মাৎ সেই শুষ্ক ক্ষত স্থানে বেদনা হইয়া, বিষ পূর্ব্বানুরূপ পরাক্রম সহকারে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ধরিল; রোগী ছট্‌ফট্ করিয়া পড়িয়া গেল। বাড়ীনে সংবাদ আসিলে আত্মীয় স্বজনগণ তাহাকে গৃহে আনয়ন করিল। হঠাৎ এই বিপদ্দর্শনে সকলে অধীর হইল; তখন বাবার আশ্রমে আসিয়া নালিশ করিল। তাহার পরে বিশিষ্ট ভাবে পূজা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে। ব্রহ্মচারিবাবা কিন্তু এই বিষয়ের কিছুই পূর্ব্বে জানিতেন না। এই ঘটনা বাবার নিত্যসেবাইত ৺জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন।

বারদীতে লৌকিক ব্যবহার

বা

মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম

দেহের সংশ্রবে যে সকল ব্যাপার ঘটে, লোকনাথ তাহাই সাধারণতঃ কর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। ইহার নাম প্রারব্ধ কর্ম্ম। ইহা তিন ভাবে সাধিত হয়; যথা—ইচ্ছা, পরেচ্ছা ও অনিচ্ছা। চোর ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া চুরি করে, পরের (ম্যাজিষ্ট্রেটের) ইচ্ছা দ্বারা বেত্রাঘাত নামক প্রারব্ধ কর্ম্ম, তাহার শরীরের সংশ্রবে আসে; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সিঁড়ি হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গেন ইহা চোরের চুরি করার ন্যায় ইচ্ছাকৃত প্রারব্ধ নয়, চোরের বেত্রদণ্ড ভোগের ন্যায় পরেচ্ছা কৃতও নহে—ইহাকে (কাহার ইচ্ছা দ্বারা সাধিত হয় না বলিয়া) অনিচ্ছা-কৃত-প্রারব্ধ-কর্ম্ম বুঝিতে হইবে।

সাধারণ লোকেরা এই সকল কর্ম্মকে এক হিসাবে দেখে, লোকনাথ প্রভৃতি মুক্ত পুরুষেরা সেই ইচ্ছা পরেচ্ছা ও অনিচ্ছার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবল কোন ব্যাপারের সহিত শরীরের অভিনয় ঘটিতেছে, সেই দিকে খেয়াল রাখিয়া থাকেন। "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" অর্থাৎ মুক্ত পুরুষেরা কর্ম্ম অকর্ম্ম দেখেন।

এক সময়ে ব্রহ্মচারিবাবাকে নৌকাতে করিয়া ঢাকার বুড়ীগঙ্গার ঘাটে আনা হইয়াছিল। রাত্রি অধিক হইয়াছে, বাবা নৌকার ভিতরে; অন্যেরা সম্মুখের দিকে বাহিরে উপবিষ্ট থাকিয়া বিবিধ আলাপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক চোর বাহির হইতে ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া দ্রব্যানুসন্ধান করিতে লাগিল। বাবা টের পাইলেন; তখন তাঁহার গায়ের বালাপোষ খানা (যাহা উত্তম গরদের বস্ত্রদ্বারা প্রস্তুত করিয়া কোন ভক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে উপহার দিয়াছিল) কিছু দূরে ছিল; তিনি দেখিলেন, এখানা যতদিন দোকানদারের নিকট থাকিবার বিষয় ছিল ততদিন সে রাখিয়াছে, তাহার পরে দাতা কিনিয়া আনিয়া রক্ষা করিল; তৎপরে আমার শরীর সংশ্রবে আসিয়াছিল; এখন যাহার নিকট থাকার সময় হইয়াছে, সে চোর রূপে ইহা লইতে আসিয়াছে, তবে আর বিলম্ব হয় কেন? এই ভাবিয়া ভক্তদিগকে কথা দ্বারা আকৃষ্ট রাখিয়া, নিজে চুপি চুপি পিছনের দিকে হাত বাড়াইয়া, বালাপোষখানা টানিয়া চোরের হাতের দিকে দিতে লাগিলেন। চোর তাঁহার সাহায্যে উহা হাতে পাইয়া, সানন্দে গ্রহণ করিয়া বিদায় হইল। চোর হয়ত মনে করিয়াছিল এই বৃদ্ধ আমাদের দলের একজন হইবে।

লোকনাথের নিত্য সেবক বারদী নিবাসী স্বর্গীয় জানকীনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট এই ঘটনা অবগত হইয়াছি; কিন্তু ব্রহ্মচারিবাবার মনোগত ভাব চিত্র করা আমার কার্য্য। তাহা ঠিক হইয়াছে কিনা, সে বিষয়ে আমার সমক্ষে সংঘটিত অন্য বৃত্তান্ত বলিতেছি।

এক সময়ে দেখিয়াছি ব্রহ্মচারিবাবার আশ্রমে কতকগুলি মেটে

পুতুল রহিয়াছে; কোন ভক্ত কুম্ভকার স্বহস্ত নির্ম্মিত ঐ সকল পুতুল উপহার দিয়াছিল। বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর শ্রীধর নামক চেলা আসিয়া ব্রহ্মচারিবাবার নিকটে আবদার করিয়া উহার একটা পুতুল লইতে চাহিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন "দিবনা"। শ্রীধর ও নাছোড়বন্দা; সে তিন চারি ঘণ্টাকাল উহা লইবার জন্য যতই পীড়াপীড়ি করে, ব্রহ্মচারিবাবা ততই নিষেধ করিতেছিলেন। আমি এই ভাবে অনর্থক সময় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মচারিবাবাকে বলিলাম, "তুমি দুই তিন পয়সার একটা পুতুলের জন্য এত নিষেধ করিতেছ কেন? পুতুলটা দিয়ে দেও আমরা ভাল আলাপ করি।" তিনি নিভৃতে খুলিয়া বলিলেন,—"আমার দেওয়ার অধিকার কি? আশ্রমটি জমিদারের জায়গা; কুম্ভকার তাহাতে পুতুল কয়টি রাখিয়া গিয়াছে। আমি কিরূপে দেই? যাহার নিতে হইবে, সে আসিয়া নিয়া যাইবে। শ্রীধর যখন সেরূপ না করিয়া আমার নিকট চাহিতেছে তখন ইহা তাহার নহে; তাহাকে দেই কিরূপে?"

এক সময়ে আশ্রমে কোন খাদ্য উপহার আসিয়াছিল। আমি তাহা খাইতে চাহিয়াছিলাম। বাবা আমাকে খাইতে নিষেধ করিলেন। পরে বুঝাইয়া বলিলেন, "উহা যদি তোমার খাদ্য হইত তবে তুমি জিজ্ঞাসা না করিয়াই খাইতে।"

আবার দেখিয়াছি তাঁহার নিকটে কেহ দুই কি আড়াই সের মিছরি উপহার রাখিয়া গেল। কিছুকাল পরে এক ষাড় আসিয়া তাহা খাইতে লাগিল। উপস্থিত এক ব্যক্তি ষাড়কে তাড়া করিলে ব্রহ্মচারিবাবা বলিলেন "তুমি উহাকে বাধা দেও কেন?" ষাড় মনের সাধে মিছরি খাইয়া, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিয়া প্রস্থান করিল।

(৫) ব্রহ্মচারিবাবার নিকট পূজা, ভেট, উপহার বা নজর বলিয়া যে সকল অর্থ বা দ্রব্য আসিত, তাহা ঐ ভাবে বারভূতে বাটিয়া খাইত দেখিয়া সাধারণ লোকে কিছু স্থির করিতে পারিত না।

একটি ছেলের জন্ম উপলক্ষে ব্রহ্মচারিবাবার নিকট বোধহয় ৫৲ টাকার পূজা মানসিক ছিল। ছেলের অভিভাবকেরা হরিভক্ত বৈষ্ণব তাহারা পূজা দিতে আসিয়া ভাবিল, আশ্রমে নগদ টাকা বা খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিলে যাহার খুসী উঠাইয়া লইবে বা খাইয়া ফেলিবে। তাহাদের পূজাটা এই ভাবে ষাড় কুকুরাদির উদরস্থ হওয়া তাহাদের বাঞ্ছনীয় না হওয়াতে তাহারা স্থির করিল, আশ্রমে হরির লুঠ দ্বারা পূজা শেষ করিলে ব্রহ্মচারিবাবার পূজা এবং হরিসন্তোষ ও ভক্তসেবা তিনই হইবে। এইরূপ মনে করিয়া আশ্রমে হরির লুঠ দেওয়ার জন্য বাবার অনুমতি চাহিল। বাবা উহাদের দুর্ব্বদ্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অনেক পীড়াপীড়িতে বলিলেন, "হরিরলুঠ দিবে অন্যত্র দেও, আমার এখানে নয়।" ব্রহ্মচারিবাবা তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়াই এইরূপ বলিতেছিলেন। তাহারাও ব্রহ্মচারিবাবার অনুমতি ভিন্ন মানসিক শোধ হইবে না জানিত; কাজেই অনুমতি পাওয়ার জন্য অনেকক্ষণ ধরিয়া বাদ বিতণ্ডা হইতে লাগিল। আমি উভয়ের ভাব না বুঝিয়া মীমাংসা করিতে গেলাম। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তোমরা এখানে আসিয়াছ কেন?" পূজা দাতা বলিল, "আমাদের মানস শোধ করিতে আসিয়াছি।"

ব্রহ্মচারী। "পূজা আপন গৃহে না দিয়া এখানে দিবে কেন?"

পূজাদাতারা। "এখানে পূজা দেওয়ার মানস ছিল।"

ব্রহ্মচারী। "তবে এখানে দাও।"

পূজাদাতারা। "তবে এখানে হরির লুঠ দেই?"

ব্রহ্মচারী। "এখানে হরির লুঠ দেওয়া মানস থাকে ত, দেও।"

এবার তাহারা সমস্যায় পড়িয়া বলিল, "আপনি ও হরিত একই, হরিরলুট দিলেই আপনি পাইবেন।" ব্রহ্মচারী দেখিলেন এত কথার পরেও, তাহাদের মুখ দিয়া সরল সত্যকথা বাহির

করিতে পারিলেন না; তখন বিরক্তির ভাবে বলিলেন, "তোদের হরির মুখে মুতি, আমার নিকট মানস থাকিলে এখানে পূজা দিয়া যাইতে হইবে।' তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মচারীর পূজায় মানসিক তথায় রাখিয়া পৃথকরূপে হরির লুঠ দিতে বাধ্য হইল।

ব্রহ্মচারিবাবা হিন্দু হইয়া হরির মুখে মুতি বলিলেন, এ কথায় অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। শেষে তিনি আপনার ভাব বুঝাইয়া দিতে ত্রুটী করিলেন না। আমি বুঝিলাম সাধারণের হিসাবে হরির মুখ এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত। ব্রহ্মচারী জানিতেন—"সর্ব্বতোহক্ষি শিরোমুখম্" সর্ব্বত্রই হরির মুখ বিদ্যমান; প্রস্রাব করার স্থানে কি হরির মুখ নাই? তাই তিনি একথা বলিতে পারেন। সেই আগন্তুকেরা মুখে বলিল, "সকলই হরি সুতরাং ব্রহ্মচারীকে দেওয়া ও হরিকে দেওয়া একই কথা।" ব্রহ্মচারী হরির মুখে মুতি বলিয়া বুঝাইলেন যে "এইরূপ কথায় যখন তোমরা ব্যথা পাও তখন তোমরা সকলেই হরি, এই কথা বলিবার অধিকারী হও নাই। তাহা হইলে তুষ্ট হইয়া বলিতে, যখন হরি সর্ব্বত্র বিরাজিত, তখন আপনার মূত্রও হরি, মূত্রের স্থানও হরি; তথায়ও হরির মুখ রহিয়াছে। হরির মুখ ভিন্ন মুতিবেন কোথায়? এরূপ বলিবার অধিকারী হইলে বলিতে পারিতে, আপনি ও হরি এক।" ফলকথা, লোকনাথ তাহাদের অন্তরের কথা বুঝিয়াছিলেন, তাহারা মনে করিত, আশ্রমে পূজা পাঠাইলে তাহা অপাত্রে যায়। সিদ্ধ পুরুষ যে বুদ্ধিতে আশ্রমাগত খাদ্যাদি ষাঁড় কুকুর কি অন্য যাহাকে তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন ইহার ভাব কয়জন লোকে বুঝিতে পারে?

(৬) আসলের নকল সকল বিষয়েই হইতে পারে। নকল হীরা, ক্যামিক্যাল গহনা, জাল জলীল, মেকি টাকা, উপাধিপ্রাপ্ত রাজা মহারাজা, নবাব, মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি; গঠিতোপাধি স্বামী, মহর্ষি, পরমহংস প্রভৃতি সকলই যখন কৃত্রিম হইতে পারিল,

তবে সর্ব্বানন্দ, পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দের দেবী দর্শন, কাপালিকের সংহারভৈরব দর্শন প্রভৃতি সিদ্ধিরই বা জাল না হয় কেন? এখানে তাহার একটু প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ব্রহ্মচারিবাবার নিকট গতিবিধি ছিল। গোস্বামী মহাশয় তৎকালে ব্রাহ্মদল ছাড়িয়া ঢাকায় শিক্ষিতদিগকে যোগশিক্ষা দিতে ছিলেন। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজগৃহের উত্তরদিগ্বর্ত্তী গৃহে, তখন বাবুরা বিবিধ মুখভঙ্গী ও নানাপ্রকার গলধ্বনি করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেন; কয়েকজন ভাল ভাল লোকের অল্পেই যোগসিদ্ধি হইল। তাঁহারা দেবতা দর্শনে কৃতকার্য্য হইলেন। তন্মধ্যে বিহারীবাবুর * শ্বেত গণেশ সিদ্ধি হইল। তিনি বলিয়াছেন, স্মরণ করিলেই শ্বেতবর্ণের গণেশ মূর্ত্তি আকাশপথে আসিয়া অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাঁহাকে দর্শন দিতেন। এইরূপ অন্যেরা অন্যান্য দেবতায় দর্শন পাইলেন। তখন আপনাদের সিদ্ধির কথা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল; তাঁহারা জন্ম সফল হইয়াছে ভাবিয়া কতই আহ্লাদিত হইলেন, এ কথা অন্যেরা কি বুঝিবে? শেষে বারদীর ব্রহ্মচারিবাবার সিদ্ধির সহিত আপন আপন সিদ্ধির যাচাই করিয়া দেখা উচিত স্থির করিয়া, যে কয়জন সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা বারদী যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতির পূর্ব্বেই লোকনাথ তাঁহাদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা আশ্রমে আসিয়াই ব্রহ্মচারিবাবাকে আসন হইতে উঠাইয়া চুপিচুপি কিছু বলিতে চাহিলেন। ব্রহ্মচারীকে আসন হইতে উঠাইয়া কথা বলিতে অন্যেরা সাধারণতঃ

* বিক্রমপুর ইছাপুরাবাসী বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল। ঢাকা জজকোর্টে ওকালতী করিতেন। ধর্ম্ম পিপাসার বৃদ্ধির সঙ্গে ওকালতী ছাড়িয়া শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। শেষে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের শিক্ষকতা হইতে অবসর লইয়া কাশীতে গিয়া দণ্ডী হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষাতে ভাল শিক্ষিত ছিলেন। আমার সহিত তাঁহার বেশ বন্ধুতা ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি ব্রহ্মচারিবাবার শরণ নিয়াছিলেন।

ভরসা না পাইলেও সেই সকল শিক্ষিতেরা তখন আপনাদিগকে লোকনাথের ন্যায় সিদ্ধ বলিয়া জানিতেন, সুতরাং সমকক্ষ ব্যক্তির প্রতি বন্ধুভাবে ওরূপ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। অন্যান্য শিক্ষিতেরা প্রাচীনকালের যোগ, জ্ঞান প্রভৃতিকে অসভ্যতা বলিয়া উড়াইয়া দেন, ইহারা কলেজ হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়া যে দয়া করিয়া মূর্খ দিগের অনুষ্ঠিত যোগ সাধন করিতে গিয়াছিলেন, ইহাই লোকনাথের চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য বলিতে হইবে। নব্য শিক্ষিতেরা যে ধাতুর মনুষ্য লোকনাথ তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। "তোমাদের ঈদৃশ সিদ্ধি, দেবতা দর্শন কিছুই নয়, ফাকিবাজি মাত্র" এরূপ কথা বলিলে কি কেহ তাহা মানিতেন? এজন্য উহারা আপনা হইতে যাহাতে উক্তরূপ দেবতা দর্শনের অলীকত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন ব্রহ্মচারী সেই চেষ্টা করিলেন।

হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশের প্রণালী এইরূপই বটে। উপদেষ্টা বিপরীত অভিনয় দ্বারা প্রকৃত ভাবটা শিষ্যদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। যাহারা বিপরীত ভাব গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদিগকে সোজাভাবে উপদেশ দিয়া ফিরাইতে পারা যায় না: ঠেকাইয়া শিখাইতে হয়। বিশেষ মেধাবী না হইলে সরল সত্য কথা ধরিতে পারে না। সাধারণ বুদ্ধির লোকদিগকে ঠেকাইয়া শিখানই প্রশস্ত উপায়। এইজন্য বক্তৃতা দিয়া হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না। বক্তৃতাদ্বারা শ্রোতাদের বিকাশোন্মুখ রুচির উদ্দীপন করা যাইতে পারে, হৃদয়ে সৎসংস্কার উৎপাদন করা যায় না, ঠেকিয়া যখন নিজের ভ্রম নিজে বুঝতে পারে, তখনই যথার্থ ভাব গ্রহণে সমর্থ হয়। ব্রহ্মচারী প্রথমে এমন অভিনয় করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা বেশ বুঝিলেন হিন্দুদিগের সিদ্ধ পুরুষেরা এতাদৃশ দর্শন লাভের জন্যই গিরিগহ্বরে তপস্যা করিয়া থাকেন, তাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষাতে মার্জ্জিত বুদ্ধি হওয়াতেই এত সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন। লোকনাথ বাবুদের

উৎসাহ বাড়াইয়া তাঁহাদের মধ্যে চৈতন্য সঞ্চার করার জন্য অমনি আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে গেলেন এবং শুনিয়াই তাঁহাদের প্রত্যেককে কোলদিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। বাবুরা একেই সিদ্ধ হইয়া ধরাকে সরা দেখিতেছিলেন, এখন মহামান্য ব্রহ্মচারিদ্বারা যথেষ্ট সম্মানিত হইয়া সশরীরে স্বর্গ বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন বুঝিলেন বারদীর ব্রহ্মচারীরন্যায় হইতে আর বড় বাকী নাই। অনেক কথাবার্ত্তার পরে বিদায় হওয়ার সময়ে তাহারা বলিলেন—"দেবতা যে কথা কহিতেছেন না, ইহার কি হইবে? ব্রহ্মচারী—"সেদিন দেখা দিলেন, আজই কথা কহিবেন? অপেক্ষা করিয়া থাক; কথা না কহিয়া যাইবেন কোথায়? নব্য সিদ্ধেরা বলিলেন, "কতদিন পরীক্ষা করিতে হইবে ও কি করিতে হইবে?"

লোকনাথ ২।৩ মাস সময় দিয়া কতকগুলি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। নব্য সিদ্ধগণ সেই অনুষ্ঠানসহ নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত করিলেন, তথাপি দেবতা কথা কহিলেন না। তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পুনরায় বারদীতে গেলেন, লোকনাথ আরও দুই এক বার বাবুদিগকে এইরূপ ঘুরাইলেন। শেষবারে বাবুদের সন্দেহ আসিল, ইহার ভিতরে কিছু গোময় আছে, এবং ব্রহ্মচারীকে তাহা ভাঙ্গিয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন। লোকনাথ বলিলেম "যদি প্রতিজ্ঞা কর যাহাকে যে বৃত্তি দিয়া থাক, তাহা উচ্ছেদ করিবে না, তবে বলিব।" তাহারা দায়ে পড়িয়া অঙ্গিকার করিলেন। লোকনাথও উহার ভাব বুঝাইয়া দিলেন। ইহার পর হইতে উক্ত সিদ্ধি লইয়া বড় নাড়াচাড়া হইত না।

আমি এই বিষয়টি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেই নব্যসিদ্ধদিগের মধ্যে একজনকে (তিনি আমার বিশেষ বন্ধু) এই ব্যাপারটি ভাঙ্গিয়া বলার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম; তিনি বলিলেন—আমি কালী মূর্ত্তি দেখিতাম, কল্পনা করিলে এখনও দেখিতে পারি।

উহা মস্তিষ্কের এক প্রকার বিকার হইতে উৎপন্ন; চাহিলে জলে, স্থলে, আকাশে বৃক্ষপত্রে সর্ব্বত্রই ঐ মূর্ত্তি দেখা যায়। যদি ব্রহ্মচারিবাবা আমাদিগকে তাদৃশ দর্শন হইতে রক্ষা না করিতেন, তবে আমরা এত দিনে নিশ্চয় পাগল বনিতাম; এবং আমাদের মস্তিষ্কের সেই বিকার কিছুতেই সারিবার সম্ভাবনা ছিল না।" পাঠকদিগের মধ্যে যাহাদের এই বিষয়টি জানিবার কৌতূহল হয়, তাহারা ঢাকাতে আসিয়া বাবার ভক্তদিগের নিকট সেই সকল বাবুদিগের অনুসন্ধান করিতে পারেন।

(৭) নব্যেরা দেবতার অস্তিত্ব, দেবদর্শনাদি এক কালে মিথ্যা মনে করিয়া থাকেন। নিজেদের জ্ঞানের বাহিরকার কিছু দেখিতে পাইলেই তাহা ঈশ্বরের বিশেষ আবির্ভাব (Incarnation) মনে করিয়া মুগ্ধ হয়েন। এতদুপলক্ষে স্বার্থমূলক ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকল প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আজিকালিকার লোকের নিকট ভাল দেবতাদিগের প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নাই, অপদেবতারাই নব্য শিক্ষিতদিগের নিকট অমানুষিক কোন ভাব দেখাইয়া বঞ্চনা করে। তন্ত্রমতে সিদ্ধিলাভ করিতে গেলে, ইহারাই নানাবিধ প্রলোভন ও বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক বঞ্চনা করিয়া থাকে। নব্যেরা যদি দেবতা ও অপদেবতার তত্ত্ব উচিত মতে অনুসন্ধান করেন, তবে আমাদের এ সকল কথার ভাব বুঝিতে পারিবেন। শাস্ত্র মতে আমাদের প্রত্যেকটী ব্যাপার বিশেষ বিশেষ দেবতা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। আমরা যে চক্ষুর পলক দেই তাহাও "নিমি" নামক দেবতা দ্বারা সাধিত হয়, এজন্য উহার নাম নিমিষ। সেই দেবতত্ত্বের সহিত পরকালের বিশেষ যোগ রহিয়াছে। নব্যদিকের বিদ্যা, বুদ্ধি, জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। "আমি কেন জন্মিয়াছি, মরণের পরে আমার কি দশা হইবে?" এই দিকে চিন্তা করিতে নব্যদিগের বুদ্ধি অগ্রসর হয় না। ভাই! তোমরা বাহ্য চাক্‌চিক্যময় নব্যসভ্যতার যতই পক্ষপাতী হওনা

কেন, তোমাদের মত অপরিণামদর্শী লোকসমাজ গত চল্লিশ লক্ষ বৎসরের মধ্যে আর জন্মে নাই। তাহার পূর্ব্বে ২৭শ কলিযুগে অবশ্য জন্মিয়াছিল।

নব্যদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধিতে এত কথা বলিতেছি না; কিছু তীব্র কথা শুনিয়া নব্যেরা আপনাদের শিক্ষার ব্যাপার খানা তলাইয়া দেখেন, ইহাই আমাদের অভিপ্রায়। আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি,—তাই বলিতেছি, আমাদের মত ঠেকিয়া শিখিবে কেন? শুনিয়াই শুধ্‌রাইয়া লও। আমরা ও যৌবনে নব্য শিক্ষার বেশী পক্ষপাতী ছিলাম। শিক্ষাটা আমাদের মজ্জাগত হইয়া ছিল না, তাহাতেই বাঁচিয়া গিয়াছি; এক্ষনে তোমাদের জন্যই ভাবনা। এক জনকে ঠকিতে দেখিয়া যাহারা সতর্ক হয়, তাহারাই বুদ্ধিমান্।

ব্রহ্মচারিবাবার নিকট একজন স্কুল মাষ্টার হাজির থাকিতেন; লোকনাথ তাহাকে 'কাকা' বলিতেন। আমার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা হইলে, মাষ্টার বাবু গোসাঞীর মনস্তুষ্টির জন্য আমাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিতেন। মাষ্টার বাবুর ঈদৃশ ব্যবহারে আমি এক সময়ে বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মচারীকে তাদৃশ মনুষ্য নিকটে রাখার দরুণ অনুযোগ করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন—"ইহাদিগকে কিছু বলিও না, ইহারা আমার গুরু, আমি ইহাদিগের নিকট শিক্ষা করি; বেকুবের নিকট আকুব শিখিতে হয়। ইহারা বেকুবি করিয়া ঠেকে, আমি তখন শিখি, এরূপ বেকুবি করিতে নাই।"

(৮) ঢাকা জেলায় মুড়া পাড়ার জমিদারদিগের একটি গুরুতর মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার জয় পরাজয় দ্বারা জমিদারির অত্যধিক পরিমাণের লাভ লোকসান্ হওয়ার কথা ছিল। জমিদার দেখিলেন, ভূত-ভবিষ্যদ্বেত্তা বারদীর ব্রহ্মচারিবাবার নিকটে গিয়া মোকদ্দমার পরিণাম স্থির করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। জমিদারেরা মামলা মোকদ্দমাতে উকিল, আমলা ও পুলিশকে হাতে রাখার জন্য অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত; সাধুর আশ্রমে

একটা পয়সা পাঠানই অপব্যয় মনে করেন। তাহাতেই এত বড় একটা ব্যাপার সাধন করার জন্য সামান্য একটা পাইক বারদীর আশ্রমে প্রেরিত হইল। লোকনাথ আকর্ণ-বিস্তৃত-নয়ন-যুগল স্থির করতঃ দৃষ্টিকে বিপরীত দিকে প্রেরণ করিলেন। চক্ষু বিস্ফারিত রহিল, অথচ জগতের কোন বস্তুতে তাঁহার লক্ষ্য নাই। (দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনম্)। তিনি আত্মসত্তাবলম্বনে জগতের বিজ্ঞাতা হইয়া দেহ হইতে পৃথক্ রহিলেন। তখন মুড়াপাড়ার জমিদারের অন্তরের ভাব ও জিজ্ঞাসিত মোকদ্দমার পরিণাম তাঁহার অন্তদৃষ্টির গোচরীভূত হইল। লোকনাথ দেখিলেন, জমিদার মহাশয় মোকদ্দমার জন্য বহু অর্থব্যয় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, মোকদ্দমাতে জয়লাভ ও করিবেন; কেবল বারদীতে আমলা পাঠাইবার খরচটা সংক্ষেপ করিয়া একজন প্যাদা পাঠাইয়াই কাজ আদায় করিতে চাহেন। এইরূপ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বারদীর আশ্রমের জন্য সামান্য কিছু আদায় করার খেয়াল তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল এবং খেয়াল তদুপযোগী একটী উপায় ও প্রসব করিল। তখন তিনি জমিদারের প্যাদাকে বলিলেন—"যাও বলগে, মোকদ্দমাতে তাঁহাদের হার হইবে, জমিদার যেন অধিক খরচাস্ত করিয়া রিক্তহস্ত না হন।" জমিদার পাইকের মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। তখনই দেওয়ানকে ব্রহ্মচারিবাবার নিকট প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিলেন, যতটাকা খরচ করিয়া যেরূপ যাগ যজ্ঞ করিয়া এই মোকদ্দমাতে জয়লাভ হইতে পারে, ব্রহ্মচারিবাবার দ্বারা এমন বিধান করিয়া লইতেই হইবে। দেওয়ানজী আশ্রমে আসিয়া পড়িয়া রহিলেন; মোকদ্দমা জয় হওয়ার ব্যবস্থা না হইলে, উঠিবেন না প্রতিজ্ঞা জানাইলেন। এইরূপে অনেক ধস্তাধ্বস্তি হওয়ার পর লোকনাথ হোম করিয়া মোকদ্দমা জিতাইয়া দিতে সম্মত হইলেন। ফর্দ্দ অনুসারে ২৷৪ সের ঘৃত কিছু চন্দনকাষ্ঠ

কিছু ধুপ গুগ্‌গুল আশ্রমে প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য যে ঘৃত গুলি আশ্রমবাসীদের সেবায় লাগিয়া গেল, জমিদার মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলেন। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতি কার্য্যে পরিণত হইল। এইস্থলে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে মুড়াপারার জমীদারগণ নিজেরা বাবার নিকট যাইতেন না। পরন্তু তাহাদের প্রত্যেককেই বাবার আশ্রমে ভক্তিভাবে অনেকবার যাইতে দেখা গিয়াছে। তাহাদের দুই একজন বাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে দুই একটা ঘটনা পরে বলা যাইবে।

(৯) লোকনাথের শারীরিক গঠন অন্যান্য মনুষ্যের মত হইলেও চক্ষুর গঠন এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল। অক্ষিযুগল অতিশয় বিশাল এবং পলকশূন্য ছিল। ফটোতে তাঁহার ছবি দেখিলেই একথা প্রতিপন্ন হয়। আমরা স্থির দৃষ্টিতে চাহিলে আমাদের উভয় নেত্রের তারকা যুগল চক্ষুর মধ্যস্থলে অবস্থান করে লোকনাথ চক্ষু স্থির করিলে তাঁহার উভয় নেত্রের তারকা আসিয়া নাসিকার নিকট সংলগ্ন হইত। আমরা কখনও তাহার চক্ষের পলক দেখি নাই। চক্ষুর তারা দুটী দেখিলে বোধ হইত যেন দুই খণ্ড হীরক চক্ষুর মধ্যে লাগাইয়া রাখা হইয়াছে।

বাবার নিত্যসেবক স্বর্গীয় মহাত্মা জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষুর তেজ সাধারণ লোক সহ্য করিতে পারিত না। ১৫।১৬ বৎসরের ছেলেরা ব্রহ্মচারিবাবার চক্ষুর দিকে চাহিয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া যাইত। তাঁহার চক্ষুর নিকট দূরবীক্ষণ যন্ত্র লজ্জা পাইত।

ব্রহ্মচারিবাবাকে কোনও ফৌজদারী মোকদ্দমাতে সাক্ষী দেওয়ার জন্য নারায়ণগঞ্জের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে নেওয়া হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন— "বয়স কত?" ব্রহ্মচারী—"১৫০ কি ১৫৫"। মোক্তারেরা বলিল— "এ আদালত এখানে এরূপ অসম্ভব কথা চলে না।" ব্রহ্মচারী— "আচ্ছা যাহা

সম্ভব হয় লিখিয়া লও।" তখন ৭০।৭৫ বৎসর লিখিয়া অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর লওয়া হইল। ইহার পরে বিপক্ষের মোক্তারের জেরা করার সময় আসিল। বিপক্ষের মোক্তার দেখিলেন, এই সাক্ষী নিজে ঘটনা দেখিয়াছেন বলিলেন। এত অধিক বয়স্ক সাক্ষীর এতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলিতে পারে না বলিয়া ঘটনা প্রত্যক্ষ করার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিতে হইবে। সাক্ষী আপনাকে অতি বৃদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, অতএব সেই দিকে ঝোক দিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আপনি ত বলিয়াছেন আপনি দেড়শত বৎসরের বৃদ্ধ; তাহা হইলে দৃষ্টিশক্তি অবশ্য খুব কমিয়া গিয়াছে, অতদূর হইতে দেখিতে পান নাই?" ব্রহ্মচারিবাবা পরিষ্কার উত্তর দেওয়ার জন্য বিপক্ষের মোক্তারকে নিকটে আনয়ন পূর্ব্বক দূরে একটি বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ বৃক্ষটীতে কোন প্রাণী আরোহণ করিতেছে এমন দেখা যায় কি?" মোক্তার বলিলেন—"না"। ব্রহ্মচারী—"তোমরা যুবক কিছুই দেখিতে পাইতেছ না। আমি এখান হইতে দেখিতেছি একদল লালপিপড়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভূতল হইতে বৃক্ষের উর্দ্ধদিকে আরোহণ করিতেছে।" কাছারী শুদ্ধ লোক একথা শুনিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল চিত্তে সেই বৃক্ষের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। অনেকে বৃক্ষের তলায় গিয়া লাল পিপড়ার শ্রেণীকে উর্দ্ধে উঠিতে দেখিয়া আসিল।

ব্রহ্মচারীর মত তীব্র দৃষ্টি পূর্ব্বে অনেকেরই ছিল। সেকালের মনুষ্যেরা কলের শক্তি অপেক্ষা দৈহিক শক্তি লাভের জন্য যত্ন করিতেন। তাঁহাদের ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণভাবে কার্য্যক্ষম থাকিত। তাঁহারা প্রখর মনীষা দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান দর্শন করিতে সমর্থ হইতেন। আজকাল যন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিকলতার ক্ষতিপূরণ কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হইলেও, বুদ্ধি বৃদ্ধি কখনও হইতে পারিবে না। সত্যযুগ হইতে মানবজাতির পূর্ণতার হ্রাস

হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ত্রেতাতে চর্চ্চা দ্বারা জ্ঞান ঠিক থাকিত, দ্বাপরে তৎস্থানে যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়; কলিতে বুদ্ধি লোপের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ইন্দ্রিয় শক্তিরও হ্রাস হইতেছে। বিবিধ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বল রক্ষা করিবার বিধান হইতেছে; কিন্তু বুদ্ধির উৎকর্ষসাধন যন্ত্রসাপেক্ষ নহে। নব্যেরা এই সকল যন্ত্রের আবিষ্কার দেখিয়া দিন দিন মানব জাতির জ্ঞানোন্নতি হইতেছে মনে করিয়া হৃষ্ট হইয়া থাকেন। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহাকে জ্ঞান বলিতেন না; যে জ্ঞান হইলে মনুষ্য বাহ্য বস্তুর সাহায্য ভিন্ন অন্তরের সুখে থাকিতে পারে, তাহাই হিন্দুর জ্ঞান। কল কৌশলের আবিষ্কার দ্বারা মানব সমাজ দিন দিন সেই জ্ঞান হইতে দূরবর্ত্তী হইতেছে। সেই জ্ঞানের অভাব বুঝাইবার জন্য নির্ব্বুদ্ধিতা, বর্ব্বরতা প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হয়।

(১০) ঢাকা হইতে কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি বারদীতে গিয়া ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বরের স্বরূপ কি?" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ঈশ্বর নামক কোন পদার্থের সহিত এপর্য্যন্ত আমার পরিচয় হয় নাই; ইহার পরে যদি সেই বস্তুর অস্তিত্ব দেখিতে পাই তবে তোমাদিগকে বলিতে পারিব।"

সকলেই বলে 'একজন ঈশ্বর আছে এবং খ্রীষ্টান, য়িহুদি, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা সেই একজনেরই ভজনা করে।' নব্যদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি,— সর্ব্ব প্রথমে কি ভাবে কোন্ সময়ে ঐ ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের পরিচয় হইল? এখানে ইহাও বক্তব্য যে খৃষ্টানের পৃথিবী সৃষ্টির ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া বেদপুরাণ বিভাগ করেন। কলির এখন পাঁচ হাজার বৎসর যায়। বর্ত্তমান সময়ের ৪০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে সত্য যুগের মনুষ্যেরা বিদ্যমান ছিলেন।

নব্যদিগের ঈশ্বর মানা ও হিন্দুর বেদ মানার ব্যাপারে পন্থার বিভেদ এই যে, নব্যেরা হট্টগোলের ন্যায় জনরব শুনিয়া ঈশ্বর মান্য

করেন, হিন্দুরা বেদবাক্য শুনিয়া বেদ মান্য করেন, নব্যদিগের ঐ জনরবের সৃষ্টিকর্ত্তা তোমার আমার ন্যায় মনুষ্য; হিন্দুর বেদের কেহ কর্ত্তা নাই; জগৎ নিত্য, বেদবাক্য সকলও নিত্য, প্রতিবার প্রলয়ের পরে জগদ্বিকাশের প্রারম্ভে বেদবাক্য সকল স্বতঃ প্রকাশিত হয়, আবার পরবর্ত্তী প্রলয়ে লীন থাকিয়া পুনরায় সৃষ্টির আদিতে বিকাশ পায়; এইভাবে বেদবাক্য হিন্দুর আশ্রয়। সেই বেদে যাহার অস্তিত্ব পাওয়া যায় তাহাই হিন্দু মানিতে প্রস্তুত; অন্য সকল কথা জীবের কল্পিত বলিয়া ঘৃণা করেন। তাহাতেই নব্য বাবুদিগের প্রশ্নে ঈশ্বর সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী ওরূপ বলিয়াছেন।

(১১) ঢাকা কলেজের এল, এ, ও বি, এ ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র আসিয়া বলিলেন, "আমরা আপনার নিকট ব্রহ্ম জানিতে আসিয়াছি, আমাদিগকে উপদেশ দিন।" ব্রহ্মচারী কহিতে লাগিলেন

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অর্থাৎ যাহা অখণ্ডমণ্ডলাকার, যদ্দারা চরাচর ব্যাপ্ত রহিয়াছে এহেন ব্রহ্মকে যিনি দেখাইয়া দেন, সেই গুরুকে নমস্কার কর। তাঁহারা বলিলেন "আপনাকেই গুরু করিব।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আচ্ছা সে হবে; এই শ্লোকটা বুঝিলে ত? ছাত্রগণ—"কিছু কিছু বুঝি, আপনি বুঝাইয়া দেন।" ব্রহ্মচারী—"তোমাদের পক্ষে ব্রহ্ম কি, জান? টাকা। কারণ, টাকাগুলি অখণ্ড এবং মণ্ডলাকার, চরাচর জগতে টাকারই প্রভুত্ব চলিতেছে; তোমরা সেই টাকা ব্রহ্মের দর্শন জন্য দীক্ষিত হইয়াছ। প্রফেসর নামক গুরু তোমাদিগকে সেই টাকা ব্রহ্মকে উপার্জ্জন করার পথ দেখাইয়া দেন। অতএব এখন সেই প্রফেসার গুরুর অনুসরণ করিতে থাক। পরে টাকা ব্রহ্ম লাভ করিতে পারিলেও যদি ভোগান্তে তাহাকে

ছাড়িয়া, অন্য ব্রহ্ম দর্শন করার অভিলাষ উৎপন্ন হয়, তবে আমার নিকট আসিও, তখন যাহা বক্তব্য হয় বলিব।” এই কথায় পক্ষে বি, এ ক্লাসের ছাত্রটী বলিলেন, ভোগ দ্বারা ত আর নিবৃত্তি আসিবে না। ভোগ দ্বারা প্রবৃত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই বলিয়া নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটী পাঠ করিলেন।

“ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥”

(ইহার অর্থ এই—বাসনাযুক্ত লোকের বাসনা উপভোগ দ্বারা নিবৃত্তি হয় না। অগ্নি যেমন ঘৃতাহুতিদ্বারা অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে বাসনাও তেমন উপভোগ দ্বারা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।”) বাবা শ্লোকটী শুনিয়াই ছাত্রটীকে বলিলেন কি বলিলেন বাবা! শ্লোকটী আবার বল ত?’ ছাত্রটী শ্লোকটীর পুনরাবৃত্তি করিলেন। বাবা তচ্ছ্রবনে বলিলেন, “ঠিকই ত? কিন্তু আমি ত তোমাকে উপভোগ করিতে বলি নাই! ভোগ করিতে বলিয়াছি।” ছাত্রটী বলিলেন “আমরা ভোগ ও উপভোগ একই অর্থবাচক বলিয়া জানি। ভোগ এবং উপভোগে পার্থক্য কি?” বাবা উত্তর করিলেন—“পতি” ও “উপপতি” এই দুইয়ে যে প্রভেদ, “পত্নী” ও “উপপত্নী” এই দুইয়ে যে প্রভেদ, “ভোগ” ও “উপভোগে” ঠিক সেইরূপ প্রভেদ। বিচার পূর্ব্বক ভোগকে “ভোগ” এবং অবিচারে ভোগকে “উপভোগ” কহে।

লোকনাথ মুড়াপাড়ার মোকদ্দমার ফল যেরূপ উল্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, শিক্ষিতদিগের কৃত্রিম দেবতা দর্শনের কথায় যে ভাবে উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সত্যবাদিতার প্রতি সন্দেহ আসিতে পারে; কিন্তু প্রণিধান করিলে, সেভাব দূর হইবে। হৃদয়ের অনুভূতি বহির্জ্জগতে ব্যক্ত করাকে সত্যবাদিতা বলা যায়। তাঁহার হৃদয়ের অনুভূতির নিকট বহির্ব্যাপারের

মূল্য প্রহেলিকাবৎ। তিনি বলিতেন সকলই রাতকাণার কথা।” যাহারা রাত্রি হইলে কিছুই দেখিতে পায় না তাহাদিগকে “রাতকাণা” বলে; সেই রাতকাণা দোষ নিবারণের জন্য ব্রতের কথাশুনার ন্যায় কথা শুনিতে হইত। তিনি সেই রাতকাণার কথাও বলিয়াছেন। “এক গৃহস্থের বাড়ীতে বন্ধ্যার পুত্র আসিয়া অতিথি হইল, গৃহস্থ পরম যত্নে অতিথিকে গৃহে বসাইয়া, ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বে-বায়ের হাটে গিয়া বেসাতি পত্র আনিলেন; শুক্‌না পুকুরে জাল বাইস করাইয়া প্রচুর মাছ ধরাইলেন, তদ্বারা নিরামিষ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল। চাউল ভিন্ন খালি হাঁড়ি চড়াইয়া দিলেন; ঘরে অগ্নি ছিল না সুতরাং বিনা আগুনে ভাত রাঁধিলেন। বন্ধ্যার পুত্র আকণ্ঠ পুরিয়া ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল; রাতকাণা ভাল হইল।” এ ছাড়া, এত বয়সেও মায়ের বিবাহ হইল না বলিয়া মামার সহ বিবাহের পরামর্শ করার গল্প বলিয়া লৌকিক ব্যবহারের ব্যাখ্যা করিতেন। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে “ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা।” জ্ঞানী হৃদয়ে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হন, বাহিরের জাগতিক ব্যবহারকে মিথ্যা বলিয়া জানেন। এই হিসাবে মুড়াপাড়ার মোকদ্দমায় জয়লাভ করা আর পরাজিত হওয়া, কিম্বা বাবুদের কৃত্রিম দেবতা দর্শনে হর্ষ আর বিষাদ করা এই উভয় প্রকার ব্যবহার ও সেই মিথ্যা জগতের অন্তর্গত, সুতরাং মিথ্যা। ব্রহ্মচারিবাবার হৃদয়ে অনুভূত সত্য বস্তু (ব্রহ্ম) বাক্যের অগোচর। তাহা বলিতে পারেন না, যাহা বলিতে হইবে তাহা যে মিথ্যা, একথা জ্ঞানীরা বিলক্ষণ অবগত থাকেন।

আমরা তাঁহার উপদেশ মত চলিতাম না বলিয়া আক্ষেপ করিয়া কহিতেন, “এ দোষ তোমাদের কিছুই নয়, আমার অযোগ্যতার ফলমাত্র; কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্তকরার জন্য ৯ অধ্যায় গীতা কহিলেন, কিছুতেই যুদ্ধ করিতে চান না, তখন কৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া দেখাইলেন; অর্জ্জুনও বলিলেন, “করিষ্যে বচনং তব।”

(আমি তোমার আদেশ মত যুদ্ধ করিব)। আমি যখন বিশ্বরূপ হইতে পারিতেছি না, তখন তোমরা আমার কথা মানিবে কেন?" এজন্য যে যেমন তাহার সহিত তেমন ব্যবহার করিতেন। তাঁহার হৃৎপ্রত্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, অনুভূতি মতে সত্য বলিতেন।

(১২) ব্রহ্মচারিবাবা বারদী অবস্থান সময়ে তাঁহার পুণ্য-প্রতিভা ও তপোবল যখন দেশ দেশান্তর ছড়াইয়া পড়িতেছিল, দেশ দেশান্তর হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু বহু লোক যখন তাঁহার শরণাগত হইতেছিল, ঠিক এমনই সময়ে, ভাওয়ালের স্বর্গগত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরেরও ব্রহ্মচারিবাবাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ ও কৌতূহল জন্মিল এবং তিনি সপরিষদ সেখানে যাত্রা করিলেন। যাওয়ার সময় সঙ্গীদিগের সহিত ব্রহ্মচারিবাবাকে প্রণাম সম্পর্কে বাদানুবাদ হইল। রাজা বলিলেন, "জাতির যখন নিশ্চয়তা নাই তখন ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা কিংবা পায়ের ধূলি নেওয়া হইবে না।" কিন্তু পরে যখন ব্রহ্মচারিবাবার কাছে পঁহুছিলেন, তখন সে কথা স্মরণ রহিল না। তাঁহার সন্নিহিত হওয়া মাত্র সর্ব্বাগ্রে রাজাই ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক পায়ের ধূলা নিতেই ব্রহ্মাচারিবাবা হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন বাবা। প্রণাম করিবে না বলিয়া ত মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিলে?" তখন রাজা ও তাঁহার পরিষদেরা সকলেই অবাক্ অপ্রস্তুত।

বাবার আশ্রমে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিতেন, বাবা তাঁহাদিগকে আহার্য্য এবং নগদও কিছু দিতেন। তাঁহাদের অনেকেই প্রথমে বাবাকে বড় গ্রাহ্য করিতেন না। মনে করিতেন, "উনিও একজন সন্ন্যাসী আমরাইবা কম কিসে?" এইরূপ করিয়া ২।১ ঘণ্টা একটু দূরে দূরে থাকিতেন। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি, ২।৪ দণ্ড পরেই সকলেই "যোগীরাজ হ্যায়" বলিয়া

আশ্রমের দ্বারে বাবার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া যাইতেন ; বাবার চক্ষুর তেজ এবং অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্যের এমনই প্রভাব ছিল।

রাজাবাহাদুর এখন হইতে বৈষয়িক, শারিরীক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে যখন যে সন্দেহ মনে উদয় হইত তখনই সেই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য বাবার নিকট উপস্থিত হইতেন এবং এমন সদুত্তর পাইতে লাগিলেন যে তিনি ব্রহ্মচারিবাবার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ও আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে রাজাবাহাদুরের পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের শ্মশান-ক্ষেত্রকে শ্মশানেশ্বর বলা হয়। সেখানে প্রত্যেক মঠেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজাবাহাদুরের ব্রহ্মচারিবাবার উপরে এরূপ অটল বিশ্বাস হইয়াছিল যে তিনি বাবাকে জীবন্ত শিব বলিয়াই মনে করিতেন এবং ঐ শ্মশানেশ্বরে একটী নবনির্ম্মিত মন্দিরে জীবন্ত শিব প্রতিষ্ঠা করিবেন দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া, বাবাকে বারদী হইতে উঠিয়া শ্মশানেশ্বরে যাইবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু বাবা স্বীকৃত হন নাই। বলিয়াছিলেন "আমি ত সর্ব্বত্রই আছিরে।" এই রাজবাহাদুর একবার ফটো-গ্রাফের যন্ত্রাদিসহ হস্তিপৃষ্ঠে বারদী আশ্রমে যাইয়া বাবার ফটো উঠাইয়া নিয়া আসেন এবং সেই ফটো হইতেই এখন আমরা বাবার ফটো ও তৈলচিত্রাদি পাইতেছি। এই জন্য বাবার শিষ্যেরা রাজা-বাহাদুরের নিকট চির কৃতজ্ঞ। বাবা প্রথমতঃ ফটো দিতে চাহিয়া-ছিলেন না, বলিয়াছিলেন, "এই দেহ ত অনিত্য, ইহার আবার একটা চিত্র রাখিয়া কি হইবে? যা যা আমার ফটোর দরকার নাই।" রাজাবাহাদুর বলিলেন, 'বাবা এতদুর হইতে যন্ত্রাদিসহ এত পরিশ্রম করিয়া আপনার ফটো তুলিবার সঙ্কল্প নিয়াই আসিয়াছি, তবে কি ফিরিয়া যাইব?"

বাবা বলিলেন, ফটো দ্বারা কার কি উপকার হইবে?"

রাজাবাহাদুর বলিলেন "আপনার মত মহাপুরুষের ছবি যাহার ঘরে থাকিবে, তাহার গৃহ পবিত্র হইবে, সেই গৃহস্বামীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে। কেবল তাহাই নহে এই ফটো বিক্রি করিয়া ও একজন লোকের জীবিকা চলিতে পারিবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটু বাহিরে বসুন, আমি আমার বাঞ্ছিত কার্য্য করিয়া যাই।" বাবা বলিলেন, "আচ্ছা যদি এমনই হয়, তবে আমি বাহির হইতে পারি।" পরে ফটো নেওয়া হয়। কিন্তু একবার বই দুইবার ফটো নিতে দেন নাই।

এই যাত্রায় কি যাত্রান্তরে ঠিক বলিতে পারি না, তিনি হস্তী সোয়ার হইয়া বহু লোকজন সহ বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া যখন ফিরিয়া যাইতে ছিলেন তখন বাবা বলিলেন, "এখন যাইস্‌না, কিছুকাল পরে যা।" কিন্তু রাজাবাহাদুর ব্রহ্মচারিবাবার সেই সামান্য উপরোধ রক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন। কতকদূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন, প্রবল ঝড় বৃষ্টি আসিতেছে, দেখিয়া রাজাবাহাদুর ফিরিয়া আসিলেন। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিয়া আসিলে কেন?" রাজাবাহাদুর— "ঝড় বৃষ্টি আসাতে ফিরিয়া আসিলাম।" বাবা বলিলেন, "ভালই করিয়াছ।" বৃষ্টি থামিলে হাতী সাজাইয়া পুনরায় রাজাবাহাদুর যাত্রা করিলেন। কতকদূর অগ্রসর হইলে প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, রাজা-বাহাদুর পুনর্ব্বার ফিরিয়া আশ্রমে আশ্রয় লইলেন। এইরূপে যত বার আশ্রম হইতে বহির্গত হন তত বারই প্রত্যাগত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন বুঝিলেন এই প্রবল বৃষ্টির আক্রমণ ব্রহ্মচারীর ইচ্ছামতে সংঘটিত হইতেছে। তখন বাবার চরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন— "বুঝিলাম, আপনি ছাড়িয়া না দিলে আমি কোন ক্রমেই যাইতে পারিব না। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি করুন।" ব্রহ্মচারী বলিলেন,— "আমি ত প্রথমেই বলিয়াছিলাম, কিছুকাল থাকিয়া যাও। সে কথা না

শ্রীশ্রীগোপালের মা

শুনিয়া যাওয়াতে বৃষ্টি ভোগ করিতে হইয়াছে। এখন যাইতে পার।" এইভাবে রাজাবাহাদুর তদীয় অনুমতি গ্রহণে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিলেন।

বাবার দেহ রক্ষার পরে তাঁহার সমাধির উপরে মন্দির করিয়া দিবার জন্য রাজাবাহাদুর অনেকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বারদীর জমীদারগণ নিজেরাই ঐ কার্য্য করিবেন, নিজেদের জায়গায় অন্যকে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে দিলে মানের হানি হয় বলিয়া মন্দির প্রস্তুত করিতে দেন নাই।

(১৩) মুড়াপাড়ার জমীদার পরলোকগত বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রসন্তানাদি না হওয়াতে অত্যন্ত হতাশ্বাস ও বিমর্ষ হইয়া পড়েন। বাবার কৃপায় অন্ধে চক্ষু পাইতেছে, বোবায় কথা বলিতেছে ও খঞ্জ হাটিবার শক্তি পাইতেছে এরূপ শুনিয়া তিনি সপরিবারে বাবার আশ্রমে যাইয়া ধন্না দিয়া পড়িয়া রহিলেন। বাবা পূর্ণবাবুর উপরে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"যা আমি তোর ঘরে যাইতেছি।" বাবার এই আজ্ঞা পাইয়া তিনি প্রসন্ন মনে বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন এবং কিয়ৎকাল পরেই তাহার একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। সে ছেলেটীর নাম রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। উক্ত শ্রীমানই এখন পূর্ণবাবুর উত্তরাধিকারী। বাবা এরূপ পুত্রার্থীদিগকে, "আমি তোমার ঘরে যাইব।" এরূপ কথা বলিয়াই আশীর্ব্বাদ করিতেন। একের অধিক ব্যক্তিকে এরূপ বাক্য দিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ ইহার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া আপত্তি করিলে, তিনি বলিতেন "আমিই ত সব, আমি ভিন্ন আর কি আছেরে?" শুনিয়াছি যিনি কন্যা সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতেন তাহাকেও তিনি এই একই কথাই বলিতেন।

(১৪) মামুদপুর নিবাসী বাবু সীতানাথ রায় একজন খুব বড় রকমের ধনী মহাজন। তিনি বাতব্যাধিরোগগ্রস্ত হইয়া সকল শ্রেণীর বড় বড় ডাক্তার, কবিরাজ, হেকিম প্রভৃতি দ্বারা

চিকিৎসিত হইয়া ও আরোগ্য লাভ না করিতে পারিয়া হতাশ্বাস হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কয়েক বৎসর এরূপে আছেন এমন সময়ে তাহার শ্যালক বালীয়াটীর অন্যতম জমীদার দিগুবাবু মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট শুনিতে পান যে বারদীতে একজন মহাপুরুষ আছেন, তাঁহার কৃপা হইলে অসাধ্য-ব্যধিও অনায়াসে সারিয়া যাইতে পারে। গোস্বামী মহাশয়ের বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর হইতেই তিনি বাবার সম্বন্ধে সকল স্থানে সকলের নিকটই বলিতেন যে বারদীর ব্রহ্মচারীর ন্যায় সিদ্ধ মহাপুরুষ তিনি এপর্য্যন্ত খুব কমই দেখিয়াছেন এবং তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে ব্রহ্মচারিবাবা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, কেবল তাঁহার ইচ্ছা জন্মাইয়া নিতে পারিলেই হয়। তাঁহার নিকট অনেকে এই কথা শুনিয়া নানাস্থান হইতে দলে দলে এত লোক বারদী আশ্রমে যাইতে আরম্ভ করিল যে বাবা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন "বিজয় আমাকে বারদীতে তিষ্ঠিতে দিলে না।" যাহা হউক সীতানাথবাবুও সপরিবারে একটা লালতিজ্ঞী করিয়া বারদীতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সীতানাথ বাবুর অবস্থা যে দেখিয়াছে সেই বিস্মিত হইয়াছে। ভোরে আটজন লোকে ধরাধরি করিয়া সীতানাথ বাবুকে বাবার আঙ্গিনায় ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইত। সমস্ত দিন রৌদ্রে শুকাইয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাটাইত, আবার এদিকে বাবার বাক্যবাণ ত আছেই। বাবা 'এরূপ রোগী দেখিলেই রোগীদিগকে যথেষ্ট গালাগালি করিতেন এবং আশ্রম হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চাহিতেন। সীতানাথ বাবু কিন্তু এসব কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া আশ্রমের আঙ্গিনায় অনেক দিন পড়িয়া রহিলেন। বড়লোক, তাহার এরূপ নিরুপায় অবস্থা যে দেখিত তাহারই করুণার উদ্রেক হইত। একদিন বাবার ও তাহার উপরে কৃপা হইল। পূর্ব্বে ৮ জন লোকে তাহাকে ধরাধরি করিয়া নিয়া আসিত, কয়েকদিন

পরে ৬ জনে আনিতে পারিত, ক্রমে ৪ জনে, এখন মাত্র দুইজনের সাহায্যে সে আশ্রমে আসিতে পারিল অর্থাৎ ক্রমে নিজেই একটু একটু বল পাইয়া নিজেই আসিতে পারিত। সীতানাথের আশা হইল তিনি বাঁচিবেন, কিন্তু এখনও রোগ দূর হয় নাই। বাবা বলিলেন, "তোর যোগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু কেন যে তোর যোগ ভঙ্গ হইতেছে তা কি তুই টের পাচ্ছিস্? পাইনার রাধিকা অল্পদিনের মধ্যেই রোগমুক্ত হইয়া গেল, তোর এতদিনেও সেরূপ হইতেছে না, তবে বুঝি তোর রোগ সারিবার নয় ইত্যাদি চিন্তা তোকে হতাশ করিয়া দিতেছে, তোর যোগ ভঙ্গ করিয়া ফেলিতেছে। এখানে থাকিলে তোর এই চিন্তা পুনঃ পুনঃ আসিবে। এখন বাড়ী চলিয়া যা। ঔষধপত্র আর কোনও দিন কিছু খাইস্ না। দূর্গাপূজায় সপ্তমীরদিন তুই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবি; যা এখানে আর অপেক্ষা করিয়া দরকার নাই।" তিনি যন্ত্রারূঢ় হইয়াই যেন চলিয়া গেলেন। দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিনেই তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। আরোগ্যান্তে বাবার নিকট সপরিবারে আসিয়া বলিলেন—"বাবা! আপনার কৃপায় প্রাণ পাইলাম। আমার বাঁচিবার কিছুই আশা ছিলনা, মনেও স্থান দেই নাই যে এই রোগ হইতে আর পরিত্রাণ পাইব। তোমার কৃপায়ই যখন বাঁচিলাম, তখন আমি তোমার, আমার বিষয় সম্পত্তি সবই তোমার, আজ হইতে আমি তোমার, কৃতদাস হইয়া রহিলাম, আমি আর সংসারে যাইব না, তোমার, নিকটেই পড়িয়া থাকিব।" বাবা নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু সীতানাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি সব তোমাকে দিয়াছি আমার বিষয় সম্পত্তিতে কোনও অধিকার নাই।" বাবা বলিলেন "বটে? আচ্ছা বেশ! ঐ সম্পত্তি আমারই তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার সম্পত্তি আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি?" সীতানাথ—"হা তা পারেন বইকি?" বাবা—"আচ্ছা সম্পত্তি আমারই রহিল,

তোকে ভোগ করিবার অধিকার দিলাম, যা এসব সম্পত্তি ভোগ কর গিয়ে।” সীতানাথ আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। অবশেষে সীতানাথ আশ্রম খানাকে চকমিলান করিয়া দিবেন এরূপ বলিলে, বাবা তাহাতে অস্বীকৃত হন। ১৩৪৫ সনে প্রায় ৯০ নব্বই বৎসর বয়সে তাহার দেহত্যাগ হইয়াছে। মৃত্যুর বৎসর তিনি বারদী আশ্রমে প্রায় তিন হাজার টাকা ব্যয়ে একখানা একতলা দালানে ধর্ম্মশালা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সীতানাথ বাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, কলিকাতা হাট খোলাতে ২নং নয়ান শূরের লেনে গঙ্গার পারে তাহার নিজ গদীতে থাকিতেন।

(১৫) আমার জিজ্ঞাসা মতে লোকনাথ বলিয়াছেন—“কোনও সময়ে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমি মরা বাঁচাইয়া দিতে পারি কিনা দেখিব। তদবধি আমার নিকট মৃতকল্প রোগী সকল আসিতে থাকে এবং আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া যায়।” এই সকল ঘটনা প্রকাশ হওয়াতে চতুর্দ্দিক হইতে রোগী আসিয়া তাঁহার আশ্রমটি বড় রকমের হাসপাতাল করিয়া তুলিল। তখন দেখিলেন, এসকল তাঁহার সংসার হইয়া পড়িতেছে; তিনি আর ত পরোপকার ব্রতের কর্ত্তব্য জ্ঞানে বদ্ধ ছিলেন না; এজন্য রোগী আসিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। রোগীরা সে কথা শুনিবে কেন? তিনি যতই নিষেধ করেন, ততই রোগীদের আগ্রহ বৃদ্ধি। নূতন রোগী আসিলে, বলিতে লাগিলেন, “তোমার পীড়ার কথা ত শুনিলাম, আমার কিন্তু বৈদ্যশাস্ত্র পড়া নাই; তোমরা ডাক্তার কবিরাজের নিকট যাও। আমি **ভবরোগের বৈদ্য,** সেই রোগ আমাদের জন্য ত বড় কেহ আসেনা।” তাহারা কিন্তু কাকুতি মিনতি করিয়া পড়িয়া থাকিত। লোকনাথ মিষ্ট বাক্যে কত বুঝাইতেন; তাহারা ভাবিত এরূপ বলা সাধুদের রীতি। তিনি বিনয় সহকারে বলিতেন, “আমি অনায়াসে যদি তোমাদিগকে ভাল করিয়া দিতে পারি, তবে পাপিষ্ঠের মত এত নিষেধ করিব কেন?” রোগীরাও তাহাদের

আত্মীয়েরা এসকল কথা কথার মধ্যেই ধরিত না। একজন বলিল, "আপনি বাক্‌সিদ্ধ, আপনার বাক্য পাইলেই রোগ যায়।" লোকনাথ বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "আমি মুখের কথা বলিলেই তোমার রোগ যাইবে? আচ্ছা আমি একটা বাক্যব্যয় করিলেই যদি তোমরা তুষ্ট হইয়া যাও, তবে তাহাতে আমি নারাজ হই কেন। এইত বলিতেছি উহার রোগ দূর হউক, রোগ দূর হউক, রোগ দূর হউক। এখন তুষ্ট হইলে, তবে আমাকে ছাড়িয়া যাও।" আমি এই সকল ব্যবহার দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম তিনি রোগীর রোগ নিজে লইয়া অল্পকাল ভোগ করিতেন, তাহাতেই রোগ যাইত, কিন্তু দেখিতাম তিনি কাহারও রোগ লইয়া ভুগিলেন না অথচ রোগীরা রোগ-মুক্ত হইল। তখন আমি ইহার কিছুই মর্ম্মোদ্ধার করিতে না পারিয়া রোগী দিগের পক্ষ হইয়া বলিলাম, "রোগীরা এখানে আসিয়াছে তুমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার কে? তোমার মনে তুমি থাক, রোগীদের মনে রোগীরা থাকুক, তোমার এত আপত্তি কেন? লোকনাথ বলিলেন—'উহারা যে আমাকে লক্ষ্য করিয়া আমার শরণাপন্ন হয় তাহাতে আমি সুস্থির থাকিতে পারিনা, উহাদের দুঃখ দেখিয়া অন্তঃকরণ আর্দ্র হইয়া যায় সুতরাং উহাদের জন্য দুঃখ বোধ হয়।" আমি বলিলাম, "তুমি রোগীর রোগ নিজে লওনা দেখি, অথচ রোগীরা আরোগ্য লাভ করে কিরূপে?"

উত্তর। রোগীর উপর আমার দয়া আসিলেই আমার শক্তি দ্বারা রোগ দূর হয়।

প্রশ্ন। দয়া হয় কি করিলে?

উত্তর। আমাকে তুষ্ট করিলে।

প্রশ্ন। তুমি কিসে তুষ্ট হও?

উত্তর। তাহা আমি জানি না ও বলিতে পারি না।

ইহাতে বুঝা গেল যে মহাশক্তি দ্বারা জগৎ চলিতেছে, তাহার সহিত লোকনাথের তুষ্টির বিশেষ ভাবে যোগ রহিয়াছিল।

তিনি যখন এইরূপ বহুসংখ্যক রোগীদ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন বলিলেন, "এরূপ হইলে আমি দেহ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইব।" তিনি যে যোগবলে নিদ্রাকে অতিক্রম পূর্ব্বক মৃত্যুর সম্ভাবিত কাল অতীত করিয়া, এতদিন জীবিত ছিলেন এবং ইচ্ছা করিলেই মোহকে আশ্রয় করিয়া মৃত্যু ঘটাইতে পারেন, এ কথাতে লোকে তেমন আস্থা স্থাপন করিত না। তাঁহার অনিচ্ছাতে বহু-সংখ্যক রোগী তাঁহার আশ্রম পূর্ণ করিতেছিল, তখন তিনি ম্যাজি-ষ্ট্রেটের সাহায্যে রোগীদিগকে নিবারণ করিতে মনঃস্থ করিলেন, এবং আমার প্রতি আদেশ করিলেন "ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যাইয়া দরখাস্ত কর যে, আমার গুরুর আশ্রমে যাহাদিগকে আসিতে ও থাকিতে নিষেধ করা হয়, তাহারা সেই কথা না মানাতে, গুরুর পিণ্ডপাত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। অতএব তেমন ভাবের নিষেধাজ্ঞা সরকার হইতে জারী হউক।" এই উপলক্ষে যে অভিনয় দেখা গেল তাহাতে বোধ হইল, জীবগণের স্বাধীনতা কিছু মাত্র নাই; কেবল পুতুল-বাজির পুতুলের ন্যায় অদৃশ্য সূত্র বিশেষ দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিতেছে। সেই সূত্রে ভর দিয়া জীব চালাইবার পক্ষে লোকনাথের অধিকার ছিল।

আমি তাঁহার আদেশ মতে নারায়ণগঞ্জ মহকুমাতে গিয়া জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ বিষয়ে ফরিয়াদি হইতে প্রস্তুত হইলাম। লোকনাথ আমাকে বারণ করিয়া বলিলেন "এখন যাস্‌নে, ২।৩ দিন মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবই এখানে আসিবেন; তখন দরখাস্ত করিস্।" গুরুদেব নিজের ঐশী শক্তি পরিচালন দ্বারা জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে বারদীতে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এভাব তখন আমার মনে আসিল না। আমি মনে করিলাম, হয়ত লোক মুখে শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আসিবেন বলিতেছেন। আমরা কিন্তু অন্য

কাহারও নিকট ম্যাজিষ্ট্রেট বারদীতে আসিবার কথা শুনি নাই। এ সকল কথা পূর্ব্বে ততটা প্রচারও হয় না। দেখিতে দেখিতে সেই দুই তিন দিনের মধ্যে আশ্রমের ২০০।৩০০ হস্ত দূরে সাহেবের তাম্বু পোতা হইল। আমি যথা সময়ে মোক্তারদের সাহায্যে দরখাস্ত দাখিল করিলাম। আমার সেই দরখাস্ত মতে নিষেধ আজ্ঞার হুকুম দিয়াই জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাম্বু উঠাইয়া প্রস্থান করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে যাত্রাতে ম্যাজিষ্ট্রেট বারদীতে আসিয়া, ঐ হুকুম দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই করেন নাই। ঐ কার্য্যের জন্যই তিনি বারদীতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, আমরা দূরবর্ত্তী থাকার কালে গুরুদেব যদি আমাদিগকে আনিতে ইচ্ছা করিতেন, তবে আমাদের মধ্যে কি এক রকম প্রেরণা উপস্থিত হইত, তাহার প্রভাবে আমরা কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতাম না, বারদী আসিতে উতালা হইয়া পড়িতাম। আশ্রমে গিয়া আমাদের মধ্যে একজন আমার সমক্ষে গুরুদেবকে এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে ডাকিয়াছিলাম।" তাহাতেই বলি জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটও সেই ভাবে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া শুধু আমার দরখাস্তের হুকুম দিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতে ভাল বাসিতাম অর্থাৎ যাঁহাদের সহিত তিনি এক পরিবারভুক্ত ব্যক্তির ন্যায় থাকিতেন, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচারিবাবা অনেক বার বলিয়াছেন—"এই সকলের সহিত ইহাদের জন্মান্তরে একত্র থাকা হইয়াছিল বলিয়াই এবারও ইহারা জুটিয়া গিয়াছে।"

ব্রহ্মচারিবাবার সহিত মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মিলন

বাবার অন্যতম ভক্ত বারদীর নাগ পরিবারের কামিনীকুমার নাগ মহাশয়ের লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত :—

"১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের বড় দিনের বন্ধের সময়ে একদা আমি বারদীর আশ্রমে উপবিষ্ট আছি, সহসা ব্রহ্মচারিবাবা বলিয়া উঠিলেন— "কামিনী, বিজয় আসছে।" আমি—"মেঘনার পথে কি ব্রহ্মপুত্রের জল পথে আসিতেছেন?" ব্রহ্মচারিবাবা— 'ব্রহ্মপুত্র দিয়া আসিতেছে।' ঐ পথে নৌকা ঠেকিবে জানিতাম, তাহাতেই আমি ও ভ্রাতৃ জামাতা হরিশ কয়েকজন প্রজা সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এবং লোকদ্বারা নৌকা টানাইয়া ঠেকাস্থান ছাড়াইয়া দিলাম।

গোস্বামী মহাশয় আশ্রম ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইয়াই বলিলেন, "দেব, দেবী, দেব, দেবী, ঘরের সমস্ত জায়গায়, গায়ের কাপড়েও।" এই কথা বলিয়া তিনি গলদশ্রু নয়নে ব্রহ্মচারি-বাবার চরণে নিপতিত হইলেন, বাবা দুই হাত দিয়া তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। সেই প্রেমালিঙ্গনের ভাবাবেশে গোস্বামীর দেহ কম্পিত হইল, মুখ দিয়া অনবরত হু হু শব্দ নির্গত হইয়া ঘরখানা যেন ফাটাইয়া ফেলিল। এইভাবে সুখ সম্মিলনান্তে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিলেন— 'এত দিন আমার প্রতি কৃপা হয় নাই কেন?' উত্তর হইল—'তুইও ত পাষাণ।'

ইহার পরে গোস্বামী মহাশয় আশ্রম হইতে আমার বাসস্থানে চলিলেন। পথে আমার প্রশ্নমতে উত্তর করিয়াছিলেন— আমি

মামুদপুর নিবাসী ৺সীতানাথ রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
বারদীর ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রমে
সমাগত ভক্তগণের জন্য ধর্ম্মশালা

বহু সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়াছি, কোনস্থানে কিছুই দেখিতে পাই নাই। কোনস্থানে /০ এক আনা, কোনস্থানে ৵০ দুই আনা কেবল একস্থানে ।০ চারি আনা দেখিতে পাইয়াছি। এস্থানে যাহা শুনিয়া আসিয়াছিলাম তাহা হইতে অনেক বেশী দেখিতে পাইয়াছি। আমাকে এক সেকেণ্ডে যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহাতেই আমি ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারিব। আমাকে বলিয়াছিলেন তুই এসেছিস ভাল হইয়াছে; আমার ভার তুই নে, আমি চলিয়া যাই। পর মুহূর্ত্তে আমার শরীরের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হবে নারে, তোর শরীরটা নেহাত অপটু; আমার ভার তুই বহন করিতে পারিবি না। তোকে গড়িয়া নিতে হবে।" গোস্বামী মহাশয় আরও বলিলেন, বারদী আমার ধর্ম্ম-জীবনের জন্মস্থান, তোমরা আমার ভাই। সর্ব্বদা এখানে থাকিও। অনুগ্রহ হইলে ধর্ম্ম-জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে ও সদগতির পথ পাইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ এযাত্রাতে চারি দিন আশ্রমে অবস্থান করিয়া ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে চলিয়া যান। ঢাকাতে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মসমাজের পরিচালকেরা 'বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পৌত্তলিক হইয়াছেন' বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাঁহাকে যে ৫০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইত তাহা বন্ধ করিয়া দেন। ইহার পরে একদিন গোস্বামী মহাশয় গামছা হস্তে লইয়া বুড়ীগঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ব্রহ্মচারিবাবার আহ্বান অনুভব করিয়া ঐ গামছা হাতেই বারদীতে চলিয়া আসেন। এদিকে নদী হইতে স্নান করিয়া আসিতে বিলম্ব দেখিয়া তাহার পরিবারবর্গ উদ্বিগ্নচিত্তে তদীয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা বুড়ীগঙ্গায় স্নানঘাটে তাঁহাকে না পাইয়া তথা হইতে একজন মাতুয়াইলের রাস্তায়, একজন লাঙ্গলবন্ধের রাস্তায় ধাবিত হইল, অপর একজন বৈদ্যের বাজারের রাস্তা দিয়া বারদীর ব্রহ্মচারীর আশ্রম পর্য্যন্ত উপস্থিত

হন। পরদিন আমি ঢাকা আসিবার জন্য রওনা হইয়া ব্রহ্মচারী-বাবাকে প্রণাম করিতে যাইলে গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন, "বাবার ইঙ্গিতে আমি বুড়ীগঙ্গার স্নানঘাটা হইতে এখানে চলিয়া আসিয়াছি। বাসাতে জানাইয়া আসিতে পারি নাই, তাহারা বড়ই উদ্বিগ্ন আছে। তুমি ঢাকায় পৌছিয়া আমার শাশুড়ী, স্ত্রী প্রভৃতিকে এই সংবাদ দিবে যে আমি বাবার আশ্রমে কুশলেই আছি।" আমি তাহাই করিলাম। বারদীতে ব্রহ্মচারিবাবা গোস্বামীকে বলিলেন, "ব্রাহ্মসমাজ হইতে তুই মাসিক ৫০৲ টাকা পাইস্ না? তাহার পরিবর্ত্তে তুই মাসিক ২০০৲ টাকা পাইলে তোর পরিবার ভালরূপে পোষণ করিতে পারিবি না?" গোস্বামী বলিলেন, "আমার ৫০৲ টাকাই যথেষ্ট ২০০৲ টাকা হইলে ত কথাই নাই।" ব্রহ্মচারী—"তুই ঢাকা যাইয়া ব্রাহ্মসমাজের বাড়ী ছাড়িয়া গেণ্ডারিয়াতে ছনের কুড়ে করিয়া বাস করিস্ তাহা হইলে দেখিতে পারিবি তোর খরচের টাকার জন্য ভাবনা করিতে হইবে না।"

ফলেও দেখা গিয়াছিল গোস্বামী মহাশয় গেণ্ডারিয়াতে কুড়িয়া করিয়া অবস্থান করা অবধি তাঁহার কোন অভাব ছিল না। যাহা যখন দরকার হইত আপনা হইতেই আসিত।

একদা ব্রহ্মচারিবাবা গোস্বামী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "পৈতা ফেলেছিস কেন? এই কাজটা ভাল করিস্ নাই। পৈতা জোর করিয়া ফেলিলে কি হয় রে? যখন যাইবার সময় হইবে তখন আপনিই যাইবে। ব্রাহ্মণের চিহ্ন, উহা ফেলিয়া দিবার প্রয়োজনাভাব।"

আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা

আমি বারদী আশ্রমে ব্রহ্মচারিবাবার নিকট একান্তে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে তিনিই বলিলেন, "দীক্ষা গ্রহণ করিবে?" আমি

বলিলাম, "একথা আমা অপেক্ষা তুমিই ভালরূপ বুঝ। অতএব আমাকে জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক।" ব্রহ্মচারী কহিলেন, "গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপনের গুরুত্ব বোধ হয় জাননা; এসম্বন্ধ চিরস্থায়ী। আমি যদি মোক্ষ লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য হই, আর তুমি যদি তখন ততদূর প্রস্তুত না থাক, তবে যতদিন না তুমি আমার মত যোগ্য হইবে, ততকাল তোমার জন্য আমাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ তুমি যদি আমার অগ্রে মোক্ষদ্বারে উপনীত হও, আর আমি অন্যদিকে নিবিষ্ট থাকি, তবে তোমাকে ও আমার আগমনের অপেক্ষায় তথায় বসিয়া থাকিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "না, তবে আমার দীক্ষাগ্রহণ করা উচিত নয়—তুমি বাল্যকালাবধি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছ, এতকষ্ট স্বীকার করিয়া কত শীত সহ্য করিয়া কত সাধন ভজন করিয়া কামরিপুকে জয় করিয়াছ, এক কথায় বলিতে মহাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ; আর আমি কি প্রকৃতির লোক, তাহা আমি বিলক্ষণ দেখিতেছি, তোমার বিরক্তির ভয়ে জামা জুতা ছাড়িয়াছি, ফলতঃ আমি এখনও বাবু রহিয়াছি। আমার সহিত তোমাকে সম্বন্ধ করিলে তোমারই ক্ষতি, তুমি প্রস্তুত হইয়াও কতকাল যে আমার অপেক্ষায় থাকিতে বাধ্য হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।"

এই কথার পরই বাবা আমাকে দীক্ষা দিলেন এবং সাধনার ক্রম বলিয়া দিলেন। আমি তাঁহার উপদেশ কিভাবে বুঝিয়াছি তাহা প্রকাশ করিলে, গুরুদেব বলিলেন, "ওরে, এই বিষয়ে তোর পূর্ব্বে খাটা আছে দেখিতেছি। আচ্ছা, শেষভাগ অবধি চলিতে থাকুক।" গুরুদেব আমাকে পুষ্প বিল্বদলের ব্যবস্থা দেন নাই; মন্ত্র দিয়া বলিলেন "গুরুবাক্য পাইলে ত, এখন গুরু বেদান্ত বাক্যের ঐক্য সাধন কর।" এই কথার ভাব এইরূপ বুঝিলাম—বেদাদি শাস্ত্র সমূহ যে এই কথাই চরমপ্রতিপাদন করিতেছে, এইটি যুক্তি দ্বারা বুঝিয়া নিতে হইবে।

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্ম বেদ নেতরঃ॥

অর্থাৎ ঃ—ঋষিবাক্য ও ধর্ম্মোপদেশকে বেদের অবিরুদ্ধ তর্কদ্বারা অনুসন্ধান করিলে ধর্ম্ম জানা যাইতে পারে। অন্য উপায়ে কেহ সমর্থ নহে।

আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা পুনরায় বলিতেছি। গুরু আমাকে জ্যামিতির একটি প্রতিজ্ঞা (Proposition) কসিতে দিয়াছেন। তাহার উপপত্তি আস্তিক দর্শনের যুক্তি দ্বারা সাধন করিতে হইবে এবং বেদান্ত বাক্যের সহিত মিলিলেই, ঠিক উপপত্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। লোকের সাধন-ভজন একরূপ, আমার কার্য্য-কলাপ অন্যরূপ। আমার পক্ষে বেদ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনাই সাধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের মধ্যে "অমুক অমুকের শিষ্য" বলিতে মন্ত্র দানাদান বুঝায়। মন্ত্র ভিন্ন একে অন্যের শিষ্য হইতে পারে একথা আমরা মানিতে পারি না। ব্রহ্মচারী এই ভাবটী পরিবর্ত্তন করার জন্য অনুগতদিগকে শিষ্য না বলিয়া "হে শাসন যোগ্য"! এই সম্বোধন করিতেন। তাহাতে মন্ত্র গ্রহণ না করিয়াও শিষ্য হইতে পারে, এমন বুঝাইতেন।

ঢাকা জজকোর্টের গভর্ণমেণ্ট উকিল ৺রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে চাহিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "মন্ত্রণা মন্ত্র না"। অর্থাৎ তোমাদের গুরুরা কাণে কাণে মন্ত্রণা দিয়া থাকেন তাহা কিন্তু মন্ত্র নয়, তাহাকে মন্ত্রণা বিশেষ বুঝিতে হইবে।

সাধারণ লোক দীক্ষা নেয় অভীষ্ট দেবতা দর্শনের জন্য। আমার সাধনের শেষ সীমা অন্যরূপ। গুরু বিশেষ করিয়া বলিলেন, "তুমি ইহা অবলম্বন করিয়া নিদিধ্যাসন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে।"

আমি বলিলাম নিদিধ্যাসন কাহাকে বলে? এই প্রশ্ন ২।৩ বার করিয়াও কোন উত্তর পাইলাম না। তখন স্থির করিলাম এই বিষয়টি আমার নিজ জ্ঞাতব্য।

কিছুকাল পরে গুরুদক্ষিণার কথা উঠিল। গুরুদেব একদিন বলিলেন, "দেখ, এখন আমি তোর বাবা আছি, আচ্ছা তুই আমার বাবা হইতে পারিস্ কি?" আমি ইহার কি উত্তর দিব ভাবিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। সহসা মনে উদয় হইল, গুরুর কৃপা হইলে সকলই হইতে পারে, অসম্ভব ও সম্ভব হয়; সুতরাং গুরুর বাবা হওয়া অসম্ভব নহে। এইরূপ স্থির করিয়া বলিলাম, "তোমার বাবা হইতে পারি।" গুরুদেব উত্তর শুনিয়া বিশেষ তুষ্ট হইয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "এই আমার গুরুদক্ষিণা স্থির হইল, তুমি যখন আমার বাবা হইবে, তখন তোমার গুরুদক্ষিণা শোধ হইল জানিবে।" আমিও তাহা মানিয়া লইলাম।

আমি কি পাইয়াছি

আমি এই জন্মে গুরুদেব লোকনাথের নিকট হইতে যে বিদ্যা অথবা যেই সাধন প্রণালী প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা প্রকাশ করিবার জন্য অনেকে আমার প্রতি পীড়াপীড়ি করিতেছেন। তাঁহারা ভাবেন আমি কথাটী ভাঙ্গিলেই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। আমি যদি তেমন বুঝিতাম, তাহা হইলে দর চড়াইবার জন্য কখনও এমন নিষ্ঠুরতা করিতাম না।

আমি যদি বলি, আমি সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাহাতে লোকে কি বুঝিবে? সুষুম্না নাড়ী অপ্রকাশ। বেদ স্মৃতিতে সুষুম্নার যে লক্ষণ জানা যায় তন্ত্রাদিতে তাহার বিরুদ্ধ

ভাব দেখিতেছি। লোকগুলি যদি সেই তন্ত্রের উপদিষ্ট নাড়ী পথও খুলিয়া লইতে পারে তাহাও মন্দের ভাল। সাধক তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া চরম নাড়ী পথ আয়ত্ত করিতে পারিলে আমার গন্তব্য নাড়ী পথের দোষগুণ বিচার করিতে সমর্থ হইতে পারেন এবং আবশ্যক হইলে আমার অনুসরণ করিতে পারিবেন, না হয় তন্ত্রমতেই নিবিষ্ট থাকিবেন। এজন্য এতদুপলক্ষে তন্ত্রোক্ত নাড়ী বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। আমি লোকদিগের অবলম্বিত পথের দোষ দেখাইতে পারি কিন্তু লোকদিগের গুণের পথে চালাইতে পারি না। দোষ ত্যাগ করিয়া গুণ গ্রহণ করা তাহাদের নিজের যত্নসাধ্য।

বাঙ্গালীর তান্ত্রিক গুরু

বেদ স্মৃতিমতে যিনি বেদমন্ত্র মুখাগ্রত করান, তাঁহার নাম আচার্য্য গুরু ; ও যিনি শিষ্যের জ্ঞান জন্মাইতে পারেন, তাঁহাকেই প্রকৃত গুরু বলে। তবে, আচার্য্যকে গুরু বলা হয় কেন? যেহেতু আচার্য্য জ্ঞান প্রাপ্তির পথে বা জ্ঞানলভ্য মুক্তির পথে শিষ্যকে প্রবেশ করাইয়া থাকেন, এজন্য তাঁহার গুরুত্ব ঘটে। আচার্য্যের ন্যায় বেদমন্ত্র না দিয়াও যিনি অন্য উপায়ে শিষ্যকে ঐ পথে প্রেরণ করেন, তিনিও গুরুশব্দের বাচ্য হইতে পারেন। যাঁহারা বেদমন্ত্র দেন না, জ্ঞানের পথ বা মুক্তির পথ ও জানেন না, সুতরাং সেই পথে শিষ্যকে চালাইতেও পারেন না। কেবল তান্ত্রিকমন্ত্র কর্ণে প্রবেশ করাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গুরু বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলে ঐরূপ তান্ত্রিক গুরুকরণ আমাদের মধ্যে কিভাবে

প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তন্ত্র কাহাকে বলে, আর তন্ত্রের কতদূর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণের গ্রাহ্য ও কি পর্য্যন্ত ত্যজ্য, এসকল প্রশ্ন সমাধান জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা যাইতেছে।

ষটচক্র ও তন্ত্র

বঙ্গদেশে ষট্‌চক্রের কথা অধিক মাত্রায় প্রচলিত। বর্ত্তমান সময়ের, কি ইহার অল্প পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকগণের ষট্‌চক্রই প্রধান অবলম্বন ছিল। রামপ্রসাদের—"তারা তুমি আছ গো অন্তরে, কুলকুণ্ডলীনি ব্রহ্মময়ি মা, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, নাভিস্থান, অনাহত বিশুদ্ধাজ্ঞাবরে গো।" ইত্যাদি গানে একথা প্রমাণিত হয়। পুরোহিতদিগের দেবার্চ্চনাতে ভূতশুদ্ধি ব্যাপারে এই ষট্‌চক্র ভেদ করিতে হয়। অতএব এবিষয়ের আলোচনা আবশ্যকীয় হইয়াছে। পূর্ণানন্দ গোস্বামী নামক কোন সাধক, "শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণি" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হস্তাক্ষরে লিখিত সেই পুস্তক এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। সেই পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৫৫টি শ্লোকে ষট্‌চক্র নিরূপণ সমাপ্ত হইয়াছে। "কৈবল্য কলিকা" নামক তন্ত্রের দ্বিতীয় পটল অবলম্বনে, অথবা তাহার শ্লোক উদ্ধার করিয়া, পূর্ণানন্দ এই "ষটচক্র নিরূপণ" নামক পুস্তক লিখিয়াছেন। "ষট্‌চক্র" নামক পুস্তক বাঙ্গালাভাষাতে বিস্তর পাওয়া যায়, সম্প্রতি উহার ইংরাজীতে অনুবাদ হইতেছে। তাহার নাম Tantrik Texts edited by Arthur Avalor Vol II (Sanskrit Press Deposoitory 30, Cornwallis Street, Calcutta).

আমি মূল ষট্‌চক্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাই। পূর্ণানন্দ উহা এইভাবে আরম্ভ করিয়াছেন।

"অথ তন্ত্রানুসারেণ ষট্‌চক্রাদি ক্রমোদ্গতঃ।
উচ্যতে পরমানন্দনির্ব্বাহ প্রথমাঙ্কুরঃ॥"

অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করার উপায় নির্দ্দেশ করা, পূর্ণানন্দের অভিপ্রেত দেখা যায়। কিন্তু হিন্দুর চরমমুক্তি বলিয়া যাহা শুনা যায়, টীকাকারগণ তৎসমস্তই ইহার মধ্যে ভুক্ত করিয়া দিতে চাহেন। টীকাকার কালীচরণ এই বলিয়া টীকা আরম্ভ করেন— "মহাযোগ-জ্ঞানাৎ পরিচিত-ষড়ম্ভোজ-বিভবঃ স এবাস্তস্তত্ত্বপ্রকটন-সমর্থো নহি পরঃ।" অর্থাৎ এই ষটচক্র সাধন ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে অন্তস্তত্ত্ব বাহির করা যাইতে পারেনা। টীকাকার যদি এই ষট্‌চক্র দ্বারা অন্তস্তত্ত্ব নিরূপণ করা যায় মাত্র বলিতেন, তবে মনে করা যাইত, তিনি হয় ত এই ষট্‌চক্র দ্বারা অন্তস্তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু যখন বলিতেছেন, 'নহি পরঃ'— অর্থাৎ অন্য কোন উপায়ে অন্তস্তত্ত্ব জানা যায় না,—তখন এরূপ টীকাকারের কথার যে মূল্য কত, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। ষট্‌চক্র ভেদ নামক টিপ্পনীকার শঙ্কর, টিপ্পনী আরম্ভে প্রথম শ্লোকস্থ "পরমানন্দ নির্ব্বাহ' কথাতে 'জ্ঞান প্রাপ্তি' বুঝাইতে চান।—"কারণ, পরমানন্দ হইল নিরঞ্জন; তাহাতে যে নির্ব্বাহ, তাহা হইল জ্ঞান প্রাপ্তি।" টীকাকার কলীচরণ বলেন,— "পরমানন্দ নির্ব্বাহ কথাতে, পরমানন্দ অর্থ ব্রহ্ম, আর নির্ব্বাহ কথাতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। অর্থাৎ পরমানন্দ নির্ব্বাহ কথাতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বুঝায়।" পূর্ণানন্দের কথা দ্বারা অন্ততঃ বিশেষানন্দ লাভ পর্য্যন্ত বুঝা যায়। মূল গ্রন্থ সমাপ্তিতে জানা যায়, ষটচক্র সাধন করিলে "নিত্যানন্দ পরম্পরা প্রণোদিত" হওয়া যায়; ইহাতে যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রভৃতি বলিয়া ব্যাখা করা,— তাহা কেবল টিকাটীপ্পনীকারদিগের অসীম অনুগ্রহের ফল মাত্র। আমি ঐ গ্রন্থ যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে

বুঝিলাম ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা জ্ঞানপ্রাপ্তি কাহাকে বলে, টীকা-টিপ্পনি কারেরা তাহা জানেন না।

মিষ্টার এভেলন অনেক যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়া তিনখানা টীকা-টিপ্পনী সংগ্রহ করতঃ ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। তাহাতেই তাহার সহায়তা কল্পে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, ষট্‌চক্র ভেদের জন্য তিনি, তিনখানা Key (চাবি) সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ষট্‌চক্রনিরূপণ প্রণেতা স্বয়ং পূর্ণানন্দ উহার প্রকৃত Key (চাবি) পাইয়াছিলেন কিনা, একথা তাহার বিচার করা অগ্রে উচিত ছিল। ষট্‌চক্র নিরূপণের ৫০ শ্লোকে "জ্ঞাত্বা শ্রীনাথবক্ত্রাৎ ক্রমমিতি চ মহামোক্ষবর্ত্ম প্রকাশম্। এবং ৫৪ শ্লোকে "শ্রীদীক্ষাগুরু পাদপদ্ম যুগলামোদ প্রবাহোদয়াৎ।" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সেই চাবিটি গুরুর হাতে থাকা প্রকাশ পায়। পূর্ণানন্দ যদি ষট্‌চক্রভেদের ক্রমটি জানিতেন, তাহা হইলে "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি" নামক বৃহৎ গ্রন্থ (যাহার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষট্‌চক্র নিরূপণ রহিয়াছে) প্রণয়ন করিয়া, তাহাতে অবশ্য ষট্‌চক্র ভেদের ক্রমও প্রকাশ করিয়া দিতেন। ফলতঃ "ষট্‌চক্র নিরূপণ" এই নাম দ্বারা কোথায় কোন চক্র রহিয়াছে, কেবল তাহারই পরিচায়ক গ্রন্থ রচিত হইতেছে, বুঝা যায়। সাধারণের উপকারার্থে মিঃ এভেলন বহুযত্ন পূর্ব্বক উক্ত গ্রন্থ প্রচার করিতেছেন; তাহার ফল একটি চাবি শূন্য বদ্ধ বাক্স দশজনকে দেখাইলে, কেহই যেমন বাক্সের অভ্যন্তরের অর্থভাগী হয় না, এখানেও ঠিক্ তেমনি হইতেছে।

তবে মূল "কৈবল্য কলিকাতন্ত্র" মধ্যে এরূপ চাবিশূন্য বাক্সের ন্যায় দ্বিতীয় পটলে ষট্‌চক্র বর্ণনা করা হয় কেন? আমরা যদি এই কথার সত্য উত্তর দিতে যাই, তাহা হইলে বলিতে হয়—ইহা তান্ত্রিক গুরুগণের ব্যবসাদারী ফন্দিবৈ আর কিছু নহে। আমরা কি সাহসে সেই তান্ত্রিকদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গুরুগণের প্রতি এমন আক্রমণ করিতেছি তাহাও বলি। তান্ত্রিক গুরুগণের

মন্ত্র যৎপরোনাস্তি গোপনীয় ; বৈদিক মন্ত্র কিন্তু তেমন নহে। তাহা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ত্রিবর্ণেই মুখস্থ করিতে পারে, এমন কি স্ত্রী-শূদ্রদিগকে স্মৃতি করিয়া তাহার ভাব বুঝাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তান্ত্রিক মন্ত্র সম্বন্ধে কথিত আছে,—"বেদশাস্ত্র পুরাণানি সামান্যাগণিকা ইব। ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব।" তান্ত্রিকগণের গোপন ব্যাপারে এই সকল আদর যত্নের ব্যবহার খণ্ডন করিবার জন্য আমি অন্য তন্ত্রের আশ্রয় পাইয়াছি। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এই গোপনের বিরুদ্ধে কথিত হইয়াছে, "ন গুপ্তির-নৃতং বিনা"। চোরেরাই গোপন করে ; ফলতঃ মিথ্যা ছাড়া সত্যের গোপন নাই।

আমাদের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের নাম হইলেই মাথা হেঁট করিয়া থাকি। এখানে এক তন্ত্রদ্বারা অন্য তন্ত্রের মত খণ্ডিত হইতে দেখিয়া, তন্ত্র কাহাকে বলে—তাহার একটু ব্যাখ্যা করিতেছি। তন্ত্র কথাতে "মত", "সম্প্রদায়", "দল বা গোষ্ঠী" বুঝিতে হয়। যেমন স্বতন্ত্র, পরতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সাধারণ তন্ত্র, শাক্তত্ন্ত্র, বৈষ্ণব তন্ত্র, শৈবতন্ত্র ইত্যাদি। তবেই বুঝাগেল, সাম্প্রদায়িক মত বিশেষের নাম তন্ত্র। মহাভারতে যুধিষ্ঠীর বলিয়াছেন, "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"—এমন মুনি নাই, যাহাদের মধ্যে মতভেদ না আছে। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য এই যে, নানা মুনির মত স্বরূপ তন্ত্রগুলির বিচার করতঃ যেগুলি বেদ-স্মৃতি সম্মত হয়, তৎসমুদয় স্মৃতিশাস্ত্ররূপে গ্রহণ করা এবং শ্রুতি-স্মৃতি বিরুদ্ধ তন্ত্রগুলিকে যত্নের সহিত পরিবর্জ্জন করা।

বেদব্যাস, বেদান্তসূত্রে, সাংখ্য ও পাতঞ্জল ও বৈষ্ণবদিগের পঞ্চরাত্র, শৈবদিগের পাশুপত মত প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন ; শঙ্করাচার্য্যও তদনুরূপ ভাষ্য করিয়াছেন। এরূপ হইলে কৈবল্য-কলিকাতন্ত্রের দ্বিতীয় পটল ও তাহা হইতে সংগৃহীত পূর্ণানন্দের

ষট্‌চক্র নিরূপণকে কোন্ দলে ফেলিতে হইবে তাহাও বিবেচ্য। এতদুপলক্ষে ষট্‌চক্রের প্রকৃত ভাব শাস্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিজের ও শিষ্যদিগের অনুভূতির সহিত ঐক্য করিয়া আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

আমাদের দেহের মধ্যে সেই ছয় চক্রের স্থান জানা যায়। সেই ছয়টি চক্র বা ছয়টি পদ্ম নাড়ী নামক সূত্র বিশেষ দ্বারা যেন গ্রন্থিত রহিয়াছে। তোমাকে সেই সূত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। যাইবে কোথায়? ইহার উত্তর স্বরূপ চক্র বা পদ্ম ছয়টির স্থান বলা যাইতেছে। প্রথম মূলাধার নামক চতুর্দ্দল পদ্ম গুহ্যোর্দ্ধভাগে, লিঙ্গমূলে অবস্থিত; দ্বিতীয়, স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়্‌দলপদ্ম নাভি ও প্রথমোক্ত পদ্মের মধ্যবর্ত্তী স্থলে। তৃতীয়, মনিপুর দশদল পদ্ম—নাভিস্থলে। চতুর্থ—অনাহত নামক দ্বাদশদল পদ্ম বক্ষঃস্থলে অবস্থিত, ইহাকে হৃৎপদ্মও বলা যায়। পঞ্চম—বিশুদ্ধ নামক ষোড়শদল পদ্ম কণ্ঠদেশে; ষষ্ঠ—আজ্ঞা নামক দ্বিদলপদ্ম ভ্রূদ্বয়ের উপরিভাগে অবস্থিত মনে করিতে হইবে। এখানে যে সকল স্থানের নির্দ্দেশ করা গেল, তাহার বর্ণনা ইহাই যথেষ্ট নহে। ঐ সকল স্থান চর্ম্মমাংস রক্ত ও অস্থি ইত্যাদির মধ্যে কাহার অন্তর্গত, একথাও বুঝিতে হইবে। সেজন্য বলি পদ্মগুলি যতদূর বিস্তৃত চিন্তা করিতে হয়, তোমার ইচ্ছামতে করিও। কিন্তু তাহার মধ্যবর্ত্তী গাঁথিবার অংশটি **মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে** থাকা চাই। গ্রন্থন সূত্র বা ভেদ করিবার পথটি ঠিক্ মেরুদণ্ডের মধ্যদিয়া হইবে। শ্রুতি-স্মৃতি মতে, এই সকল চক্র চিন্তা না করিয়া (উপযুক্ত অধিকারী ব্যক্তি হইলে) মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সেই সূত্র বা নাড়ী পথে ষট্‌চক্র ভেদ করিতে পারেন। শ্রুতি-স্মৃতিমতে এই নাড়ীর নাম সুষুম্না নাড়ী। তান্ত্রিক দিগের এই সকল গোপনীয় বলিয়া তাঁহারা ষট্‌চক্রের মালা গ্রন্থনকারী ঐ নাড়ীকে ঠিক সোজাসুজি সুষুম্না ত বাহিরের কথা,—

সুষুম্নার মধ্যে চিত্রাণী নাড়ী, সেই চিত্রাণীর মধ্যে ব্রহ্ম নাড়ী এবং এই ব্রহ্মনাড়ীই ষট্‌চক্রকে ভেদ করিয়াছে।

এতগুলি কথার পরে, ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া যাইবে কোথায়? এই কথার উত্তর দিতেছি; তান্ত্রিকদিগের মতে সেই গন্তব্য স্থানটি দ্বিদলের উপরে সহস্রারে (আধুনিকেরা যাহা মস্তিষ্ক বলিয়া ব্যাখ্যা করে)। তান্ত্রিক ষট্‌চক্র সাধন এখানে শেষ, তাহার উপর আর কথা নাই। কিন্তু বেদ-স্মৃতি মতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া দেহের বাহিরে যাইতে হয়। পাঠককে এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ মত হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশের প্রেম-ভক্তি সেবকের দল যুক্তি তর্ক ছাড়িয়া দিয়া, সহজ উপায় বিশ্বাসকেই সার ধরিয়াছেন। তান্ত্রিকেরা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদপূর্ব্বক উর্দ্ধগমন না করিয়া এই দেহের মস্তিষ্ক মধ্যে থাকিয়াই সত্তায় মোক্ষ লাভ করিতে চাহেন। "ষট্‌চক্র নিরূপণের" ৫৪ শ্লোকে এই—"জ্ঞাত্বৈতৎ ক্রমমুত্তমং যতমনাযোগী যমাদৈর্যুতঃ শ্রীদীক্ষাগুরু পাদপদ্ম যুগলামোদ প্রবাহোদয়াৎ সংসারে নহি জন্যতে নহি কদা সংক্ষীয়তে সংক্ষয়ে নিত্যানন্দ পরম্পরামুদিতঃ শান্তঃ সতামগ্রণীঃ॥" (অর্থাৎ যম নিয়মাদি অভ্যাসশীল যোগী ব্যক্তি, দীক্ষাগুরুর কৃপা ষট্‌চক্র ভেদের ক্রম জ্ঞাত হইয়া কখনও সংসারে জন্ম গ্রহণ করে না, মহাপ্রলয়েও বিনষ্ট হয় না, নিত্যনন্দ পরাম্পরাতে প্রমোদিত হইয়া শান্ত ও সৎদিগের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী হইয়া থাকে)। কিন্তু আমরা জানি দেহ মাত্রই বিনাশশীল, কোন দেহধারীই ঐরূপ জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়া থাকিতে পারে না; মার্কণ্ডেয় সপ্তকল্প জীবী; ব্রহ্মাদিরও পাত ঘটে। তবে তন্ত্রমতে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া যাহারা অমর হইয়া থাকেন, তেমন লোক ত আমরা খুঁজিয়া পাই না, তাহাদের মধ্যে একজনেরও নাম কি কেহ করিতে পারেন? অথবা কেহ দেখিয়াছেন কি? তাহাতেই বলিতে ছিলাম এ সকল তন্ত্র তান্ত্রিক গুরুদিগের ব্যবসাদারী ফন্দি মাত্র এবং বেদ-স্মৃতির সহিত

মিল করিতে গিয়া এগুলিকে রক্ষাকরা দুষ্কর। তবে একথা বলিতে হয় যে বর্ত্তমান কালের সভ্যসমাজ যে বহির্বিজ্ঞান বা জড়-বিজ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ও দিন দিন অশান্তি ও অসুখের মাত্রা বাড়াইতেছেন, তাঁহারা বাহির ত্যাগ করিয়া তন্ত্রমতে ষটচক্র সাধনে মনোনিবেশ করিলে মন্দের ভাল হয়। আমরা ষটচক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে প্রবেশ করিলে মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়, এ কথার প্রতি আপত্তি করিলাম বটে, কিন্তু তাহারা যে সুখ ভোগ করে তাহার প্রতি আমাদের আপত্তি করা চলে না। কারণ তাহারা নিজেরা সুখ ভোগ করে এবং বলে, তাহার বিরুদ্ধে আমরা কিরূপে বলিতে পারি তোমরা সুখ ভোগ কর না? এই ষটচক্রের দল যতই সাজ গোজ করিয়া কথা বলিয়াছে ততই প্রতিবাদার্হ হইয়াছে। "হঠযোগ প্রদীপিকা"তে হঠযোগীরা ইহা অপেক্ষা বিলক্ষণ সরল কথা বলিয়াছেন।—

"সোহয়মেবাস্ত মোক্ষাখ্যোমাস্তবাপিমতান্তরে। মনঃপ্রাণ লয়েকশ্চিদানন্দঃ সম্প্রবর্ত্ততে॥ ৩০ শ্লোক ৮৭ পৃষ্ঠা। অস্তু বা মাস্তুবা মুক্তিরত্রৈবা-খণ্ডিতং সুখম্॥ ৭৮ শ্লোক ১০১ পৃষ্ঠা। তাহারা বলেন তোমরা ইহাকে মোক্ষ বল আর না-ই বা বল, আমরা কিন্তু ইহাতে বিলক্ষণ সুখ ভোগ করিতেছি।" এখনকার দিনের সভ্যসমাজ অন্তুতঃ এই সুখের ভাগী হইতে পারিলেও আমরা সুখী হই। ফলতঃ শরীর সম্বন্ধীয় কায়দা কানুন (হঠযোগ) করিয়া যে যতই সুখ লাভ করুক না কেন তাহা স্থায়ী হইবার আশা করা যায় না, কেহ ১০ মিনিট ৫ মিনিট সেই সুখ ভোগ করিলে করিতে পারেন, কিন্তু কোনরূপেই তাহা নিত্য হইতে পারে না। পরিণামে দেহ বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সুখ অন্তর্হিত হইবে একথা ধ্রুব।

হঠযোগ শাস্ত্রের একটু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। ইহা মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও আদিনাথ প্রভৃতি গুরুদিগের গ্রন্থ।

শ্রীআদিনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া স্বাত্মারাম যোগী হঠযোগ প্রদীপিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। (কলিকাতা বীডনষ্ট্রিটে নূতন কলিকাতা যন্ত্রে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত)। এই "হঠযোগ প্রদীপিকা" এবং ষটচক্র নিরূপণ" উভয় গ্রন্থ মতেই কুণ্ডলিনী বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে সর্পাকারে অবস্থিত, ষটচক্র ভেদকারিণী নাড়ীর প্রবেশ মুখ বন্ধ করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন। যোগীরা আপনাপন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত উপায়াবলম্বনে সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইয়া উক্ত নাড়ী মধ্যে প্রবেশ ও ছয়পদ্ম ভেদ করিয়া থাকেন। হটযোগ প্রদীপিকার তৃতীয়োপদেশের ১।২।১০৬।১০৭ সংখ্যক শ্লোক এবং চতুর্থোপদেশের ১৭।১৮। ১৯ শ্লোক ও ষট্‌চক্র নিরূপণের ১০।১১।১২।৫০ সংখ্যক শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া, মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দেশে, ক্রমে ক্রমে ছয়চক্র ভেদ ও অতিক্রম করতঃ সহস্রারে (মস্তিষ্ক মধ্যে) প্রবেশ করিয়া এই সকল তান্ত্রিক ও হঠযোগ সম্প্রদায়ের সাধকগণ বিশিষ্ট আনন্দানুভব করিতে পারেন, একথা আমরা অস্বীকার করি না, বরং অনুমোদন করিতে পারি। কিন্তু আস্তিক হিন্দুগণ যে সেই ক্ষণিক আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আবদ্ধ থাকেন, ইহা আমরা ইচ্ছা করি না। আস্তিক হিন্দুর পক্ষে এই সকল উপায়ে অথবা অন্য কোন উপায়ে যে ভাবেই হউক, মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা দেহ হইতে বহির্গত হওয়ার অভ্যাস করা চাই। এই বিষয়টি আমাদের নিতান্ত অনভ্যস্ত নহে, তাহাতেই এরূপ মত প্রকাশ করিতে পারিতেছি। অপর সাধারণেরা যদি উক্তরূপ আনন্দ ভোগের জন্যও মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিতে অভ্যাস করিতে থাকেন, তাহা হইলে ইহ জন্মে না হউক, জন্মান্তরে এই অভ্যাসের ফলে আস্তিকজনোচিত গতি লাভ করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

আস্তিক ব্রাহ্মণের লক্ষ্য মোক্ষ (নির্ব্বাণ মুক্তি)। তাঁহাদের তান্ত্রিক ষট্‌চক্রের পথ ধরিলে ঠকিতে হইবে। কারণ ইহা তাহার অনুকূল পন্থা নহে বরং অন্তরায়। তাহাতেই বলিতে ছিলাম মিঃ এভেলন ষট্‌চক্ররূপ বাক্‌সটি উদ্‌ঘাটনের চাবি (Key) প্রাপ্ত হন নাই, তাহা আমাদের হস্তগত রহিয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধ লিখিয়া সেই চাবিটিকে পাঠকগণের হস্তে তুলিয়া দিতেছি। আমাদিগের আকার ইঙ্গিতের বর্ণনাদ্বারা পাঠকগণ ধারণ করিয়া লইবেন। ভগবদ্গীতাতে মোক্ষ পঁহুছিবার দুইটি পথ কথিত আছে। (১) কর্ম্মযোগ ও (২) জ্ঞানযোগ। কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে নাস্তিক দল জন্মগ্রহণ করিয়া শূন্যবাদ আবিষ্কার করিয়াও নূতন নির্ব্বাণ মুক্তি দেখাইয়া ঐ পথদ্বয়ের মুখে তালাবদ্ধ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি তাহার চাবি দেখাইয়া দেন।

সেই পথদ্বয়ের প্রতি বর্ত্তমানে কয়েকটী তালা লাগিয়াছে।

১। "বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।"

২। "নির্ব্বিকার নিরাকার ব্রহ্মকে মন্দিরে গিয়া চক্ষু বুজিয়া আয়ত্ত করা; তিনি দয়াময়, প্রেমময়, রাজা বা পিতা, সুতরাং আমাদের মঙ্গল করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত আছেন; খোসামোদ করিলে তিনি সুখী হইবেন, খোসামোদই উপাসনা।"

৩। "ধর্ম্মকর্ম্মগুলি কুসংস্কার; যাহারা ধর্ম্মের জন্য স্বার্থত্যাগ করে, তাহারা, নির্ব্বোধ; দশের চক্ষে ধূলা দিয়া নিজে মজা লুঠা, দশের মুখে বাহবা লওয়াই পরমানন্দ; যে যত অধিক লোকের মুখ হইতে বাহবা লইয়া আনন্দলাভ করিতে কৃতকার্য্য হয়, সেই তত আনন্দময় ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া থাকে।"

৪। এই সকল তালার মধ্যে আমাদের বর্ণিত তন্ত্রের ষট্‌চক্রকেও একটি ধরা যাইতে পারে; আমরা এই সকল ভাব ধরিতে পারিয়াছি, বুঝিয়াছি ইহা ছেলে ভুলান মোয়া বিশেষ। আস্তিক ব্রাহ্মণের পক্ষে

এসকল পন্থা অবলম্বন করা উচিত নহে। ইহাকেই "চাবি আমাদের হস্তগত" বলিলাম।

——:-:——

বেদ বিরুদ্ধ তন্ত্র শাস্ত্র

এতক্ষণ আমারা যে সকল কথা বলিলাম, তদ্দারা এই সকল তন্ত্র বা হঠযোগের সাধন প্রণালীকে বেদ-স্মৃতির বিরুদ্ধ এবং আস্তিক পক্ষে উপেক্ষণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক তন্ত্রই শিবোক্ত বলিয়া খ্যাক; নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বিষ্ণোক্ত তন্ত্রও বিদ্যমান আছে। আমরা সেই সকল বিষ্ণু বা শিবোক্তিকে উপেক্ষা করিবার কে? এমন আশঙ্কা অনেকেরই হইতে পারে। তাহাদের শঙ্কা দূর করা আবশ্যক।

রুদ্র, ব্রহ্মার পঞ্চম শির ছেদ করিলে ব্রহ্মার মৃত্যু হয় এবং পুনরায় ব্রহ্মা যোগবলে বাঁচিয়া উঠেন; তখন ব্রহ্মহত্যা রুদ্রাবিষ্ট হইলে রুদ্রদেব ব্রহ্মার ছিন্নমুণ্ড ধারণ করতঃ ভিক্ষাটন করিয়া ছিলেন; তদবস্থায় নৃত্যমান হইলে, তাঁহার দেহ হইতে উচ্ছৃষ্ট রুদ্র বলিয়া বহুসংখ্যক রুদ্রাংশ জন্মগ্রহণ করে। রুদ্র বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্মহত্যা সম্পর্কে জাত সেই উচ্ছৃষ্ট রুদ্রগণের কার্য্য বেদসম্মত হয় না। এদিকে বিষ্ণু কলিতে বেদ লোপ করার জন্য আপন দেহের অংশ হইতে মায়ামোহ অবতারের সৃষ্টি করেন। সেই অবতারই বুদ্ধ, আর্হত (জিন) প্রভৃতি নামে খ্যাত। বর্ণিত ভাবাপন্ন শিব ও বিষ্ণুর অংশ সকল কলিতে বেদবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া থাকেন। কূর্ম্ম পুরাণের পূর্ব্বভাগে ষোড়শ অধ্যায়ের ৪০ পৃষ্ঠাতে কথিত আছে,—দক্ষযজ্ঞ সময়ে দধিচী মুনি ঋষিদের প্রতি এই অভিসম্পাদ দেন যে, "আপনারা বেদভ্রষ্ট ও শিবদ্বেষী হইয়া কলিতে জন্মগ্রহণ করিবেন" এবং গৌতম মুনি সেইরূপ বহুসংখ্যক ঋষিদিগের প্রতি অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, যে "আপনারা বেদভ্রষ্ট

ও শিবদ্বেষী হইয়া কলিতে জন্মগ্রহণ করিবেন” এবং গৌতম মুনি বহুসংখ্যক ঋষিদিগের প্রতি অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, যে “আপনারা বেদভ্রষ্ট হইয়া কলিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুনিন্দা করিবেন।” তদনুসারে ঐ সকল ঋষিগণ কলির ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া একদল বিষ্ণুভক্ত হইয়া শিবনিন্দা ও অপর দল শিবভক্ত হইয়া বিষ্ণুদ্বেষ প্রচার করিতে থাকেন এবং দেশ ভাষাতে আপনাপন প্রিয় বিষ্ণু ও শিবকে গানদ্বারা স্তব করিয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণে শিব বিষ্ণুকে বলিলেন, ইহাদের কি কোন পুণ্য বিদ্যমান আছে, যদ্দ্বারা আমরা ইহাদের হিতসাধন করিতে পারি?” বিষ্ণু উত্তর করিলেন, “ন বেদবাহ্যে পুরুষে পুণ্যলেশোঽপি শঙ্কর সঙ্গচ্ছতে মহাদেব ধর্ম্মোবেদাৎ বিনির্ব্বভৌ॥”—(হে শঙ্কর, ধর্ম্ম বেদ হইতে উত্থিত হয়, ইহারা বেদবহিস্কৃত হওয়াতে ইহাদের মধ্যে পুণ্যলেশও থাকিতে পারে না)। তখন শিব ও বিষ্ণু উহাদের ঐ নাস্তিকতার উপযুক্ত বেদবাহ্য মোহশাস্ত্র সকল প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। সেই সকল মোহশাস্ত্রদ্বারা প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হওয়াতে ব্রাহ্মণকুলেজাত ঐ সকল শাপগ্রস্থ পুরুষেরা তাহাতে আকৃষ্টমনা হইয়া মোহশাস্ত্র অনুসরণ করেন এবং কালে তদ্দ্বারা পুণ্যবান্‌দিগের পথ আশ্রয় করিতে যোগ্য হইয়া থাকেন। যথা:—

“এবং সম্বোধিতো রুদ্রো মাধবেন মুরারিণা।
চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবেরিত॥
কাপ্রালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিম্।
পঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥ ইত্যাদি।”

ইতিহাস পুরাণের প্রমাণদ্বারা শিব ও বিষ্ণুকর্ত্তৃক মোহশাস্ত্র প্রণয়ণের কথা অবগত হইয়া বেদ ও স্মৃতিবিরুদ্ধ শিব ও বিষ্ণুর উক্তি পাইলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি। আরও বলি কেবল সংস্কৃত ভাষায় “শিব উবাচ” পাইলেই সর্ব্বত্র তাহা শিবোক্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়ার দিন আর এখন নাই। আমি অবগত আছি

আমার পরিচিত কোন কায়স্থ জাতীয় সন্ন্যাসী, শিব-পার্ব্বতী সংবাদের অভিনয়ে তন্ত্রের ভাষাতে তন্ত্র নাম দিয়া একখানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা এ বৃত্তান্ত অবগত নহেন, তাহারা ঐ পুস্তকখানাকেও শিবোক্ত তন্ত্র বলিয়া মনে করিতে পারেন। এমত অবস্থাতে বিলক্ষণ বিচার না করিয়া আমরা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রহণ করিতে পারি না।

ইহার পরেও যদি কেহ আপত্তি করেন যে পূর্ণানন্দ গোস্বামী সংগৃহীত ষট্চক্র নিরুপণে, উহা ভেদ করিবার ক্রম নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও অন্যান্য তন্ত্র হইতে টীকা-টিপ্পনীকারগণ যে সকল শ্লোক আহরণ করিয়াছেন, তাহাতে বৈদিক "হংস" প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের ব্যবস্থা দেখা যায়; বিশেষতঃ অস্মদ্দেশে প্রচলিত দেবার্চ্চনাদি কার্য্যে ভূতশুদ্ধি করার সময়ে সেই "হংসাদি" বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যেই ষট্চক্রভেদ হইয়া থাকে; এমন অবস্থাতে এই প্রকার চির-প্রচলিত ব্যবহারের উপর আক্রমণ করা সঙ্গত হয় না।

এতাদৃশ আপত্তি খণ্ডনের জন্য বলিতে হয় যে, এই সকল যোগমত আমরা নূতন খণ্ডন করিতেছি না, ইতিপূর্ব্বে এতাদৃশ মত সকল খণ্ডিত হইয়া আস্তিক হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল সেগুলি চুপে চুপে পুনরায় আস্তিক সমাজে প্রবেশ করাতে আমাদের পুনঃ খণ্ডন করার আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যখন নাস্তিক মত খণ্ডন করিয়া আস্তিক মত প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন, তৎকালে এতাদৃশ ষট্চক্রভেদাদি যোগমত কর্ত্তিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য প্রসিদ্ধ আনন্দগিরিকৃত "শঙ্কর-বিজয়" নামক পুস্তকের "যোগমত নিবর্হণ" নামে যে ৪১ প্রকরণ রহিয়াছে, তথা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধার করিয়া আমরা দেখাইতেছি। "বিবিক্ত দেশেচ সুখাসনস্থং শুচিঃ সমগ্রীব-শির ইত্যাদি লিখিত মেবেতি

যদুচ্যতে তথা ন বক্তব্যম্। বক্তব্যম্ তদাদি বাক্যৈরিহ দহরবিদ্যৈব প্রতিপাদিতা ন যোগঃ। অজপা বিদ্যায়ামাগমোক্তবলাৎ যোগ ইতি যদুচ্যতে তদপি ন সম্ভবতি। অজপামূলমন্ত্রস্য হংসরূপত্বেন-সোহহমিত্যর্থে নির্দ্ধারিতে—পর জীবয়োর্ভিদা গন্ধলেশাভাবাৎ কথং যোগ ইতি বক্তুং শক্যতে? মন্ত্রবশাৎ যোগস্য অপ্রাপ্তাবপি কুণ্ডলিন্যা ষট্‌চক্র ভেদমাত্রং যোগ ইতি যদুচ্যতে তদপি ন মানম্ মুক্তিমার্গাভাবাৎ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি, সংপশ্যন্ ব্রহ্মপরং যাতি নান্যেনহেতুনা। ইতি নিষেধস্যান্যপরত্বাৎ।”

অর্থাৎ ঃ—হে যোগমতাবলম্বিগণ! তোমরা যোগমতের বৈদিকত্ব দেখাইবার জন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের কথিত নির্জ্জন দেশে শুচি হইয়া সুখাসন করতঃ শিরোগ্রীবা প্রভৃতি সমভাবে স্থাপন পূর্ব্বক যে যোগানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেখাইতেছ, তাহা তোমাদের কথিত যোগ নহে। সে সকল কথাদ্বারা ছান্দোগ্য উপনিষদের দহর পুণ্ডরীক বিদ্যাই প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু তোমাদের কথিত যোগ প্রতিপন্ন হয়না। যদি বল আগম সম্মত অজপা বিদ্যাবলম্বনে আমাদের যোগ নিষ্পন্ন হয়, তাহাও সম্ভব নহে। কারন অজপা মন্ত্রের প্রকৃতার্থ সোহহংই নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাতে জীব ও পরমব্রহ্মে একতা কথিত হয়। কিন্তু কোনক্রমে জীব ও ব্রহ্মে ভেদের লেশমাত্র থাকিতে পারে না। তোমাদের প্রক্রিয়া কিন্তু অন্যরূপ। তোমরা মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া তাহার সঙ্গে জীবকে লইয়া সহস্রারে গমন কর, তথায় পরব্রহ্মের সহিত কুণ্ডলিনীর মিলন করাইয়া তদুৎপন্ন অমৃত জীবকে পান করাও। এখানে জীব ব্রহ্ম ও কুণ্ডলিনী এই তিনটি পদার্থ থাকে। সুতরাং সোহহং-এর বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই কথা শুনিয়া অজপা মন্ত্রে যোগ হয়, এই আপত্তি পরিত্যাগ করতঃ কেবল কুণ্ডলিনী দ্বারা ষট্‌চক্রভেদ করা মাত্রই যোগ, যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাও পার না। তোমাদের ঐরূপ প্রক্রিয়াতে

মোক্ষমার্গের অভাব হয়। তাহার কারণ এই যে, শাস্ত্রে রহিয়াছে,- "আপনাকে সকল ভূতের মধ্যে ও সকল ভূতকে আপনার মধ্যে দর্শন করিয়া পরমব্রহ্মে প্রবেশ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন হেতু দ্বারা ব্রহ্মলাভ ঘটেনা। তোমরা সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখা দূরে থাকুক, নিজ শরীরের ছয়চক্র পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সহস্রারে গিয়া থাক। ইহাতে সর্ব্বভূতে আপনাকে ও আপনাতে সর্ব্বভূতকে দর্শনের বাধা ঘটে এবং উহা ছাড়া ব্রহ্মলাভের অন্য কোন উপায়ও নাই। তোমরা এই শেষোক্ত নিষেধ বাক্যের মধ্যে পড়িতেছ।

"বেদ বিরুদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র" নামক এই প্রবন্ধ ও ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের বিচার প্রভৃতি এত কথার অবতরণ করার আবশ্যকতা কি ছিল, তাহাও ভাঙ্গিয়া বলিতেছি। সূচনাতে বলা হইয়াছে, যিনি জ্ঞান না দিয়া জ্ঞানের পথটিমাত্র প্রদান করেন, তিনিও গুরুসংজ্ঞার অন্তর্গত। অতএব উপনয়নকর্ত্তা আচার্য্য ও গুরু। তান্ত্রিক মন্ত্রদানদ্বারা সেই পথটি দেওয়া না হইলে, তাদৃশ মন্ত্রদাতাকে গুরু বলা উচিত নহে। যদি বল, সেই পথটি দেওয়া হইল কি না হইল, তাহা বুঝিব কিসে? তাহার জন্যই বলা গেল,—বেদবিরুদ্ধ। অর্থাৎ যাহা বেদের সহিত মেলেনা, তদ্দারা মুক্তি হইতে পারেনা। দেখান হইল, শঙ্কর এই মতটি খণ্ডন করিয়াছেন; এখানে বুঝিতে হইবে, তন্ত্রদ্বারা প্রদর্শিত ঐ পথটি যে মুক্তির দিকে প্রসারিত নহে, একথা দেখাইয়া দেওয়াকেই "শঙ্করাচার্য্য খণ্ডন করিয়াছেন" বলা হয়।

এখন দেখিতে হইবে, শঙ্করাচার্য্য এইরূপ পরিষ্কার ভাবে ষট্‌চক্রাদি যে সকল যোগমত খণ্ডন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের আস্তিক ব্রাহ্মণ সমাজে কিরূপে পুনঃপ্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইল।

বৈদিকগণই তান্ত্রিকী দীক্ষার প্রবর্ত্তক

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রতি দৃষ্টি করিলে বাঙ্গালা দেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বৈদিকেরা সর্ব্বশেষে এদেশে আগমন করিয়াছেন। রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বৈদিক; সকল ব্রাহ্মণেরই তান্ত্রিক গুরুগিরি বৈদিকদিগের এক চেটিয়ার মত দেখা যায়। বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন, অন্যত্র ব্রাহ্মণদিগের তান্ত্রিক দীক্ষার একরূপ অস্তিত্ব নাই। এই সকল অবস্থাদৃষ্টে বৈদিকদিগকে আমাদের মধ্যে তান্ত্রিক মতের জন্মদাতা অনুমান করিতেছি। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় স্বরচিত 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' নামক পুস্তকে "বঙ্গে তান্ত্রিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও বৈদিক শ্রেণী বাহ্মণগণের আবাস গ্রহণ" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া এবিষয়ের অনেক ইতিহাস ব্যক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩৪/৩৫ পৃষ্ঠাতে লিখিত আছে—"নবাগত দাক্ষিণাত্য বৈদিক-দিগকেও অনেক সময়ে বৈদিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক মতে চলিতে হইয়াছিল। তান্ত্রিক কার্য্যে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, শবসাধন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্যের বিস্তর প্রসঙ্গ, অনুষ্ঠান ও প্রশংসা এবং রসায়নবিদ্যার অদ্ভুত ব্যাপারের উপযোগিতা নির্দ্দিষ্ট থাকায়, তৎকালে বঙ্গ সমাজে তান্ত্রিক কার্য্যগুলি প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইত। অনেকে তন্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এইরূপ নানা অলৌকিক জনশ্রুতি ও অপ্রসিদ্ধ নহে।" ৪১ পৃষ্ঠাতে লিখিত আছে,—"মন্ত্রশিষ্য করিতে পারিলে যে এককালে সমাজ মধ্যে সম্মান লাভ করা যাইতে পারে, সে সুযোগটি পাশ্চাত্য বৈদিকগণই বিশেষ বুঝিয়াছিলেন।'

রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ যেমন এক কাণ্যকুব্জ হইতে এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন, বৈদিকেরা তেমন নহেন। তাঁহারা দাক্ষিণাত্য ও

পাশ্চাত্য বৈদিক নামে দুইভাগে বিভক্ত। ইহারা নানাসময়ে নানাদেশ হইতে আসিয়া, রাঢ়ী-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের গুরু হইয়া বসিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের খণ্ডিত বেদবিরুদ্ধ নানা তন্ত্রের সম্প্রদায় মধ্যে হতাবশিষ্ট যে যে সম্প্রদায় জীবিত ছিল, তাহাদের নিকট হইতে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি অভিচার ক্রিয়া-কুশল তন্ত্রমন্ত্র সকল, ইহাদিগের দ্বারা সংগৃহীত হওয়াই বিশেষ সম্ভাবনা। পূর্ণানন্দ গোস্বামীর সংগৃীত "ষট্‌চক্র নিরূপণে" ষট্‌চক্র ভেদের উপায়টি মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু (তান্ত্রিক গুরুর) প্রতি বরাত থাকাতে এবং তান্ত্রিক মন্ত্রের এত গোপন করা গুরুগিরি ব্যবসায়ীদিগের প্রচারিত দেখিয়া আমাদের উক্ত অনুমান সমর্থিত হইতেছে।

আমাদের মধ্যে তান্ত্রিকী দীক্ষা কখন প্রবেশ করিল ?

একথা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত যে, আমাদের তান্ত্রিকী দীক্ষাটা শ্রুতি-স্মৃতি সম্মত কর্ম্মকাণ্ডের বহির্ভূত ও তাহা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিলনা। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আদিশূরের যজ্ঞোপলক্ষে কাণ্যকুব্জ হইতে পঞ্চবিপ্র আগত হইয়া এতদ্দেশে যে রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের পত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে কাণ্যকুব্জ হইতেই যদি ঐ দীক্ষা চলিয়া আসিত তবে তাঁহাদের সঙ্গে পঞ্চ-ভৃত্যের আগমন সম্বন্ধে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তান্ত্রিক গুরুদিগের বিষয়েও অন্ততঃ তদনুরূপ বৃত্তান্ত জানা যাইত। কিন্তু তেমন কোন কথাই নাই। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ যে "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের গর্ভধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সমস্তগুলি সংস্কারের নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। কিন্তু তান্ত্রিক দীক্ষার নাম গন্ধ ও তাহাতে নাই। বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমনের অল্পকাল পূর্ব্বে ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব রচিত হইয়াছে। এতদ্বারা স্থির করিতে হয় মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচলিত ছিল না, তাহার পরে উহা আমাদের সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ৩৮ পৃষ্ঠাতে লিখিত আছে, "ইহারা (বৈদিকেরা) আরও কহেন যে, যৎকালে এদেশে দাক্ষিণাত্যেরা বদ্ধমূল হইলেন, তদবধি জন্মভূমির ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে তাহাদের আদান রহিত হয়। তখন রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের ন্যায় ইঁহাদিগের সন্তান পরম্পরা মধ্যে বেদচর্চ্চা লোপ হইয়া আসিল। এমন কি ইঁহারা বঙ্গদেশে নামে মাত্র বৈদিক থাকিলেন, কিন্তু কাজে ঘোর তান্ত্রিক হইয়া পড়িলেন।" ৪২ পৃষ্ঠাতে আছে, "পাশ্চাত্য বৈদিকগণ, লোক সমাজে সাতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন, অবশেষে তাহাদিগকে ও লোকরঞ্জনের অনুরোধে ক্রমে ক্রমে বৈদিক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে হইল। তখন তাহারা তন্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। সে সময়ে আগম, নিগম, জামল, ডামর প্রভৃতি ভূরি ভূরি তন্ত্র মন্ত্র কবচাদি চতুর্দ্দিক হইতে সমানীত হইতে লাগিল। ইহারা এক একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া লোক সমাজে খ্যাত হইতে লাগিলেন।" ৪৩ পৃষ্ঠাতে লিখিত আছে— "কালক্রমে ইহারা সপরিবারে এদেশে বদ্ধমূল হয়। উত্তরকালে ইহাদিগের বংশপরম্পরা কতিপয় বংশের কুলগুরু হইলেন।" ইহাদ্বারা স্থির হয় যে, মুসলমান রাজত্বকালে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা এতদ্দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেশ দেশান্তর হইতে নানা তন্ত্রের মত সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক তান্ত্রিক দীক্ষা দিয়া শিষ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ এতদুপলক্ষে বৈদিকগণ এতদ্দেশে স্থায়ীভাবে বসতি করিতেছেন।

বৈদিক দিগের বঙ্গনিবাস কতকালের

বৈদিকেরা যে নানা সময়ে এতদ্দেশে আসিয়া বসতি করিতেছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৈদিকগণ দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য এই দুই ভাগে বিভক্ত। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধ নির্ণয়ের ৩২ পৃষ্ঠাতে বলিয়াছেন—"যাহারা দক্ষিণ হইতে আগত, তাঁহাদিগকেই দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলা যায়; আর যাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী কালে বা পশ্চিম দ্রাবিড়াদি দেশ হইতে বঙ্গে আগমন করেন, তাঁহাদিগকেই পাশ্চাত্য বৈদিক কহা যায়।" ইহার পরে ৩৩ পৃষ্ঠাতে দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের এদেশে আগমন সম্বন্ধে বৈদিকগণের এইরূপ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন; "তবে ইহারা কহেন, মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় জনপদে বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য ও বেদাদি শাস্ত্রচর্ব্বা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বেদের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল। সেই সময়েই দাক্ষিণাত্যদিগের এদেশে আগমন কাল।" অতএব মুসলমান রাজত্বকালে বৈদিকেরা আসিয়াছেন।

কৈবল্যকলিকাতন্ত্র কৃত্রিম বা নিষ্ফল

পূর্ণানন্দ গোস্বামী যে "কৈবল্য-কলিকা" তন্ত্রের দ্বিতীয় পটল হইতে ষট্‌চক্র নিরূপণ উদ্ধার করিয়াছেন, "সেই কৈবল্য-কলিকা" তন্ত্রের আর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য নামক কোন বৈদিক ব্রাহ্মণ হইতে আমরা এই কৈবল্য-কলিকা" তন্ত্রের পরিচয় পাইতেছি। তিনি ষট্‌চক্র বিবৃতি নামক টীকা পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার আরম্ভ এইরূপ—"টীকা বিশ্বনাথেন

নত্বা সন্তন্বেতেঽস্থিকাম্। কৈবল্য-কলিকা তন্ত্র দ্বিতীয় পটলস্য চ॥ বৃদ্ধরূপিপরমেশ্বর বশিষ্ঠায় কুলভাবমুক্ত্বা। কুলাচারং বিনা তস্মিন্নাধিকারং অতস্তদুপদিষ্টুম্ গুরুসম্মানপূর্ব্বকমাহ যজ্জ্ঞাত্বেনেত্যাদি।" বিশ্বনাথের কথাদ্বারা বুঝা যায়, পরমেশ্বর শিব কোন বৃদ্ধের রূপ ধারণ করিয়া বশিষ্ঠের নিকট তান্ত্রিক কুলাচার বলিয়াছিলেন। তাহার পরে দ্বিতীয় পটলে ষট্‌চক্র ব্যাখ্যা করিতে শিব গুরুকে সম্মান করিয়া ষট্‌চক্র বলিতেছেন। আমরা কিন্তু পুরাণ শাস্ত্রে ঐ ছয়চক্রের পরিচয় পাইয়া থাকি। বশিষ্ঠ ব্যাসাদি সেই সকল পুরাণের বক্তা। সেজন্য পরমেশ্বর বৃদ্ধরূপ ধারণ করিয়া তন্ত্র বলিতে আসেন কেন? এবং তিনি পরমেশ্বর হইয়াও ষট্‌চক্র ভেদের উপায় বলিতে পারিলেন না, গুরুর সম্মান করিয়া দীক্ষা গুরুর প্রতি বরাত দিলেন; শিবের আবার গুরু কে হইতে পারে? এসকল অসামঞ্জস্য দ্বারা "কৈবল্য-কালিকা" তন্ত্রের মৌলিকত্বের প্রতি আমাদের দুইপ্রকার সন্দেহ হইতেছে। (১ম) বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য "কৈবল্য-কলিকা" তন্ত্রের জন্মদাতা। তিনি উহা পরমেশ্বর কৃত বলিয়া ভাণ করতঃ স্বয়ং টীকাকারের আসন গ্রহণ করিয়াছেন। অথবা (২য়) শঙ্করাচার্য্যের খণ্ডিত বিবিধ অবৈদিক মত হইতে "কৈবল্য-কলিকা" তন্ত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন দূরতর স্থানে অবস্থান করিতেছিল। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বঙ্গসমাজে গুরুগিরি করিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করণার্থ এতদ্দেশে তাহা আনয়ন করিয়াছিলেন; বিশ্বনাথ ভাট্টাচার্য্য তাহার টীকামাত্র করিয়াছেন।

আমরা পাঠকদিগের সমক্ষে এই দুই প্রকার সন্দেহ উত্থাপন পূর্ব্বক একটি গুরুতর দায়িত্বের বোঝা শিরে লইয়াছি। যতক্ষণ 'কৈবল্য-কলিকা' তন্ত্রের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে না পারির, ততকাল আমাদের সেই দায়িত্ব দূরীভূত হইবেনা। এজন্য এখানে নূতন করিয়া কিছু বলিতে বাধ্য হওয়া গেল।

শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্টে তন্ত্র শব্দের বিবরণীতে লিখিত আছে,

"তন্ত্রম্ শিবোক্ত-শাস্ত্রম্। তচ্চ চতুঃষষ্টি-সংখ্যকম্।" শিবোক্ত শাস্ত্রকে তন্ত্র বলে, তাহা সংখ্যাতে ৬৪ খানা। সেই ৬৪ খানা তন্ত্রের নাম করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কৈবল্য-কলিকা' তন্ত্রের নাম নাই। এতদ্বারা উহার কৃত্রিমতা স্থির হইতে পারে। শব্দকল্পদ্রুমে মহাবিশ্বসার তন্ত্র হইতে মাত্র ঐ ৬৪ খানা তন্ত্র থাকার প্রমাণ উদ্ধৃত আছে। "চতুষষ্টীশ্চ তন্ত্রানি যামলাদিনি পার্ব্বতি। সফলানীহ বারাহে বিষ্ণুক্রান্তাসু ভূমিষু। কল্পভেদেন, তন্ত্রাণি কথিতানিচ যানিচ। পাষণ্ডমোহনায়ৈব বিফলানীহ সুন্দরি।" অর্থাৎ শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "হে সুন্দরি! যামল প্রভৃতি যে চৌষট্টি খানা তন্ত্র রহিয়াছে, সে সকল এই বরাহকল্পে বিষ্ণুক্রান্তা পৃথিবীতে ফলপ্রদ হইয়া থাকে। কল্পভেদে পাষাণ্ডদিগের মোহ উৎপাদন করিবার জন্য, অন্য যে সকল তন্ত্র কথিত হয়, তাহা বিফল বলিয়া জানিও। 'কৈবল্য-কলিকা তন্ত্র' যদি বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যের বা অন্য তাদৃশ কাহারও কৃত হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্যই থাকেনা। আর যদি উক্ত ৬৪ তন্ত্রের বহির্ভূত হইয়াও প্রচলিত থাকা ধরা যায়, তাহা হইলেও মহাবিশ্বসারতন্ত্র মতে 'কৈবল্য-কলিকা' তন্ত্রকে পাষণ্ড মুগ্ধকরার জন্য রচিত ও নিস্ফল ধরিতে হইবে।

ষট্চক্র বিবৃতি সমাপ্তিতে বিশ্বনাথ স্বীয় পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন। "নারায়ণো-বৈদিকশ্চ ভট্টাচার্য্যসমীরিতঃ। তস্যাত্মজো-বামদেবভট্টাচার্য্য স্তথৈবচ। তস্যাত্মজোবিশ্বনাথস্তেনেয়ং রচিত মুদা।" বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য বৈদিক ব্রাহ্মণ, সুতরাং গুরু সম্প্রদায়ের একজন। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, যেস্থলে গুরুবক্ত্রের প্রতি বরাত রহিয়াছে, সেই সেব স্থলে ক্রমটি তিনিই ভাঙ্গিয়া বলিবেন। কিন্তু তাহা পাইলাম না। তথায় এই মাত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শ্রীনাথ বক্ত্রাৎ গুরুবক্ত্রাৎ মোক্ষবর্ত্ম প্রকাশক্রমং-জ্ঞাত্বা।" তবেই হইল,—যেমন টীকাকার বলিলেন না, তেমন স্বয়ং পরমেশ্বরও মূলতন্ত্র মধ্যে বলেন নাই। সকলেই গুরুর প্রতি

বরাত দিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, ঐ তন্ত্রানুযায়ী ডাকিনী যোগিনী সম্বলিত পদ্মগুলি স্বভাবতঃ আমাদের দেহের মধ্যে নাই। কতকটা কল্পনা করিয়া লইতে হয়; সে গুলিকে সত্য বলিয়া চালাইতে হইলে, একটা ব্যবসাদারীর আশ্রয় গ্রহণ করা অপরিহার্য্য।

আমরা গুরুগিরির গোলকধাঁধাতে পড়িয়া এতকাল এই দিকে চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত করিতে অবকাশ পাই নাই। তাহাতেই আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘটিতে পারিয়াছে। 'কৈবল্য-কলিকা' তন্ত্রের টীকাকার বা গুরুদল বৈদিকশ্রেণীভুক্ত। সেই টীকাকার বিশ্বনাথ ও ষট্‌চক্র ভেদের গোমর ফাঁক করিলেন না, এখন আমরা ক্রম প্রকাশক গুরু পাই কোথায়?

আমাদের দশা

এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা স্থির করিতেছি ঐ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই আমাদের মধ্যে তান্ত্রিকী দীক্ষার জন্মদান করিয়াছেন। আর তান্ত্রিক গুরুগণের যত্নেই ধীরে ধীরে শঙ্করাচার্য্যের খণ্ডিত বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমত সকল আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন আমরা এতই অবশ হইয়া পড়িয়াছি যে কিছুতেই কোন্‌টা হিত কোন্‌টা অহিত তাহা বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

ব্রাহ্মণদের দুইটি করিয়া গুরু গ্রহণ করিতে হয়। প্রথম আচার্য্যগুরু। সনাতন ধর্ম্মের বিধান মতে ইনি গায়ত্রী প্রভৃতি বেদমন্ত্র শিক্ষা দেন। দ্বিতীয়, দীক্ষা গুরু। ইনি তান্ত্রিক হ্রীং ক্লীং প্রভৃতি মন্ত্র শুনাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন শিষ্যের জ্ঞানোৎপত্তির

সহিত কোন গুরুরই সম্বন্ধ থাকেনা। অথচ এই দীক্ষা-গুরুই আমাদের সর্ব্বেসর্ব্বা; আচার্য্যগুরু কিছুই নহেন। সামান্যতঃ আচার্য্যগুরু, "আচার্য্য" শব্দে ও দীক্ষাগুরু "গুরু" শব্দে কথিত হন। শাস্ত্র মতে যিনি জ্ঞান দিতে সমর্থ হন, তাঁহাকেই গুরু বলিতে হয়, আর যিনি কেবল বেদমন্ত্র মুখস্থ করান তিনি আচার্য্য। তান্ত্রিকী হ্রীং ক্লীং প্রভৃতি মন্ত্র বেদের নহে, সুতরাং জ্ঞানদানভিন্ন কেবল হ্রীং ক্লীং প্রভৃতি মন্ত্রদাতাদিগকে না আচার্য্য, না গুরু বলা যাইতে পারে। তাঁহারা জ্ঞান দিতে পারিলে ত গুরু বলিব ?

শঙ্করাচার্য্য যে সকল তান্ত্রিক মত খণ্ডন করিয়াছিলেন, আমরা এখন তাহাতেই ডুবিয়া থাকাতে সে সকল বেদ-স্মৃতি বিরুদ্ধ শাস্ত্রের দোষ ধরিতে পারিতেছি না। যঁহারা কথঞ্চিৎ ভাসিয়া উঠিয়া শিরঃ উত্তোলন পূর্ব্বক দেখিতে পারেন, তাহারা বুঝেন বেদ-বিরুদ্ধ বলিয়া ব্রাহ্মণের ঐ সকল তন্ত্রমত অসেবনীয়। আমরা কয়েক শত বৎসর যাবৎ উহাতে অভ্যস্ত হওয়াতে এই ভাবটিকে হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছি না। তান্ত্রিক গুরুদিগের প্রদত্ত মন্ত্র মধ্যে কোন্‌গুলি বেদ সম্মত সে বিষয়ে আলোচনা করা এ প্রবন্ধে অসম্ভব। এখানে উদাহরণস্বরূপ কৈবল্যকলিকাতন্ত্রের ষট্‌চক্র সাধন লইয়াই আলোচনা করা গেল। আমরা যে সমাজের নিকট এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছি, সে সমাজ ম্লেচ্ছতা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এ সমাজ যদি ম্লেচ্ছতা পরিত্যাগ করিয়া এই বেদ-বহির্ভূত তান্ত্রিক মতের দিকেও ঝুকিয়া পড়িতে পারে, তাহা হইলেই আমরা উপস্থিত মতে তুষ্ট হই। এতাদৃশ সমাজে এই তান্ত্রিক মতের দোষ দেখাইয়া বেদ-স্মৃতিসম্মত মতের উপযোগিতা সংস্থাপন করা আমাদিগের পক্ষে একরূপ অসম্ভব।

আমরা এখন যে ঝঙ্কটাবস্থায় পড়িয়াছি, তাহাই এখানে দেখাইব। হিন্দু যদি তাহার লক্ষ্য কি একথা বুঝিত, তাহা হইলে তান্ত্রিক ষট্‌চক্র সাধনে সেই লক্ষ্যের যেরূপ বাধাপড়ে তাহা আমরা

দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু হিন্দু যে কি চায় একথা হিন্দুই জানেনা। সুতরাং তাহাদের গন্তব্যের বিঘ্ন কিসে হয়, কিসে না হয়, তাহা আমরা কিরূপে দেখাইতে পারি? ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। আমাদের অনেকেরই আপাততঃ জানা আছে যে সকল ধর্ম্মের সারই এক। সুতরাং সকল ধর্ম্মের গন্তব্যও একই; ইহার নাম চরম উদারতা। এক ধর্ম্মাবলম্বী যদি অন্য ধর্ম্মাবম্বীর মত খণ্ডন করিতে যায়, তাহার নাম সঙ্কীর্ণতা। ব্যাসাচার্য্য যে বেদান্তসূত্রে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় প্রভৃতি দর্শনের মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং সঙ্করাচার্য্য যে তদনুরূপ যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা ব্যাস ও শঙ্কর উভয়েরই (এখনকার অনেকের হিসাবে) সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা তান্ত্রিক ষট্‌চক্রের সাধন-দোষ দেখাইতে গেলেই আমাদের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহাতেই আমরা ন্যচার হইয়া পড়িয়াছি। আর অমরা যদি বুঝিতাম, জীবের চরম লক্ষ্য মোক্ষ, তাহা হইলে মোক্ষ ব্যাঘাতক মত সকলের খণ্ডন-যোগত্য বুঝিতে পারিতাম। আমরা তাহা না বুঝিয়া বুঝিয়াছি, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান্, গড্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামধারী একজন জগৎ স্থষ্টিকর্ত্তা রহিয়াছেন; যে তাঁহাকে যে নামে ডাকুক না কেন, ফল সমান। রামদুলালের গানও একথার সাক্ষ্য দিতেছে।

জানিগো জানিগো তারা তুমি যেন ভোজের বাজি,
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতে তুমি হওমা রাজি। ইত্যাদি।

আমরা যতদিন এই ধারণা হৃদয় হইতে তুলিয়া ফেলিতে না পারিব, ততদিন সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ভাব আমাদেম হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পথ পাইবে বা। কেহ বুঝাইতে শত চেস্টা করিলেও—

"ভদলব্ধপদং হৃদি শোকঘনে,
প্রতিঘাতমিবাস্তিকমস্থ গুরোঃ"—

তাহা আমাদের হৃদয়ে স্থান না পাইয়া (একই সময়ে দুই বস্তু

একস্থানে থাকিতে পারেনা বলিয়া) বক্তার নিকটে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবে।

নানাবিধ উৎপীড়নে বিন্ধ্যাচলের উত্তরবর্ত্তী ভূভাগে ব্রাহ্মণ্য ব্যবহার বিলুপ্তপ্রায় হওয়াতে দাক্ষিণাত্য হইতে আগত দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীকে আমাদের বৈদিক কার্য্যের পুরোহিত নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। উহাকে সময়োচিত ব্যবহারই বলিতে হয়। উহাদিগকে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া সুখে থাকিতে দেখিয়া তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনেরা যখন এতদ্দেশে আসিতে লাগিলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভের লালসায় নানা তন্ত্র সংগ্রহ ও বিস্তার করিতেছিলেন, তখনই আমাদের এই দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহা না হইলে শঙ্করাচার্য্যের খণ্ডিত বিবিধ মত সকল নানা তন্ত্রাকারে আসিয়া আমাদিগকে এমন ভাবে গ্রাস করিতে পারিত না। আমরাও বৈদিক আচার্য্যগুরুর অনাদর করিয়া তান্ত্রিক গুরুকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিতাম না। এখন যেমন বুঝিতেছি তন্ত্রমতে ষট্‌চক্র ভেদ করতঃ সহস্রারে গিয়া লাক্ষারসের অনুরূপ অমৃত পান পূর্ব্বক পরমানন্দে নিত্য-দেহে থাকিতে পারিব, এমন বুঝিতাম না। এই মতের দোষ সহজেই দেখিতে পারিতাম। তাহা হইলে বেদসঙ্গত দহর-পুণ্ডরীকবিদ্যোক্ত সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ী বিজ্ঞানের অনুসরণ করিতে অবকাশ পাইতাম এবং পুরাণোক্ত ষট্‌চক্র মধ্যে অন্তঃকরণ স্থাপন করার আবশ্যকতা বুঝিতে সমর্থ হইতাম।

ষট্‌চক্রের পৌরাণিক ও তান্ত্রিক পার্থক্য

তন্ত্রে যেমন বেদ-বিরুদ্ধ ষট্‌চক্র সাধন প্রণালী রহিয়াছে পুরাণে তেমন বেদসঙ্গত ষট্‌চক্র বৃত্তান্তও দেখা যায়। লিঙ্গ

পুরাণের অষ্টমধ্যায়ের শেষভাগে ও শিবপুরাণের বায়ুসংহিতাস্থ ২৯শ অধ্যায়ের মধ্যভাগে ষট্চক্র বর্ণনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে ষট্চক্র সাধনের ব্যবস্থা নাই, বরং কল্পনা করিয়া লইতে বলা হইয়াছে।

ভ্রূমধ্যে দ্বাদশান্তে বা ললাটে মূর্দ্ধ্নি বাস্মরেৎ।
পরিকল্পনা যথা ন্যায়ং শিবয়োঃ পরমাসনম্॥ শৈবে।

অর্থাৎ হৃদয়ে (দ্বাদশদলপদ্মে) বা ললাটে ভ্রূ মধ্যে কিম্বা মূর্দ্ধাতে শিব-শক্তির পদ্মাসন কল্পনা করতঃ সেই আসন মধ্যে শিব-শক্তির স্মরণ করিতে হয়।

তন্ত্রমতে বুঝা যায় যেন এক এক স্থানে এক একটা পদ্ম স্বভাবতঃ বিদ্যমানই আছে। সাধক তাহা উদ্ঘাটন করিয়া লইতে পারিলে পদ্মের প্রতি পাপ্ড়িতে কত ডাকিণী যোগিনী শাকিণীর দর্শন পান তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরাণসঙ্গত ষট্চক্রে তেমন কথা নাই। দেহের বিশেষ বিশেষ সন্ধিস্থলে ধ্যানের সুবিধা আছে এবং তত্তৎ-স্থলে চতুর্দ্দলাদি বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পদ্ম কল্পনা করিয়া শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের স্মরণ করার বিধি আছে। বাহিরের পূজাতেও ঐরূপ মণ্ডলে পদ্ম অঙ্কিত করিয়া দেব-দেবীর পূজা হইয়া থাকে। সেই বাহ্য পূজাকে অন্তরে প্রবেশ করাইলে তাহা ধ্যান হইয়া দাঁড়ায় এবং ধ্যান প্রকরণেই ষট্চক্র ব্যবহারের ব্যবস্থা দেখা যায়।

বেদের ব্রহ্মকে লইয়া ব্রাহ্মদল ও আর্য্যসমাজি দল যেমন ব্রহ্মজ্ঞানী মুনিঋষি হইতেছেন, শাস্ত্রোক্ত ষট্চক্রের 'কথা ধরিয়া তান্ত্রিকেরা ও তেমন অনায়াসে শিবশক্তি সাধন ও অমৃত ভক্ষণের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক ষট্চক্র সাধনের দুরবস্থা ফল লাভের কালে। যেমন বিবাহের সমস্তই ঠীক্, একমাত্র কন্যার অভাব। ষট্পদ্ম মধ্যে সমস্ত দেবতাই রহিয়াছেন, ষট্চক্রে প্রবেশ করার ক্রমটির সহিত দেখা নাই, তাহা দীক্ষাগুরুর হাতে লুকায়িত রহিয়াছে। সেই ক্রম জানা সম্বন্ধে শিষ্যও যেমন

গুরুও তেমন। ইহাকেই বলিলাম শস্তার দুরবস্থা। ষট্‌চক্র-দর্শনের কথা শুনিয়া সকলেই প্রলুব্ধ হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে দেহের মধ্যে তেমন পদ্মসমুদয় বিদ্যমান থাকিলে ত তাহা দেখিবার ক্রম নির্দ্দিষ্ট থাকিবে? শিবপুরাণের উদ্ধৃত শ্লোকে "প্রিকল্প্য" শব্দদ্বারা পদ্ম কল্পনা করিতে উপদেশ দেখা যায়। তৎস্থলে তান্ত্রিকেরা এখনকার বিজ্ঞাপনদাতাদিগের ন্যায় শরীরের মধ্যে সেই পদ্ম দেখাইবেন বলিয়া লোক সংগ্রহ করতঃ দীক্ষাগুরুর নিকট পাঠাইয়া দেন।

আমরা এস্থলে তান্ত্রিক ষট্‌চক্র ও পৌরাণিক ষট্‌চক্র ব্যবহারের মূলগত পার্থক্য আরও পরিষ্কার করিয়া দেখাইতেছি।

তান্ত্রিক ষট্‌চক্র নয়ভাগে বিভক্ত। (১) ১।২।৩ শ্লোকে ঈড়া পিঙ্গলাদি নাড়ীর পরিচয়; (২) চারি হইতে ১৩শ শ্লোকে মূলাধার পদ্ম; (৩) ১৪।১৮ শ্লোকে স্বাধিষ্ঠান চক্র; (৪) ১৯।২১ শ্লোকে মণিপুর পদ্ম; (৫) ২২।২৭ শ্লোকে অনাহত পদ্ম; (৬) ১৮।৩১ শ্লোকে বিশুদ্ধ পদ্ম; (৭) ৩২।৩৮ শ্লোকে আজ্ঞা পদ্ম; (৮) ৩৯।৪৯ শ্লোকে সহস্রারের অবস্থানাদি কথিত আছে। (৯) এই সকল নাড়ী ও পদ্মদ্বারা সাধক যে পরমানন্দ ও অমরত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহার উপায় ৫০।৫৪ শ্লোকে সেই উপায়ের উপায়টি দীক্ষাগুরুর প্রতি বরাত দেওয়াতে অদ্য আমরা এত কথা বলিবার সুযোগ পাইলাম। পৌরাণিক ষট্‌চক্রে তেমন উপায়ের বরাত কাহারও উপর দেওয়া হয় নাই, সকল কথা খুলিয়া বলা হইয়াছে। তাহাতেই তান্ত্রিকেরা বলেন, "বেদশাস্ত্র পুরাণানি সামান্যা গণিকাইব।" বেদ পুরাণ সকল খোলা মেলা কথা বলিয়াছে অতএব তাহা বেশ্যার ন্যায়। আর এই শিবোক্ত তন্ত্র কি তেমন হইতে পারে? "ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব।" ইহাতে মুলোপায়টি গোপন করিয়া, দীক্ষা গুরুদিগের অগাধ পাণ্ডিত্যের মধ্যে কুলবধূবৎ লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে।

ধরিয়া লইলাম, কুলবধূর ন্যায় গুপ্ত সেই পরমোপায়টি যেন দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে আদায় করা হইল; এখন সেই উপায়দ্বারা লব্ধ উপেয় পরম বস্তুটি কিরূপ হইবে, তাহাও একবার বিচার করিয়া দেখা যাক্। সেই বস্তুর নাম "পরমামৃত"। বেদাদি শাস্ত্রে—ব্রহ্ম, শিব ও অমৃত প্রভৃতি শব্দে চরম বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া "নাতঃ পরমস্তি"—ইহার পরে কিছুই নাই, বলা হয়। বেদবিরুদ্ধতন্ত্রোক্ত ষটচক্রে শিবের উপর "পর" বিশেষণ এবং অমৃতের উপর "পরম" বিশেষণ সংযোগ করিয়া যে "পরশিব" ও "পরমামৃত" শব্দ রচিত হইয়াছে, তাহা যে 'বেদের ব্রহ্ম, শিব ও অমৃতকে অতিক্রম করিয়া উক্ত কিছুই "নাই'র" অন্তর্গত হইতেছে, এতটা খেয়াল করে কে? ষটচক্র নিরূপণের ৫৩ শ্লোকে কিন্তু তাহাই বলা হইয়াছে, "লাক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাৎ পীত্বা" অর্থাৎ সাধক ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে গিয়া পরশিবকে প্রাপ্ত হন এবং সেই পরিশিবের মধ্য হইতে উৎপন্ন পরমামৃত নিজেও পান করেন, আর পদ্ম পর্ণস্থ দেবতা দিগকে পান করাইয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা সেই পরমামৃতটির প্রতি পাছে আঁকাশ কুসুমবৎ মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ জন্মে, তন্নিবারনার্থ তাহাতে "লাক্ষাভং" পরিচয় সংযোগ করা হইয়াছে। তবেই বুঝিতে হয় আমাদের দেহের স্থানে স্থানে ছয়টি পদ্ম বা চক্র যথার্থই রহিয়াছে এবং মস্তিষ্ক মধ্যে যে সহস্রদল পদ্ম থাকে, তাহাতে পরম-শিবের নিবাস ও সেখানে সত্য সত্যই লাক্ষাভ পরমামৃত পাওয়া যায়। লাক্ষাভ কথাতে টীকাকার "অলক্তকরসবদ্রবক্তাভং" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই পরমামৃত হইল আলতারসের ন্যায় লাল। ভাল! সে পরমামৃত যখন আলতার মত পান করার যোগ্য বস্তু, তখন তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থূলভূত না হইয়া পারেনা। তাহা হইলে দীক্ষাগুরুর সাহায্য ভিন্ন ডাক্তারদিগের দ্বারাও উহা নিষ্কাষণ করিয়া লওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

লিঙ্গ ও শিবপুরাণে যে ষট্‌চক্রের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতে

কুলকুণ্ডলিনী জাগান, তাহার সাহায্যে চক্রভেদ করা এবং সহস্রারে পরম শিব থাকা ও তাহা হইতে লাক্ষারসের ন্যায় পরমামৃত নির্গত হওয়া প্রভৃতি কোন কথাই নাই, সুতরাং সাধনোপায়টি দীক্ষাগুরুর প্রতি বরাত দেওয়াও হয় নাই। তথায় প্রথমে যম, নিয়ম, আসনাদি যোগানুষ্ঠানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাহার পরে দেহ স্থির করতঃ বিশেষ বিশেষ দেহসন্ধিতে মনঃ স্থির করার উপদেশ দেখা যায়। তন্মধ্যে বিকল্পে ইহা কথিত আছে :—

দ্বিদলে ষোড়শারে বা দ্বাদশারে যথাবিধি।
দশারে বা ষড়স্রেবা চতুরস্রে শিবং স্মরেৎ॥ লিঙ্গ ও শিবপুরাণ।

অর্থাৎ মূলাধার নামক চতুর্দ্দল পদ্মে, স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়্‌দলে, দশদল মণিপুরে বা দ্বাদশদল অনাহতে কিংবা ষোড়শদল বিশুদ্ধ চক্রে অথবা দ্বিদল আজ্ঞাচক্রে শিবকে স্মরণ করিতে হয়।

এতেম্বথারবিন্দেষু যত্রেবাভিরতং মনঃ।
তত্রৈব দেবং দেবীঞ্চ চিন্তয়েৎ ধীরয়াধিয়া॥ শিবপুরাণ।

এসকল পদ্মের মধ্যে যে কোন পদ্মে সাধকের মন অভিরত হয়, তথায়ই ধীর বুদ্ধিতে শিব-শক্তিকে চিন্তা করিবে। এতদ্বারা বুঝা যায় দেহের গুহ্যমূল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রসারিত ষটচক্র ভেদ-কারিনী নাড়ী, রেললাইনের ন্যায় রহিয়াছে। তাহার এক একটী চক্র বা পদ্ম এক একটী ষ্টেশন স্বরূপ।

এখানে কেবল সাধকের ধ্যান করার সুবিধার জন্য ষট্‌চক্রের উল্লেখ করিয়া যে চক্রে যেরূপ অধিকারী সাধকের যোগ্যতা থাকে, সে সেই চক্র হইতে কার্য্যারম্ভ করুক্ পুরাণে এই উপদেশ পাওয়া গেল। আমরা নিজেদের সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহারই সমর্থন করিতে পারিতেছি। পৌরাণিক সাধনাতে শঙ্করাচার্য্যের অভিলষিত মত ও রক্ষিত হয়। রেলযাত্রী আপন বাসস্থান হইতে নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে গিয়া রেল ধরে, তেমন সাধক জন্মান্তরীয় সাধনদ্বারা যে চক্র পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এজন্মে সেই চক্র

তাহার বাসস্থান ধরা গেল, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী চক্রকে বাড়ীর নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশন মনে করিতে হইবে। অতএব এজন্মে রেলষ্টেশন হইতে কার্য্যারম্ভ করিলেই ঠিক হয়।

এইরূপ সাধনের নানাপ্রকার পথ বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে অধিকারীর যোগ্যতা অনুসারে প্রদর্শিত হওয়াতে, তান্ত্রিক গুরুগণের ভাষাতে, বেদপুরাণ শাস্ত্র সামান্য গণিকার ন্যায় বহু পথ বিশিষ্ট বলিয়া নিন্দনীয় হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্রে তেমন বহু পথ প্রদর্শিত না হইয়া যদি কেবল দীক্ষাগুরুর নিকট যাওয়ার উপদেশ থাকিত, তাহা হইলে বেদ-পুরাণও কুলবধূর ন্যায় রক্ষণীয়া হইতে পারিত। বেদে পরমার্থ কথা থাকাতে, পূর্ব্বতন নাস্তিকেরা বেদ, ভণ্ড, ধূর্ত্ত, নিশাচরের রচিত এবং সামান্য গণিকার ন্যায় হেয় বলিয়াছেন; ও বেদের এই সকল দোষ দেখিয়াই বুঝি সভ্য বাবুর দল, বেদকে 'রাখালের গান' না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন নাই। যদি পরকাল থাকে, ধর্ম্ম থাকে ও মুক্তি থাকে, তবে সভ্য বাবুদিগের কৃত্রিম সভ্যতার আধিপাত্য চলে কিরূপে? সমাজে যদি ব্যবসাদারী বা মতলব না থাকিত, তাহা হইলে বেদের উপর দোষারোপ করার আবশ্যকতাও জগতে থাকিত না।

অন্তর্দ্দৃষ্টি

ব্রহ্মচারিবাবার নিকট হইতে আমি কি পাইলাম? এই কথা বলিতে গিয়া তান্ত্রিক ষট্‌চক্র সাধকদিগের এবং হঠযোগীদিগের পথের দোষ দেখান হইল; তথাপি প্রকৃত উত্তর দেওয়া হইল না। এক কথায় বলিতে গেলে সেই উত্তরটীর নাম অন্তর্দৃষ্টি। ইহাতে কিছুই বলা হইল না। এখনকার প্রায় সকলের মুখেই প্রশ্ন শুনা যায় যে, মনঃ স্থির হয় কিসে? এই প্রশ্নটি কেবল হিন্দুর স্বভাব হইতে বাহির হইয়া থাকে, পাশ্চাত্য সমাজে বোধ হয় এতাদৃশ

প্রশ্নের অবকাশ নাই। পাশ্চাত্যগণ বাহ্যজগত লইয়া মত্ত। মনকে বাহিরের বস্তুতে নিবিষ্ট না রাখিলে নিত্য নূতন যন্ত্র আবিষ্কার হয় কোথা হইতে? একমাত্র হিন্দুজাতি বাহ্যজগৎ হইতে মনকে ফিরিইয়া লওয়ার আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারে। অন্তর্দৃষ্টির আশ্রয়েই বাহির হইতে মনকে ফিরাইয়া নেওয়া যায়। যতক্ষণ অন্তর্দৃষ্টি থাকে, ততক্ষণ মন বাহিরের চিন্তার অবকাশ পায় না, সুতরাং ততকাল মনঃ স্থির থাকে বলা যায়।

অমাদের উদ্দেশ্য বেদানুমোদিত খাটী হিন্দুধর্ম্ম বা ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম পুণঃ প্রচলন করা। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ক্ষতিকারক যে সকল নূতন সম্প্রদায় বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে এবং কলিযুগের সহায়তা পাইয়া তাহা সমাজ মধ্যে প্রচলন করিতে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাদের প্রচারিত সেই সকল ধর্ম্মমতের দোষ কোথায় এবং কি, তাহা স্পষ্ট-রূপে দেখাইয়া দেওয়া। এইটী যে আমরা নূতন কিছু করিতেছি তাহা নহে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এই দোষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে আমরা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়কে লোপ করিতে চাই। আমরা ভগবদ্গীতার সহিত সুর মিলাইয়া বলি,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি॥

ইহার অর্থ—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিকে অতিক্রম করিয়া নিজে যাহা ভাল বুঝে তাহাই করে, সে সিদ্ধিলাভ করিতে এবং সুখ লাভ করিতে ও পরম গতি লাভ করিতে পারে না। এজন্য কি করিতে হইবে কি না করিতে হইবে এই কথা নির্ণয় করিবার জন্য শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। সেই শাস্ত্রের বিধি জানিয়া কর্ম্ম করা উচিত।

কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে, শাস্ত্র কি, অশাস্ত্র কি, ইহাও বুঝা চাই। কলি আপনার অনুচরদিগকে মনুষ্যলোকে জন্মাইয়া তাহাদের দ্বারা সংস্কৃত ভাষাতে ও দেশ ভাষাতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত সকল প্রণয়ন করাইয়া তাহা সমাজ-মধ্যে চালাইয়াছেন। সেগুলি বাছিয়া ফেলিতে হইবে। সেজন্য শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব তন্ত্রের মধ্যে অনেকগুলি যে বেদবিরুদ্ধ মত প্রবেশ করিয়াছে তাহার কিয়ৎ পরিমাণ উল্লেখ করা হইল। তন্ত্রমাত্রই বেদবিরুদ্ধ আমাদের কথাদ্বারা যেন কেহ এমন মনে না করেন। মহানির্ব্বান তন্ত্র ও জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র প্রভৃতি আমরা যতদূর পাঠ করিয়াছি তাহাতে সেই সকল তন্ত্রে বেদাদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধতা না পাইয়া বরং অনুকূলতাই দেখিয়াছি। অতএব সেই সকল তন্ত্রকে বর্জ্জন করার কারণ দেখা যায় না। ফলতঃ বেদাদি শাস্ত্রের চরম গন্তব্য মুক্তি। মুক্তির প্রতিবন্ধক মত বা শাস্ত্র আমরা আদর করিতে পারি না। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মুক্তির পথ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মচারিবাবা এই অন্তর্দৃষ্টি অবলম্বন করিলে বাহিরে তাঁহার নিশ্চল ভাব দেখা যাইত। তিনি তখন "আলগ" হইতেন অর্থাৎ আপনার দেহাতীত সত্তা অনুভব করিতেন, এবং তৎসঙ্গে সাধারণের দৃষ্টির অগোচর অনেক বিষয় দর্শন করিয়া আসিতেন।

আমি তাঁহার নিকট হইতে সেই অন্তর্দৃষ্টিতে প্রবেশ করার উপায় শিক্ষা করিয়াছি ও কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি যাহা, আমার অন্তর্দৃষ্টি যে তাহাই, এমন মনে করিতে হইবে না।

অথর্ব্ববেদের প্রশ্নোপনিষদে ও সামবেদের ছান্দোগ্যোপনিষদে হৃদয় নামক দেহ মধ্যস্থিত স্পন্দন বিশেষে একশত একটী প্রধান পথের সন্ধি আছে এমন জানা যায়। ঐ এক একটী পথের নাম এক একটী নাড়ী। ঐ সকল নাড়ীর অসংখ্য শাখানাড়ী ও প্রশাখা-নাড়ী রহিয়াছে। যাঁহারা উহার কোন একটী নাড়ীতে অন্তঃকরণ

প্রবেশ করাইতে পারেন, তাঁহাদিগের অন্তর্দৃষ্টি লাভ হইয়াছে বলা যায়। অতএব অন্তর্দৃষ্টিশালী ব্যক্তিদের সঞ্চরণ পথ (নাড়ী) সচরাচর বিভিন্ন হইয়া থাকে। জংশনে গেলে অনেকে আবার এক নাড়ীগামী হইয়া থাকেন।

ঐ সমস্ত নাড়ীর মধ্যে একটী নাড়ীর মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেই নাড়ী যোগশাস্ত্রে সুষুম্না নামে কীর্ত্তিত। তাহা আমাদের দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া সূর্য্য পর্য্যন্ত প্রসারিত আছে। এখানে নাড়ী কথাতে তেজঃসম্বন্ধীয় কিছু বুঝিতে হইবে। উপরে যে তান্ত্রিক ষট্চক্র ও হঠযোগের ষট্চক্র ভেদকারীদিগের দোষ দেখান হইল, তাহা কেবল এই সুষুম্নাদ্বারা বহির্গত না হওয়ার উপলক্ষে। তাহাদের ষট্চক্র ভেদকারিণী নাড়ীকে সুষুম্না বলা যায় না, তাহা ইতর নাড়ী; সুতরাং মুক্তিমার্গ নহে। তন্মধ্যে তান্ত্রিত ষট্চক্রভেদ সম্বন্ধে ক্রমটি কিছুই প্রকাশ নাই, হঠযোগীদের ভাষাতে যতদূর বুঝা যায় তাহাতে প্রাণায়ামকেই মূল হেতু ধরিতে হয়।

আমি ব্রহ্মচারিবাবার নিকট হইতে যে উপায় বা বিদ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছি, এতকাল তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। সিদ্ধজীবনীর প্রথম সংস্করণেও সে সম্বন্ধে কিছু বলি নাই; এবার ষট্চক্রভেদের ক্রম প্রকাশ নাই বলিয়া উপরে এত দোষ দেখান হইল, অথচ নিজের প্রাপ্ত উপায়টী গোপন রাখিব, ইহাই বা কেমন হয়?

এই সকল ভাবিয়া আমার সাধনাটী এখানে বলিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে; কিন্তু তদ্দ্বারা পাঠক যে বিশেষ কোন উপকার লাভ করিতে পারিবেন এমন মনে হয় না। আমি সাধনটী মাত্র বলিতে পারি, কিন্তু তাহা যে ভাবে ব্যবহার করিতে হয় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। মনে কর, সূত্রধার ডেস্ক বাক্স প্রস্তুত করার হাতিয়ারগুলি তোমাকে দিতে পারে, কিন্তু কি করিয়া যে হাতিয়ার চালাইতে হইবে তাহা তোমাকে দিবে কি প্রকারে?

আমি গুরুদেবের নিকট হইতে অজপা নামক বিদ্যাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার সাধন করতঃ উক্ত নাড়ীর মধ্যে কোন একটীতে প্রবেশ করিয়াছি; পাঠক এই মাত্র ধরিয়া লউন। এই অজপার কথা সাধারণে প্রচারিত নাই। এখন দেখিতেছি, কতকগুলি চতুর লোক সাধু সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে কৌশলে অজপা মন্ত্রটী আদায় করিয়া লইয়া শিষ্য সংগ্রহের ব্যবসায় চালাইতেছে। আমি তেমন কয়েকজনের সহিত আলাপ করিয়া জানিয়াছি, তাহারা অজপা মন্ত্রটী মাত্র জানিয়াছে উহা যে কিভাবে ব্যবহার করিয়া বিদ্যাতে পরিণত করিতে হয় তাহার কিন্তু কিছুই অবগত নহে। তাহারা যাহাদের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছে সেই সাধু বা সন্ন্যাসী নিজেই হয়ত তদপেক্ষা অধিক কিছু জানেন না, অথবা ব্যবহারটী গোপন করিয়াছেন।

অজপা সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে, তদ্দারা পাঠকগণের জন্য বলিতেছি যে, ইহা বিধিমতে সাধন করিতে থাকিলে দীর্ঘ-কালে মন্ত্রটী সাধকের নিকট রূপান্তরিত ভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠে, তদ্দারা মন্ত্রার্থটী এক অভিনব বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। এই পরিবর্ত্তন যে, সাধকের এক জন্মেই সম্পাদিত হইবে এমন নিয়ম নাই। এজন্য সাধক বিশেষের কয়েক জন্ম সাধন করার আবশ্যক হয়। যে সকল সাধক কোন জন্মে অজপার ঐ পরিবর্ত্তিত অবস্থাটী জন্মাইয়া লইতে পারেন, তাঁহারা পরবর্ত্তী জন্মে গুরুর নিকট হইতে অপরিবর্ত্তিত অজপাকে পাইলেও, গ্রহণ করামাত্র অজপা সেই সাধকের নিকট পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করেন। আমি এই তত্ত্বটী বিশেষভাবে অবগত হইয়াছি। অনেকে হয়ত ইহার কোন সন্ধানই রাখেন না। তাঁহারা ইহার জীবন্তভাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ। আমি এখানে অজপার আরোও বিস্তৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিতাম। তেমন করিতে গেলে সুফল না ফলিয়া

কুফলেরই সম্ভাবনা অধিক। এই সকল বিদ্যাদানের বিধি অন্যরূপ। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং ন ত্বেনামিরিণে বপেৎ ॥ ১১৩।
বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিষ্টেঽস্মি রক্ষ মাম্।
অসূয়কায় মাং মাদাঃস্তথা স্যাং বীর্য্যবত্তমা ॥ ১১৪ ২য় অ

অর্থাৎ—

ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি মৃত্যুজনক সঙ্কটে পড়িলেও অপাত্রে বিদ্যাদান করিবেন না; বরং বিদ্যা লইয়া মরিয়া যাইবেন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কোন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের নিকট মূর্ত্তিমতী হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার নিধিবিশেষ হইলাম, তুমি আমাকে রক্ষা করিও। অসূয়া প্রভৃতি দোষ সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট আমাকে দান করিও না, তেমন করিতে গেলে আমার বল কমিয়া যাইবে, আমি ভবিষ্যতে আর ফলদান করিতে পারিব না।"

এই অজপাকে বিদ্যা মূর্ত্তিতে সাধারণের পাঠ্য পুস্তকে প্রকাশ করিলে, তাহা অসূয়াদি দোষে দুষ্ট লোকের প্রতিও দেওয়া হয়। তেমন করিলে সেই বিদ্যাদ্বারা অন্যেরও ফল লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না। এ সকল ভাবিয়া অধিক অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। শাস্ত্রীয় নিষেধ বলবান্ রাখিয়া যতদূর প্রকাশ করা যাইতে পারে ততদূর প্রকাশের যত্ন করিতেছি।

অতঃপর আমাদের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাইতেছে। গুরুদেব আমাকে দীক্ষা দেওয়ার সময়ে অজপা বিদ্যার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। আমি তাহা কিভাবে বুঝিলাম, তাহাই ঠিক বুঝা হইল কি না, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য গুরুর নিকট বিদ্যাটীকে আমার ফিরিয়া বলিতে হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে অজপা সাধন করিয়া অজপাকে

পরিবর্ত্তিত আকারে পরিণত করিয়া লইতে পারেন, জন্মান্তর গ্রহণ করিলেও অজপা তাঁহাদের নিকট নবীকৃত রূপেই বিদ্যমান থাকেন। এই নিয়মানুসারে আমি গুরুর নিকট বলিবার সময়ে অবিকল গুরুদত্ত অবস্থায় না বলিয়া ঐ পরিবর্ত্তিত ভাবে অজাপাকে বলিতে বাধ্য হইলাম। তচ্ছ্রবণে আমার গুরু নিরতিশয় হৃষ্ট হইয়া বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিলেন "ওরে! তোর এই বিদ্যা পূর্ব্বে সাধা ছিল।" তখন তদীয় অনুমোদন পাইয়া নবীকৃত ভাবেই আমার সাধন চলিতে থাকিল এবং গুরুর আদেশ মত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কালে আমি উক্ত জংশনে পঁহুছিতে পারিলাম। তথায় গিয়া দেখি, বিদ্যুন্ময়ী কোন জ্বলন্ত শক্তি উর্দ্ধাধোভাবে আমার দেহাভ্যন্তরে সতত সঞ্চরমানা থাকিয়া দেহ রক্ষা করিতেছে। তাঁহার গতায়াতদ্বারা শরীরের অভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রগুলি আপনা আপনি পরিচালিত হইতেছে। ইহাকে প্রাণআদি বায়ুকর্ত্তৃক দেহপোষণ-ব্যাপার সাধিত হইতেছে বলা হয়।

ঐ শক্তির যাতায়াত রেখা-পথকে আমি নাড়ী বলিয়া বুঝিয়া থাকি এবং তাহাই আমার অন্তর্দৃষ্টির স্থল। সেই অন্তর্দৃষ্টি যে কোন্ নাড়ী পথে কতদূর ধাবিত হইয়াছে তাহা এখানে বক্তব্য নহে।

ইদাদীং বিচার করিয়া বুঝিলাম গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বেই কোন দৈবশক্তি আমার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ঐ পথটী খুলিয়া দিয়াছিলেন। আমাকে যে তাঁহার প্রদর্শিত পথে ধাবিত হইতে হইবে, এই কথা গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বে, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এখানে কথিত দৈবশক্তির আবির্ভাব-বৃত্তান্ত বলা যাইতেছে।

আমি নারায়ণগঞ্জে ওকালতী করার সময়ে চুড়ামণি যোগে ৺গঙ্গা স্নান করিতে গিয়াছিলাম; সেখানে বিধিমত গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করিয়া আসি। পরে কর্ম্মস্থলে আসিয়া গায়ত্রীর জপ

করিতে থাকি। জপিতে জপিতে গায়ত্রীর কোন নূতন ভাব আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জপ চলিতেছিল। তদবস্থাতে একদা সহসা কোন জ্যোতিঃ আমার অভ্যন্তর দেশ আলোকিত করিয়া প্রদুর্ভূত হইলেন এবং কয়েকটী কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অভ্যন্তরবর্ত্তী যে স্থান প্রদীপ্ত করিয়া ঐ জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া ছিল, এখন বুঝি তাহাই আমার এই নাড়ী-মার্গ।

বৈদিক গায়ত্রী আজকালও এতটা করিয়া থাকেন, একথা জানিয়া আমি আরত বলিতে পারিনা যে কলিতে বেদমন্ত্রদ্বারা কিছু হয় না।

অজপা ও শ্রীগুরুর উপদেশ এই উভয়ের প্রভাবে আমার অন্তর্দৃষ্টি বা নাড়ী প্রবেশ লাভ হইয়াছে। অতঃপর এই দুইয়ের মধ্যে কাহাদ্বারা কতদূর কার্য্য পাওয়া যায় সে কথার আলোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

অজপাদ্বারা অন্তঃকরণকে বহির্ব্যাপার হইতে প্রত্যাহৃত করতঃ কেন্দ্রীভূত করা যায়। তখন মন তোমার করায়ত্ত রহিয়াছে বুঝিতে হয়। তাহাকে দেহাভ্যন্তরে প্রেরণ করা তোমার পুরুষকার-সাপেক্ষ। গুরুদেবের বিশেষ উপদেশ মতে ঐ কেন্দ্রীভূত অন্তঃকরণকে আমার এমন ভাবে নিয়োগ করিতে হইয়াছিল যে পরিণামে দেখিলাম, আমি সেই জংশনে বা বিদ্যুন্ময়ী সেই জ্বলন্তী শক্তির নিকট উপস্থিত হইয়াছি। যদি গুরুর এই বিশেষ উপদেশ আমার চালক না হইত, তাহা হইলে সেই আয়ত্ত অন্তঃকরণকে আমি কোন্‌দিকে চালাইতাম তাহা বলা যায় না। যাহারা আমার গুরুদত্ত সেই বিশেষ উপদেশের ন্যায় বিশেষ শাসন প্রাপ্ত না হন, তাঁহারা অন্তঃকরণকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, কিন্তু ঐরূপ নাড়ীতে প্রবেশ করিতে যে পারিবেন এমন বলা যাইতে পারে না। ফলতঃ হৃদয়গত নাড়ীতে প্রবেশ করা বিশেষ দৈবানুগ্রহ ভিন্ন সম্ভব

হয় না। যে সকল সাধকের হৃদয়ে এই বিছা সাধনের বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাঁহারা অন্যান্য সাধকের কৃতকার্য্যতার বিষয় অবগত হইলে স্বতঃই অজপা সাধনের জন্য ব্যাকুল না হইয়া পারিবেন না। সেইরূপ উত্তেজনা জন্মিলে গুরু ভক্তির প্রভাবে সাধকের অন্তঃকরণ বিশেষ ভাবে সংস্কৃত হইতে থাকে, এবং গুরুর কৃপায় সাধনের উপযুক্ত পথপ্রদর্শক প্রভৃতি আপনা হইতে জুটিয়া যায়। অতএব এই অন্তর্দ্দৃষ্টিতে প্রবেশের দুর্ঘটতা দর্শনে নিরাশ হওয়া উচিত নহে।

আমাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির ঐ নাড়ীতে প্রবেশ যে ভাবে ঘটিয়াছে এখানে উদাহরণ স্বরূপ তাহা বলা যাইতেছে। সে পূর্ব্বেই অজপা সাধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারও জন্মান্তরীয় সাধন প্রভাবে অজপার ঐ পরিবর্ত্তিত ভাব আগত হইয়াছিল। তথাপি অভ্যন্তরে প্রবেশ (অন্তর্দ্দৃষ্টি) ঘটিয়া উঠিল না।

অজপা সাঁধনেই হউক বা অন্য সাধনেই হউক, বিশিষ্ট দৈবানুগ্রহে তাহার অত্যদ্ভুত দিব্যদৃষ্টিলাভ হয়। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে ললাটাস্থির অভ্যন্তর দেশে তাহার একটী জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুর বিকাশ হইল। তদ্দারা একস্থানে বসিয়া শত শত মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বত প্রাচীর ব্যবহিত স্থানও দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সে অতীব হৃষ্টচিত্তে আমাকে এই সিদ্ধিলাভের বৃত্তান্ত অবগত করাইলে আমিও ততোধিক বিস্মিত হইলাম এবং তাহাকে উপদেশ দিলাম যে, এই দিব্য-দৃষ্টীকে এইরূপ বাহ্য বিষয়ে ব্যবহার না করিয়া ইহার উপযুক্ত সদ্‌ব্যবহার করা উচিত। ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্ধৃত মন্ত্রে যে হৃদয় হইতে প্রসারিত একশত এক নাড়ীর বর্ণনা পাওয়া যায় "মূর্দ্ধানমভি-নিঃসৃতৈকা" তাহার একটী নাড়ী "মূর্দ্ধাভেদ করিয়া উর্দ্ধদিকে প্রসারিত রহিয়াছে। তৎসম্বন্ধে যোগ শিখোপনিষদে কথিত আছে—

"দ্বিতীয়ং সুষুম্নাদ্বারং পরিশুদ্ধং বিসর্পতি।
কপালসম্পুটং ভিত্ত্বা ততঃ পশ্যতি তৎপরম্॥"

সুষুম্না নামক ঐ যোগনাড়ীর দ্বিতীয় মুখ, মস্তকের অস্থিবিদারক ব্রহ্মরন্ধ্রকে ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে। তাহাদ্বারা পরমপদ সাক্ষাৎ করা যায়। তুমি ঐ যোগনাড়ীকে দর্শন কর, পরে তদ্দ্বারা পরমপদ দর্শন করিতে পারিবে। এইরূপ সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া কোনক্রমে কর্ত্তব্য হয় না। সে আমার কথার ঔচিত্য স্বীকার করিয়া বলিল, "কোন জিনিষটা বেদোক্ত হৃদয়, কোনটাইবা সেই নাড়ী, আমি ইহার কিছুই জানিনা। আপনি যদি দেহের মধ্যে ঐ স্থানটী আমাকে ঠিক্ করিয়া বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।" আমি বলিলাম, আমাদের বক্ষঃস্থলে যে ফুস্‌ফুস্ নামক কর্ম্মকারের ভস্ত্রার মত বায়ু সঞ্চালন যন্ত্র রহিয়াছে, আমরা নিদ্রিত হইলে কোন্ শক্তিদ্বারা উহা প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইয়া নাসিকা পথে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রমে ক্রমে বাহিরের বায়ু গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে বলিতে পার? সেই ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রটী স্নায়ু বিশেষদ্বারা মেরুদণ্ডের সহিত বান্ধা আছে। সেই মেরুদণ্ডের মধ্যে জ্বলন্তী শক্তি স্বয়ং সঞ্চরমান হইয়া নিম্ন গমনকালে ঐ স্নায়ুর মধ্যে যে চাপ দেয় তদ্দ্বারা ফুস্‌ফুস্ প্রসারিত হয়, সুতরাং নাসিকা পথে বাহিরের বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে, আবার ঐ শক্তির ঊর্দ্ধ গমনকালে চাপ রহিত হয়, তখন ফুস্‌ফুস সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত বায়ু নাসিকা পথে প্রশ্বাস ক্রমে বহির্গত হইয়া যায়। শরীর বিদারণ করিয়া দেখা গিয়াছে, মস্তক-মধ্যস্থ মস্তিষ্করাশি হইতে নির্গত অপেক্ষাকৃত কঠিন মজ্জাগুলি রজ্জুর ন্যায় হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ ছিদ্র-স্থান পূর্ণ করিয়া অবস্থান করে। তাহারই মধ্য দিয়া ঐ জ্বলন্তী শক্তি সঞ্চরণ করে এবং ঐ সঞ্চরণ স্থানকে পূর্ব্বোক্তি নাড়ী বুঝিতে হয়। এই বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের উত্তর গীতা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিলাম।

গুদস্য পৃষ্ঠভাগে ঽস্মিন্ বীণাদণ্ডস্য দেহভৃৎ।
দীর্ঘাস্থি মূৰ্দ্ধ্নি পর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে॥
তস্যান্তে সুষীরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সুরিভিঃ।
ঈড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী॥

বীণা নামক বাদ্যযন্ত্রের দীর্ঘ দণ্ডের ন্যায় গুহ্য হইতে পৃষ্ঠদেশ দিয়া মস্তক পর্য্যন্ত যে অস্থিচক্রদ্বারা রচিত মেরুদণ্ড দৃষ্ট হয়, তাহার নাম ব্রহ্মদণ্ড। উহার ভিতরের সূক্ষ্ম ছিদ্র পথই ব্রহ্মনাড়ী। তাহা ঈড়া পিঙ্গলার মধ্যস্থ সূক্ষ্ম সুষুম্না নামে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত হয়।

এই ব্যাখ্যা করিয়া বলিলাম তোমার দিব্য দৃষ্টিকে ললাট দেশ হইতে ঐ মজ্জা শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রেরণ কর।

সে তাহাই করিল। দিব্য-দৃষ্টিদ্বারা তাহার শরীরস্থ মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী মজ্জাশ্রেণীকে দেখিল যে, সেগুলি পরিসরে রজ্জুর মত গোল নহে বরং কতক চেপ্টা। উহা কোনস্থলে এক ইঞ্চ কোথায়ও ২ ইঞ্চ প্রস্থ দেখা গেল। উহা এত হাল্‌কা ও জ্বলন্ত যে দেখিলে ধুর্ণিত তুলাতে অগ্নিসংযোগের ভাবটী স্মরণ করাইয়া দেয়। মজ্জাগুলি, মৃত শরীরে শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয় বটে; এ ব্যক্তি জীবিত শরীরে তাহার কিছু ব্যত্যয় দর্শন করিল। মজ্জার ভিতর হইতে কোন জ্যোতিঃ বহির্গত হওয়াতে তাহা ঈষৎ হরিদ্রাভ দৃষ্ট হইল। এতদ্ভিন্ন তুলার ন্যায় ঐ মজ্জাগুলির গাত্রে বিবিধ রঙ্গের রেণু যেন ছড়ান থাকিয়া বিশেষ চাক্‌চক্য সম্পাদন করিতেছে। এই সকল কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, তোমাকে দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে হইবে না; নিজের অন্তঃকরণদ্বারা উহার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হইবে। সে কয়েক দিন আমার আদেশ মতে ঐরূপ করিয়া বুঝিল, মজ্জাগুলির অভ্যন্তরদেশে এক অভাবনীয় জীবন্তী শক্তি বিদ্যুল্লতার রূপ ধারণ করিয়া উর্দ্ধ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেছে। তদবধি সে নিজেও অন্তঃকরণদ্বারা ঐ শক্তির সঙ্গে মিশিয়া বর্ণিত নাড়ী পথে বিচরণ করিতে লাগিল।

সে ঐ নাড়ীপথে ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া মস্তিষ্ক মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তথায় উক্ত নাড়ী সর্পের ফণার ন্যায় ঈষৎ বক্র হইয়া শেষ হইয়াছে, ইহাও দেখিল। সে ঐ স্থান হইতে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে মাথার খুলির মধ্যস্থ ছিদ্রপথের বাহির হইতে সূর্য্যরশ্মির আগমন অনুভব করিয়া সেই দিকে আপন দিব্য দৃষ্টিকে প্রেরণ করিল।

আমরা জানি কয়েক বৎসরের সাধনে ঐ সূর্য্য-রশ্মিদ্বারা লক্ষিত পথে সেই ব্যক্তি দেহ হইতে বহির্গত হইতে পারিয়াছি।

ব্রহ্মচারিবাবা এই নাড়ী পথে বা অন্য কোন্ পথে দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ফিরিয়া আসিতেন তাহা আমি অবগত নহি। তিনি দেহে ফিরিয়া আসিতে যে কষ্ট বোধ করিতেন আমরা তেমন কোন লক্ষণ দেখি নাই। তাহাতে মনে করি, ব্রহ্মচারিবাবার দেহ হইতে বহির্গমন ও প্রত্যাগমন ব্যাপারে কোন ক্লেশ হইত না। উপরে যে ব্যক্তির কথা বলিলাম সে কিন্তু পুনরায় দেহে প্রত্যাগত হইতে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করে। এমন কি কখন বা শরীর সুধ্‌রাইয়া লইতে ঔষধ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে হয়।

আমাদিগের এই সকল লেখাদ্বারা পাঠক অন্তর্দ্দৃষ্টির ভাব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিকে সুযোগ পান, এই অভিপ্রায়ে প্রবন্ধ বিস্তার করা গেল।

পাঠক, মনে করিতে পারেন, ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার আরাধনা করিব, তিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, তবে 'অন্তর্দ্দৃষ্টি'র জন্য যত্ন করা কেন? এতদুত্তরে ব্রহ্মচারিবাবার উক্তি দেখাইতেছি। ঢাকা হইতে কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি বারদীতে যাইয়া ব্রহ্মচারিবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলে, "ঈশ্বরের স্বরূপ কি?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ঈশ্বর নামক কোনও পদার্থের সহিত এ পর্য্যন্ত আমার পরিচয় হয় নাই; ইহার পর যদি সেই বস্তুর অস্তিত্ব দেখিতে পাই তবে তোমাদিগকে বলিতে পারিব"। (১৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব তাহার উপাসনা করা অনাবশ্যক। মুক্তি পথে প্রবেশ করার জন্য "অন্তর্দ্দৃষ্টি" থাকা আবশ্যক।

তোমাদের ঈশ্বর ও শাস্ত্রের ঈশ্বর

এখনকার মনুষ্যেরা যে ঈশ্বর, ভগবান্ প্রভৃতি নামধারী জগতের পতি বা আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ রহিয়াছেন মনে করে ইহা মহা ভ্রম ; তেমন কেহ নাই।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ছাড়াইয়া এই ঈশ্বর পল্লীগ্রামে আধিপত্য করিয়াছিলেন না। এখন যেমন কথায় কথায় ঈশ্বর ব্যবহার করা হয়, তখন ঐরূপ স্থলে দেব, ধর্ম্ম, দুর্গা, কালী, হরি, মহাদেব প্রভৃতির কোন একটি ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি। আমরা যে বিদ্যাসাগর-কৃত বোধোদয় পাঠ করিয়াছি, তখন পর্য্যন্ত তাহাতে ঈশ্বরের প্রবন্ধ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল না। তাহার অনেক পরের সংস্করণে ঈশ্বর-প্রবন্ধ দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

পাঠকের মনে রাখিতে হইবে, এই প্রবন্ধে আমরা পরব্রহ্মকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হই নাই। সেই ব্রহ্ম, বুঝাইবার বস্তুও নহে। তদ্বিষয় ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

ভগবান্ ব্যাসাচার্য্য এতদুপলক্ষে সূত্র প্রণয়ন করিলেন, "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ॥" বেদান্তদর্শন, ২ অধ্যায়, ২ পাদ, ৩৭ সূত্র অর্থাৎ জগতের একজন পতি আছে, একথার সামঞ্জস্য হয় না।

শাস্ত্রে "ঈশ্বর" কথা পাওয়া যায় বটে, তাহা জগৎপতির নাম নহে, জগতের উপাদানের পরিচায়ক। মহাপ্রলয় অবস্থা হইতে এই জগৎ বিকাশ পাইয়াছে, সেই প্রলয়ই এই জগতের উপাদান এবং তাহাই ঈশ্বর কথার বাচ্য। সাংখ্যের ভাষাতে ঐ প্রলয়কে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বলে। নমুনা দেখিতে হইলে নিজের সুষুপ্তি অবস্থা স্মরণ কর। তাল করা মৃত্তিকা যেমন মৃন্ময়-ভাণ্ড সমূহের উপাদান, কারণ, সেই প্রলয়াবস্থা তেমন জগতের উপাদান কারণ

মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রথম জাগ্রৎ, দ্বিতীয় স্বপ্ন, তৃতীয় সুষুপ্তি অবস্থা ব্যাখ্যা করিয়া সুষুপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ"। অর্থাৎ "ইহাই সকলের ঈশ্বর"। অতএব জগতের উপাদানকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে।

জগতের পতি কেহ নাই; বন্ধুগণ। তোমরা না বুঝিয়া জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পাপের শাস্তা, পুণ্যের পুরস্কারদাতা, সুখ দুঃখের নিয়ন্তা, ন্যায়বান্ রাজার মত জগতের একজন পতি কল্পনা করতঃ সেই কল্পিত জগৎপতিকে ঈশ্বর বলিতেছে। ইহাতে কি তোমাদের যথার্থ ঈশ্বর মানা হইল? যাহা ঈশ্বর তাহাত পড়িয়া রহিল; যাহা নাই তাহাকে ঈশ্বর মানিলে কি নাস্তিকতা হয় না?

তোমার মানিত ঈশ্বর ও শাস্ত্রের ঈশ্বরে যে পরস্পর পার্থক্য রহিয়াছে, এখন তাহা দেখাইতে চাই।

কুম্ভকার যেমন ঘট, শরা, কলসী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সেই সকল মৃদ্‌ভাণ্ডের স্বামী (পতি) হয়, তোমাদের মনোগত ঈশ্বর ও তেমন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং জগৎপতি হইয়াছেন। এখানে মনে রাখিতে হইবে কুম্ভকার নিজে ঘট, শরা, কলসী প্রভৃতি হইতে পারে না; সে মৃত্তিকাকে ঐ সকল আকারে পরিণত করে মাত্র। এখানে মৃদ্‌ভাণ্ড সমূহের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার ও উপাদান কারণ মৃত্তিকা। তোমরা জগতের সেইরূপ নিমিত্ত কারণকে ঈশ্বর বল, আমরা উপাদান কারণকে ঈশ্বর বলিতেছি; (সেই উপাদানকে শক্তিই মনে করিতে পার)। তোমাতে আমাতে এখানেই দুই মত হইয়াছে।

বেদাদি শাস্ত্রমতে জগতের উপাদান কারণ ঈশ্বর। তোমরা যেমন কুমারকে ঈশ্বর বল, শাস্ত্র তেমন মৃত্তিকাকে ঈশ্বর বলে। তবে বিশেষ এই যে শাস্ত্রমতে ঐ মৃত্তিকার (জগদুপাদানের) এমন শক্তি থাকা স্বীকৃত হয় যে, মৃত্তিকা কুম্ভকারের সাহায্য ভিন্ন স্বয়ংই ভাণ্ডরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইতি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এক আমি বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করি' বলা হইয়াছে; সেই এক হইল— জগতের উপাদান কারণ। তিনি যদি কুম্ভকারের ন্যায় কেবল নিমিত্ত কারণ হইতেন, তবে বলিতেন,—আমি বহু আকারে জগৎ সৃষ্টি করি। তাহা না বলিয়া, 'বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি বলাতে' কি পার্থক্য হইল তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

জগতের সেই উপাদানের সর্ব্বশক্তি থাকা স্বীকৃত হওয়াতে সেই উপাদান ঈশ্বরকে একাধারে উপাদান ও নিমিত্ত এই উভয় কারণই বুঝিতে হয়। সুতরাং শাস্ত্রে কুম্ভকারের ন্যায় জগতের পৃথক্ নিমিত্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তাহাতেই বলিলাম তোমরা যাহা ঈশ্বর মনে কর, সেই নিমিত্ত কারণ (জগৎপতি) ঈশ্বর নাই।

"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।" এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেন—"কেবলং নিমিত্ত-কারণমীশ্বর ইত্যেষ পক্ষোবেদান্ত-বিহিত-ব্রহ্মৈকত্ব-প্রতিপক্ষত্বাৎ যত্নেনাত্র প্রতিষিধ্যতে" উক্ত ভাষ্যের ভাবার্থ:—যদি নিমিত্ত কারণকেই ঈশ্বর ধরা যায়, তাহা হইলে উপাদান কারণ বাদ থাকে এবং সেই বাদ থাকা উপাদানে রচিত জগৎ ও বাদ থাকিয়া যায়। সুতরাং জগৎ ঈশ্বর হইতে পৃথক বস্তু হইয়া পড়ে। বেদান্তের বিধান এই যে, এক ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নাই। এখানে জগৎই দ্বিতীয় হইতেছে। এরূপ হইল কেন? ঈশ্বরকে উপাদান কারণ না ধরিয়া কেবল নিমিত্ত কারণ ধরাতে। এজন্য সূত্রকার ব্যাস (নিমিত্তকারণ-স্বরূপ) জগৎ হইতে ভিন্ন জগতের পতি যে কল্পনা করা হয়, তাহা খণ্ডন জন্য এইসূত্র করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উপসংহারে শঙ্করাচার্য্য বলেন, "এবমন্যাস্বপি বেদবাহ্যাস্বীশ্বর-কল্পনাসু যথাসম্ভব-মসামঞ্জস্যং যোজয়িতব্যম্।" অর্থাৎ:—কেবল উপস্থিত স্থলে নহে, অন্য যতপ্রকার বেদবাহ্য (কেবল নিমিত্তকারণ) ঈশ্বর কল্পিত হইবে তৎসমুদায়ের প্রতি যথোচিত অসামঞ্জস্য দেখা আবশ্যক।

এখন দেখ, কেন আমি তোমাদের মানিত ঈশ্বরকে মান্য করিতে পারিতেছি না, এবং শাস্ত্র যাহাকে ঈশ্বর বলে, তাহা যে ঈশ্বর হইতে পারে, এবিষয় কখনও তোমাদের চিন্তার মধ্যে আসে না কেন।

এখানে তোমার ও আমার মতটী সোজা কথাতে বলিতেছি। মনে কর, তুমি ও আমি এক একটী মৃণ্ময় ভাণ্ড। তুমি বলিতেছ, আমাদের হইতে পৃথক একজন কুম্ভকার আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি বলিতেছি, তাহা নয়। মৃত্তিকার মধ্যেই এমন শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহার বলে মৃত্তিকা নিজেই আমাদের আকারে পরিণত হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত স্থলে বাস্তবিক একজন কুম্ভকার থাকাতে তোমার মতই যথার্থ হইতেছে; কিন্তু জগতের বেলাতে তেমন পৃথক সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, জগতের উপাদানটী নিজেই স্বশক্তিদ্বারা জগদাকার ধারণ করিয়াছে। মৃত্তিকা স্থানীয় সেই উপাদান ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করাইতে আমার দূরে যাইতে হয় না। হে মৃদ্‌ভাণ্ড বিশেষ (তুমি)! তুমি আছ,—আমি আছি, স্বীকার করিলেই আমাদের উপাদান-মৃত্তিকার (ঈশ্বরের) অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পার না; তুমি কিন্তু জগৎ আছে বলিয়া (কুম্ভকারের ন্যায়) তাহার নিমিত্তকারণ—ঈশ্বরও না থাকিয়াই পারে না, এমন কথা বুঝাইয়া আমাকে সেই ঈশ্বর মানাইতে পার না। আমি বলি কুমার ভিন্নই মৃত্তিকা স্বশক্তিতে তুমি আমি প্রভৃতির আকার ধারণ করিয়াছে। অতএব নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর নাই।

তোমরা বুঝ, জগৎ সাকার; তাহার নিমিত্তকারণ, জগৎ হইতে ভিন্ন; সুতরাং নিরাকার না হইয়া পারে না। ঘট কলসী ধরিয়া টানিলে যেমন কুম্ভকার আসেনা, সাকার পূজাতে তোমাদের মতে তেমন নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারে না; শাস্ত্রের ভাব অন্যরূপ। সাকার জগতের উপাদান সাকার বা নিরাকার যাহাই হউকনা কেন, সে যখন জগদাকার ধারণ করিয়াছে, তখন সেই উপাদান ঈশ্বর সাকার হইয়াছে; মাটি স্বভাবতঃ যে আকারেই থাকুক

না কেন, সে যখন ভাণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে, তখন মাটি ভাণ্ডাকারও। ভাণ্ড ধরিলেই যেমন মাটি ধরা হয়, তেমন সাকার পূজিলেই ঈশ্বর পূজা হইতে পারে। এই হেতুতে হিন্দুর সাকারোপাসনা সফল হইতেছে। তোমরা সাকারকে "রূপ-কল্পনা" মনে করিয়া প্রতারিত হইতেছ।

তুমি ও আমি উভয়ে হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াও মত সম্বন্ধে যে এতদূর তফাৎ হইতেছি, তাহার মূল কারণ জগতের উপাদান নিয়া। ঈশ্বর হইতে পৃথক কিছু জগতের উপাদান আছে কিনা, থাকিলে ঐ জিনিষটী ঈশ্বর কোথায় পাইলেন এ চিন্তা তুমি কর না। অথচ ঈশ্বর হইতে উপাদান পৃথক বস্তু কার্য্যতঃ তোমাকে ইহা মানিতে হয়। আমি ঐ গোলটুকু রাখি না, আমি বলি ঐ উপাদানই ঈশ্বর। তুমি এই কথাটী স্বীকার করিলেই কিন্তু সকল গোল মিটিয়া যায়। এখন ঈশ্বরকে নিমিত্ত মাত্র বলিতেছ, অতঃপর তাঁহাকে উপাদান ও ধরিতে পারিলে তোমাকে আর নিরাকার ভজিতে হইবে না।

গুরুদেবের কথার ব্যাখ্যা স্বরূপ এতদূর বলিয়া এখানে ব্যাসাদিকৃত মীমাংসা দেখান যাইতেছে। উত্তর মীমাংসার (বেদান্ত সূত্রের) প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে—

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৩ সূত্রং।

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ সূত্রং।

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ২৫ সূত্রং।

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ সূত্রং।

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ সূত্রং।

এই কয় সূত্রে ব্যাস ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা বিচার মীমাংসা করিয়াছেন ভারতীতীর্থ "ব্যাসাধিকরণ মালা" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া সপ্তমাধিকরণে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ বলেন—

নিমিত্তমেব ব্রহ্ম স্যাদুপাদানঞ্চ বেক্ষনাৎ ?
কুলালবন্নিমিত্তং তৎ নোপাদানং মৃদাদিবৎ ॥

'বহুস্যাম্' ইত্যুপাদানভাবোহপি শ্রুত ঈক্ষিতুঃ।
এক বুদ্ধ্যা সর্ব্বধীশ্চ তস্মাৎ ব্রহ্মোভয়াত্মকম্॥

অর্থাৎ :—সংশয় হইল,—ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, তাহা কি নিমিত্তকারণ, না উপাদানকারণ; "ইচ্ছা করিয়াছিলেন" এই শ্রুতি-বাক্যদ্বারা, নিমিত্তকারণ ঐ ইচ্ছা করিয়াছিল, অথবা উপাদান কারণ ঐ ইচ্ছা করিয়াছিল? এই দুইয়ের কোনটী বুঝিতে হইবে? এই সংশয়ের উত্তর পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন, (মৃত্তিকা প্রভৃতির ন্যায়) উপাদানকারণ ইচ্ছা করে নাই, (কুম্ভকারের ন্যায়) নিমিত্তকারণই ঐ ইচ্ছা করিয়াছিল। ব্যাস মীমাংসা করিলেন, যিনি ইচ্ছা করিলেন, তিনি "বহু হই" এরূপ ইচ্ছা করাতে তাঁহাকে উপাদান ধরিতে হইবে এবং তাঁহার একমাত্র বুদ্ধিই সমষ্টি স্বরূপ হইয়া আমাদিগের ব্যক্তিগত ব্যষ্টি বুদ্ধিকে প্রসব করিয়াছে। যেমন আমরা বুদ্ধিদ্বারা নিমিত্ত স্বরূপ হইয়া কোন কার্য্য করি, সেই উপাদান ঈশ্বর, সমষ্টি বুদ্ধিদ্বারা তেমন জগদাকার ধারণ ব্যাপারে নিমিত্তকারণও হইয়াছেন। অতএব ঈশ্বর নিমিত্তোপাদান উভয়াত্মক। শঙ্করাচার্য্য উক্ত ২৩ সূত্রে ভাষ্যে এই মীমাংসাই বুঝাইয়াছেন—"প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণঞ্চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যম্, নিমিত্তকারণঞ্চ; ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব।" অর্থাৎ ব্রহ্মকে জগতের প্রকৃতি (উপাদানকারণ) ও বুঝিতে হইবে এবং নিমিত্তকারণও বুঝিতে হইবে, কিন্তু কেবল নিমিত্তকারণ বুঝিতে হইবে না।

ব্যাস যে "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" সূত্রে সেই (কেবল নিমিত্ত কারণ) ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছেন, এখানে তোমাদের মানিত তেমন ঈশ্বরের অসামঞ্জস্য দেখান যাইতেছে।

নিমিত্তকারণ নিরাকার ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করিতে যান কেন? তিনি কি চিরকাল চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না? তাহার পরে. সেই ঈশ্বর জগতের উপাদান কোথা হইতে সংগ্রহ করেন? 'কুম্ভকার

নদীতীর হইতে ঘট কলসাদির উপাদান মৃত্তিকা আহরণ করে, ঈশ্বর জগতের উপাদান পান কোথায়? এসম্বন্ধে তোমরা নিরুত্তর।

জগৎ সৃষ্টি করা যেন তাঁহার স্বভাব বা রোগ বিশেষ, মানিয়া লইলাম। কাহাকে ভাল, কাহাকে মন্দ, কাহাকে সুখী ও কাহাকে দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করিতে যান কেন? এমন পক্ষপাত ব্যবহার তাহাতে আসে কোথা হইতে?

জগদতিরিক্ত তোমাদের নিমিত্তকারণ ঈশ্বর যখন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তিনি তাহা পালনও করিবেন, ইহা বেশ বুঝা যায়; তবে সেই সৃষ্টির বিনাশ ঘটে কেন? কুম্ভকারের ঘট, কলসী কেহ ভাঙ্গিতে থাকিলে কুম্ভকার আসিয়া তাহাতে বাধা দেয়; আমরা যখন বিনাশ পাইতে থাকি, তখন ঈশ্বরকে তেমন কোন বাধা দিতে দেখা যায় না। মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে কি ঈশ্বরের শক্তি নাই?

এই সকল অসামঞ্জস্য দেখিয়া বলিতে হয় তেমন ঈশ্বর নাই; তোমরা কেবল কল্পনার বলে ঈশ্বর মানিয়া থাক। শাস্ত্রোক্ত নিমিত্তো-পাদান কারণ ঈশ্বরকে কল্পনা করিতে হয় না; শাস্ত্রমতে পরিদৃশ্যমান সকলই ঈশ্বরোপাদানে রচিত সুতরাং সকলই ঈশ্বর। তেমন ঈশ্বরের প্রতি এই সকল অসামঞ্জস্য দেওয়া যায় না। সেই ঈশ্বর নিজেই উপাদান, অতএব সে জগতের উপাদান কোথায় পাইল, এমন প্রশ্ন হইতে পারে না। উপাদান ঈশ্বরকে জগদাকারে পরিণত করে কে? একথার উত্তরে বলিতে হয়, দুগ্ধ কিছুকাল পরে আপনিই নষ্ট হইয়া দধি হয়, সেইরূপ উপাদান অন্যের সাহায্য ভিন্ন স্বয়ংই জগদাকারে পরিণত হয়। যদি বল, পরিদৃশ্যমান জগৎই ঈশ্বর হইলে আমরা জগতের যে কোন বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে পারি কি? আমি বলিব হাঁ। তুমি এই বেগুন গাছ ঈশ্বরকে পূজা করিয়া তোমার তরকারীর সংস্থান করিতে পার, ধনবান্ মনুষ্যকে পূজা করিয়া অর্থ-কৃচ্ছ্র দূর করিতে পার, কিন্তু স্বর্গ লাভ করিতে পার না। দেবতা-ঈশ্বর পূজিয়া তরকারী অর্থ ও স্বর্গ তিনই পাইতে পারিবে। ধাতু, কাষ্ঠ বা মৃন্ময়ী

প্রতিমা পূজাতে কিন্তু ঐ সকল ধাতু ঈশ্বর বা কাষ্ঠ ঈশ্বর কিম্বা মৃত্তিকা ঈশ্বরের পূজা করা হয় না, তাহাতে দেবতা ঈশ্বরকে ডাকিয়া আনিয়াই পূজা করা হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে গীতাতে কথিত আছে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

যাহারা আমাকে যেমন ভাবে ভজনা করে তাহাদের নিকট আমি তেমন ভাবেই উপস্থিত হই। দেবতা ভাবে পূজা করিলে দেবত্ব পায়, পশু ভাবে ভজিলে পশু হয়। পুণ্যের অনুষ্ঠান করিলে আমি স্বর্গরূপে, পাপানুষ্ঠানকারীর নিকট নরকরূপে উপস্থিত হইয়া থাকি।

হিন্দুরা দেবতা, ব্রাহ্মণ, গো ও তুলসী, বট প্রভৃতি বৃক্ষ, এবং গঙ্গাদি তীর্থের পূজা করেন, তাহা যোল আনা ঈশ্বরের পবিত্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূজা বুঝিতে হইবে। যোলআনা ঈশ্বর পূজার অতীত। তাঁহাকে জানিতে হয়, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে জানিয়া থাকেন।

নব্যেরা যেমন আপনাদের মনের মত করিয়া ঈশ্বর ভজিতেছে, তেমন এই শ্লোকটীর ভাবও নিজের অভিপ্রায় অনুসারে গ্রহণ করে। সেই ভাবটী এই গানেতেই বুঝা যায়। "জানিগো জানিগো তারা তুমি কেবল ভোজের বাজি। যে তোমায় যে নামে ভজে তাইতে তুমি হওমা রাজি। মগে বলে ফরাতারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গি যারা" ইত্যাদি। পাঠক বুঝিলে, ইহা যে শাস্ত্রের বিপরীত কথা।

জগতের জীবজন্তুদিগকে, জগদাকারে পরিণত ঈশ্বরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ বুঝিতে হয়। তুমি পাদ্বারা গু মাড়াও, হাতদ্বারা ভাত খাও, ইহাতে যেমন হাত পায়ের প্রতি তোমার পক্ষপাত বলা হয় না, তোমার যে অঙ্গ যে কার্য্যের উপযুক্ত তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তুমি দোষী হওনা, উপাদানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বিসদৃশ ব্যবহার হইলেও তাহাতে উপাদান ঈশ্বরে দোষ

আসেনা। বিশেষতঃ সেই ঈশ্বরের অংশ—জীবগণ আপন আপন কর্ম্মদ্বারা সুখী দুঃখী হয়। সেই সকল কর্ম্মফল উপাদানেরই মধ্যদিয়া জীবের নিকট স্বভাবতঃ আগত হইয়া থাকে। তাহাই ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত বলা হয়; কারণ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সেই উপাদানের মধ্যেই থাকে, উপাদানের বাহির হইতে আসেনা।

আমরা ঈশ্বর হইতে পৃথক্ নই, ঈশ্বরেরই অংশ বিশেষ, হিন্দুর এই ভাব কি তোমরা স্বীকার করিতে পার? শাস্ত্রমতে জগতের উপাদান কারণকে ঈশ্বর বলিতে হয়, কি নিমিত্ত কারণকে ঈশ্বর বলিতে হয়, একথা জানিয়া কি তোমরা ঈশ্বর ভক্ত হইয়াছ? নিশ্চয়ই না। তোমরা লোকের মুখে শুনিয়া ছাপাকরা ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুস্তক এবং পত্রিকা পাঠ করিয়া প্রথমে কুম্ভকারের ন্যায় নিমিত্তকারণ একজন রহিয়াছেন ধরিয়া, তাহাকে গড, ঈশ্বর, ভগবান প্রভৃতি যে কোন নামে ডাকিবার স্বাধীনতা পাইয়াছ এবং আমাদের প্রতি দয়া করিয়া বঙ্গভাষাতে গড বলনা, ঈশ্বর বা ভগবান বলিয়া ডাক, দশজনের দেখাদেখি তাঁহাকে ভক্তি কর। আরও স্থির করিয়া রাখিয়াছ শাস্ত্রের অভিপ্রায়ও ইহাই। বাইবেল কোরাণ প্রভৃতির অভিমত ঐরূপ হইতে পারে কিন্তু শাস্ত্রের মত যে তাহার বিরুদ্ধ, এতক্ষণ তাহাই দেখাইলাম।

লোকে মনে করে ঈশ্বর মানিতে হইবে, নিমিত্তই হউক উপাদানই হউক বা উভয়াত্মক হউক, একভাবে মানিলেই হইল। আমরা দেখি এইভাবে নাস্তিকতা আসিতেছে। তোমরা এখন স্বেচ্ছামত ঈশ্বর মানিতে গিয়া খ্রীষ্টানের ন্যায় উপাসনা মানিতেছ; তেমন উপাসনা কিন্তু শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। দ্রব্য মন্ত্র সংযোগে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়া যে পারত্রিক উন্নতি হইয়া থাকে, তোমরা এই সকল কর্ম্ম-কাণ্ডের প্রতি আস্থা করিতে পারনা। মনে করিয়া থাক ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুদ্বারা আর পারত্রিক কি উন্নতি হইতে পারে? ঐ সৃষ্টবস্তু

গুলিকে যদি ঈশ্বরের অঙ্গ বুঝিতে পারিতে, তবে আর এমন ভাব আসিত না। ইহাই নাস্তিকতার ফল।

নব্য সমাজ জগতের উপাদান ঈশ্বরকে মান্য না করাতে তাহাকে নাস্তিক বলি। অতএব তোমরা জগতের উপাদান কারণকে ঈশ্বর বুঝিতে যত্ন কর। জগৎ ছাড়া নিমিত্তকারণ কিছু নাই। সে নাইকে তোমরা ঈশ্বর মান্য কর বলিয়া তোমরা যেমন আস্তিক হইতে পার না, আমি তোমাদের সেই ঈশ্বরকে (নাইকে) মান্য করিনা বলিয়া তেমন নাস্তিক হইতে পারি না।

আধুনিকেরা, ঈশ্বর ভগবান নামধারী সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভজনা করাকেই একমাত্র ধর্ম্ম মনে করে। একেত, উপাদান কারণ ঈশ্বর, পূজার অতীত; এই কথাই সমাজ বুঝিতে পারে না। তাহার পরে উপাসনাকে ধর্ম্ম না বলিলেও চলে। আমরা ঈশ্বর উপাদানে রচিত, সুতরাং ঈশ্বরই। এইরূপ বুঝ আসার নাম জ্ঞান। সেই জ্ঞান লাভ করার জন্য বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম। সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মধ্যে নিত্য নৈমিত্তিক ও উপাসনা কর্ম্ম বিধিবদ্ধ আছে। এসকল আমরা উপসংহারে বলিব। জ্ঞানলাভ করিলেও মরণান্তে পুনর্জন্ম হইতে পারে। যে সকল জ্ঞানী মরণে দেবযান পথ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিতে পারেন তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয় না। দেবযান পথে গতির জন্য "অন্তর্দৃষ্টির" অনুসরণ করা আবশ্যক। ব্রহ্মচারীবাবা এই অন্তর্দৃষ্টির বলে ইতরপ্রাণীর ভাষাও বুঝিতে পারিতেন।

সকল প্রাণীর ভাষা-জ্ঞান

ব্রহ্মচারী, পিপীলিকা ও শূকরের সহিত বিশেষ ভাবে কথা বার্ত্তা চালাইতেন; এ বিষয়ে যথাস্থানে কিয়ৎপরিমাণে আভাস দেওয়া গিয়াছে। এখানে ব্যাঘ্রের সহিত আলাপ করার দুই একটী ঘটনা বিবৃত করিতে চাই। কিন্তু এবিষয়টী সমাজের পক্ষে অসম্ভব বিধায়

ব্রহ্মচারী "অসম্ভবং ন বক্তব্যং" বলিয়া আমাকে প্রচার করিতে পূর্ব্বে বারণ করিয়াছিলেন। এখন আমি নিজের উপর ঝুঁকি রাখিয়া, সমাজের নিকট এই সকল কথা প্রকাশ করিতেছি। এজন্য ইহার সম্ভবতা প্রতিপাদন করা অগ্রে আমার কর্ত্তব্য হইয়াছে।

প্রায় সকল দেশেই, পশু পক্ষীর কথা বলায় নানারূপ গল্প প্রচলিত আছে শুনা যায়। শিক্ষিত সমাজ তাহা কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেন। হিন্দু বিজ্ঞানানুশীলন করিলে, ব্যাপারটী অসম্ভব বোধ হয় না। পাতঞ্জল যোগ সূত্রের বিভূতি পাদে ইহা "সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানং" নামক সিদ্ধি।

ভগবান্ বেদব্যাস তাহার যে ভাষ্য করিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি—

মনুষ্যগণ যেমন বিশেষ বিশেষ শব্দ সঙ্কেত দ্বারা আপন আপন মনোগত ভাব অন্যের জ্ঞানগোচর করিতে পারে, ইতর প্রাণীরা সেই পরিমাণে পারুক আর নাই পারুক, তাহাদের সুখব্যাঞ্জক ও দুঃখ প্রকাশক আওয়াজ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। কোকিল অন্তরের স্ফুর্ত্তিতে কুহুরবে গান করে, কিন্তু শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অন্যরূপ শব্দ করিয়া থাকে। এইরূপ কুকুর বিড়ালের বিশেষ বিশেষ শব্দদ্বারা তাহাদের অন্তরের ভাব কতকটা টের পাওয়া যায়। তাহাতেই সর্ব্ব প্রাণীর কৃতশব্দ উপলক্ষে তিনটী বিভাগ দেখা যায় ১ম শব্দ, ২য় অর্থ অর্থাৎ শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয়; ৩য় অন্য ব্যক্তির উপলব্ধি। এই ত্রিবিধ ভাবের একতা কোথায় আছে চিন্তা করিলে সেই স্থান ও ধরা যাইতে পারে। মনে কর আমার অন্তরে পিপাসার উদ্রেক হইলে আমি "জল দেও" বলি, ইংরেজ "ওয়াটার" বলে, আর গোজাতি বিশেষ স্বরে "হাম্বা" শব্দ করে। কিন্তু আমাদের তিনের অন্তরেই জলাভাবের একই রূপ স্পন্দন হইয়াছিল। আমরা বাহিরে তাহা তিন ভাবে ব্যক্ত করিলাম মাত্র। এই রূপে সকল জীবের কৃত শব্দের, শব্দ অর্থ ও প্রত্যয়ের (উপলব্ধির) যে পরস্পর বিভাগ দেখা যায়,

তাহা অভ্যন্তরের কোন এক ভাব হইতে উদিত হয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যিনি সেই একতা ও বিভাগের বিষয় ভালরূপ জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিতে সমর্থ হন।* ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, "বনবাস কালে পিপ্ড়াদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গুরুদেব যখন আমাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন, তখন দেখিয়াছি, একদল পিপ্ড়া, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আমার দিকে আসিতেছে, সর্ব্বাগ্রে দুই তিনটী পিপীলিকা দল ছাড়িয়া আমার দেহের উপরে বিচরণ করতঃ দুই এক স্থানে দংশন করিল। বুঝিল যে উহা খাদ্য বস্তু নহে। তখন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দলের অগ্রবর্ত্তী যাহার সহিত দেখা হইতে লাগিল, তাহার মুখে মুখ মিলাইয়া কি সঙ্কেত করিল। অমনি তাহারা ফিরিয়া চলিল। তাঁহাদের দেখাদেখি দলবদ্ধ পিপীলিকা শ্রেণীও পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। ইহাতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম পিপীলিকারা যখন মুখে মুখ মিলাইয়াছিল তখন বলিয়াছিল "উহা আমাদের খাওয়ার উপযুক্ত হয় নাই; আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, অতএব ফিরিয়া চল।"

আমি গুরুদেবকে বনে বাস কালীন ব্যাঘ্রাদির হাত হইতে কি রূপে রক্ষা পাইলে, জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে "আমার গুরু উপদেশ দিয়াছিলেন যে বনের বাঘে খায় না মনের বাঘে খায়" এই কথাতে বিশ্বাস করিয়া আমি ব্যাঘ্র ভয় অতিক্রম করিয়াছি।" এই কথা বলিয়া চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যে ভাবে ব্যাঘ্রের সহিত আত্মীয়তা করিয়াছিলেন সেই ইতিহাস বর্ণন করিলেন।

লোকনাথ ও বেণীমাধব ব্রহ্মচারী বাঙ্গালার পূর্ব্বদিক্স্থিত পাহাড়

* নব্যগণ আমাদেরও শাস্ত্রের কথাতে কতদূর আস্থা করিবেন বলা যায় না. এজন্য এখানে পাশ্চাত্যদিগের অনুমোদন ও দেখান যাইতেছে। ১৩১৩ সনের ১৩ই পৌষের হিতবাদী পত্রে, "প্রাণীর ভাষা" প্রবন্ধে লিখিত আছে, "ফ্রান্সের কস্মস্" নামক একখানি সাময়িক পত্রের লেখক বলিতেছেন,—ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ও আনন্দ ব্যঞ্জক ধ্বনিগুলিকে যদি ভাষা বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে পশু আদি প্রাণীর ও ভাষা আছে বলিতে হইবে।" ইত্যাদি। ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসের যমুনা পত্রিকাতে তাহার পূর্ব্বে ঢাকার "সারস্বত পত্রে" আমাদের এই সকল কথা বাহির হয়। কিছু দিন পরে পাশ্চাত্যদিগের কেহ কেহ বিষয়টী স্বীকার করিতেছেন।

হইতে অবতরণ করিয়া চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের জনমানব হীন জঙ্গলে আতিথ্য গ্রহণ করতঃ এক বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনের ক্ষণকাল পরে ব্রহ্মচারিদ্বয়ের কয়েক হস্ত ব্যবধানে থাকিয়া এক ব্যাঘ্র ভীষণরবে কানন ও পর্ব্বত নিনাদিত করিয়া তুলিল। সে চিতা বাঘ নহে—বঙ্গদেশের বিখ্যাত হিংস্র প্রধাণ বৃহজ্জাতীয় বাঘিনী। বাঘিনী ঘোর রবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চীৎকার করিতে থাকায় গুরুদেবের চিত্ত সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি ধ্যানে দেখিলেন ব্যাঘ্রী নবপ্রসূতা; কয়েকটি সদ্যোজাত শিশু সন্তান সম্মুখে রাখিয়া গর্জ্জন করিতেছে। ব্যাঘ্রীর মনোগত ভাবের জন্য ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া অবগত হইলেন, অভ্যাগত ব্যক্তিদ্বয় পাছে তাহাকে আক্রমণ করিয়া সন্তানগুলি অপহরণ করিয়া লয়, এই ভয়ে ভীতা হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। তখন তিনি বাঘিনীকে বলিতে লাগিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই। তুমি শিশু সন্তান লইয়া সুখে নিদ্রা যাও।" আমরা ব্রহ্মচারী আমাদের হইতে তোমার কোন আশঙ্কা নাই আর চীৎকার করিও না, এখন ক্ষান্ত হও। ইহার পরে ব্যাঘ্র-ধ্বনি অল্পে অল্পে শান্ত হইয়া কাননের নিস্তব্ধতা সম্পাদন করিল।

এইরূপ ভাবে মনুষ্য ও ব্যাঘ্র স্ব স্ব স্থানে সেই দিন অতিবাহিত করিল। পরের দিন বাঘিনী পুনরায় চীৎকার আরম্ভ করিল, ব্রহ্মচারী কারণ জানিবার জন্য গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং জানিতে পারিলেন বাঘিনী সবে এইবার মাত্র প্রসূতি হইয়াছে, পূর্ব্বে আর প্রসব করে নাই। তাহাতেই সন্তানগুলিকে কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে, বুঝিতে পারিতেছে না। এদিকে ক্ষুধা হওয়াতে সন্তানগুলি লইয়া কেমনে আহার সংগ্রহ করিবে, এই সমস্যায় পড়িয়া চীৎকার করিতেছে। তখন ব্রহ্মচারী উঠিয়া বাঘিনীকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি সন্তান এখানে রাখিয়া শিকার করিতে যাও, ছেলেদের জন্য আশঙ্কা নাই, আমি উহাদিগকে রক্ষা করিব।" এই সকল যেমন মনে মুখে বলিতে লাগিলেন, তেমনই হাত দিয়া

ইসারা করিয়া এই সকল ভাব তাহার অন্তরে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মচারী বারংবার এইরূপ করিলে পর ব্যাঘ্রী তাহা মানিয়া একাকিনী শিকারে বহির্গত হইল। ব্রহ্মচারীরা আপন আপন ব্যাপারে নিবিষ্ট হইলেন। ঐ পাহাড়ে তাঁহারা ফল, পত্র ভক্ষণ করিতেন। অনেকক্ষণ পরে বাঘিনী দুই তিন বার আওয়াজ করিয়া ক্ষান্ত হইল। ব্রহ্মচারী বুঝিলেন বাঘিনী বলিতেছে—"আমি আসিয়া চার্জ্জ গ্রহণ করিলাম, তুমি অবসর গ্রহণ কর।" ইহার পরে পুনরায় আহারান্বেষণের সময় হইলে যখন ব্যাঘ্রী সন্তানদিগকে আবাসে রাখিয়া বহির্গমন করিত, তখন ব্রহ্মচারীকে জানাইয়া যাইত যে আমি শিকারে চলিলাম, তুমি শিশুদিগকে রক্ষা করিও।

এই ভাবে ব্রহ্মচারীদ্বয় ৩।৪ দিন তথায় কাটাইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। তাঁহারা প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিলে পর ব্যাঘ্রীর প্রচণ্ড রব শুনিতে পাইলেন; যত পথ অতিক্রম করেন ততই তাহার চীৎকার শুনেন। তখন লোকনাথ বেণীমাধবকে বলিলেন "বেণী আজ যাওয়া হইল না, বাঘিনীর বড় কষ্ট হইয়াছে, আর কিছুকাল এখানে থাকা যাউক!" বেণী তাহাতে দ্বিরুক্তি করিলেন না। উভয়ে যাইয়া পূর্ব্বস্থানে উপনীত হইলেন এবং বাঘিনীকে বলিলেন, "যতদিন তোমার ছেলেরা তোমার সঙ্গে যাইতে না পারিবে, ততদিনের জন্য আমরা এখানে রহিয়া গেলাম। তুমি আর দুঃখ করিও না। এখন ক্ষান্ত হও।" বাঘিনী চুপ করিল।

তদবধি ব্যাঘ্রী শিকারে যাইবার সময়ে ব্রহ্মচারীকে পূর্ব্বের মত বলিয়া যাইত, এবং ফিরিয়া আসিয়া গর্জ্জন করিয়া আপনার প্রত্যাগমন-বার্ত্তা জানাইত। এইরূপ মাসেক কাল গত হইলে, ব্রহ্মচারী একদা দেখিলেন বাচ্চাগুলি বাঘিনীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে, কিন্তু কিছু দূর যাইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার পর একদিন বাঘিনী যখন শিকারে চলিল, শাবকগুলিও সঙ্গে সঙ্গে গেল। সেদিন আর

পথ হইতে ফিরিয়া আসিল না; ব্রহ্মচারী তখন আপনার অঙ্গীকার প্রতিপালিত হইয়াছে ভাবিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

আমি গুরুদেবের এই সকল কথাদ্বারা পশুপক্ষী আদির সহ কথাবার্ত্তা চালাইবার প্রণালী অন্যরূপ বুঝিয়াছি। পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল ময়না, টিয়া প্রভৃতি পাখী যেমন কথা বলে পশু আদি প্রাণিগণের কথাবার্ত্তাও বুঝি সেইভাবে সম্পাদিত হয়। এখন বুঝা গেল বাক্যের ও শরীরের ভাবভঙ্গী এবং মনের ইচ্ছার বিশেষ বলদ্বারা নিজের মনোগত ভাব পশু পক্ষ্যাদির অন্তরে সংক্রামণ করিতে হয়। পশ্বাদির আওয়াজ ও ভাব ভঙ্গীর বিষয়গুলি লইয়া গভীর ধ্যানপরায়ণ পুরুষ চিন্তা করিলে তাহাদের মনোগত ভাব বিদিত হইতে পারেন। ইহাও অন্তর্দৃষ্টি হইতে লাভ হয়।

আমরা এ স্থলে গুরুদেবের আরও একটা কার্য্যের বৃত্তান্ত লিখিতেছি।

বারদীতে "ভজলে রাম", নামক এক বৃদ্ধা সেবিকা তাঁহার আশ্রমে বাস করিত। সে একদা ব্রহ্মচারীর নিকট আবদার করিয়া বলিয়াছিল, "আমি কখন বাঘ দেখি নাই, আমাকে একটা বাঘ আনিয়া দেখাইয়া দিন।" ইহার কয়েক দিন পরে রাত্রিশেষে একটা চিতা বাঘ ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রমে উপনীত হয়। তখন গুরুদেব ভজলেরামকে ডাকিয়া জাগাইয়া, বাঘ দেখিতে বলেন। ভজলেরাম উঠিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল। আশ্রমের অভ্যাগত এবং অন্য যাহারা শুইয়াছিল, তাহারাও বেড়ার ফাঁকদ্বারা দেখিতে প্রবৃত্ত হইল। এত লোকের সাড়া পাইয়া ব্যাঘ্র পলায়নপর হওয়াতে ভজলেরাম কহিল, 'গোসাঞি, বাঘকে আর কিছুক্ষণ রাখুন, ভাল করিয়া দেখিয়া লই।' দেখিতে দেখিতে ব্যাঘ্র নিকটবর্ত্তী বৃক্ষলতার মধ্যে প্রবেশ করিল।

গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলির সহ পুনর্ম্মিলন

আমরা যেমন উদ্দেশ্য ভিন্ন এক পাও চলিতে চাই না, মুক্ত-পুরুষদিগের কার্য্যে তেমন ফলাভিসন্ধি থাকে না। ব্রহ্মচারী কি উদ্দেশ্যে হিমালয় ছাড়িয়া এত দীর্ঘকাল বারদী গ্রামে বাস করিতেছেন, এ প্রশ্ন স্বতঃই আমার মনে উদিত হইয়াছিল। তাই একান্তে উপবিষ্ট হইয়া গুরুদেবকে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি যে কি জন্য এখানে বাস করিতেছেন একথা এতকাল তাঁহার চিত্তে উদিত হয় নাই। তাহাতেই আমার প্রশ্ন শুনিয়া চমকিতবৎ হইলেন, এবং কয়েকদিন ধরিয়া ঐ বিষয়ের অনুধ্যান করিতে ছিলেন।

শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, হিতলাল মিশ্র উদয়াচলে গমনকালে যে, "তোমার নিম্নভূমে কর্ম্ম রহিয়াছে।" বলিয়া তাহাকে পথ হইতে ফিরাইয়া দেন, সেই কর্ম্ম সমাধানের জন্য প্রকৃতির প্রেরণায় এই নিম্নদেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সেই কর্ম্ম যে কিরূপ, তাহা তখনও স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। সেই জন্য একদা তাহার মুখে এই আক্ষেপ বাক্য শ্রবণ করিয়াছি যে, "হিতলাল যখন বলিল, তোমার নিম্নভূমে কর্ম্ম রহিয়াছে, তাঁহাকে যদি কিরূপ কর্ম্ম রহিয়াছে জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহা হইলে সে যখন আমা হইতে সেয়ানা ব্যক্তি, সম্ভবতঃ ঠিক কথা বলিয়া দিতে পারিত।"

যাহা হউক, অনেক দিন চিন্তা করিয়া অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলি দেহত্যাগের সময় বলিয়াছিলেন, "আমি মরিয়া গিয়া তোমার শিষ্য হইব, তখন তুমি আমাকে এই সকল বিষয় সুধরাইয়া দিও।" গুরু মরিয়া লোকালয়েতেই জন্মগ্রহণ করিবেন, হিমালয়ের বরফ মণ্ডিত শৃঙ্গে তাঁহার সহিত মিলনের সম্ভাবনা নাই। তাহাতেই হিতলাল মিশ্র "নিম্নভূমে কর্ম্ম রহিয়াছে" বলিয়াছেন।

ব্রহ্মচারীর সহ পূর্ব্বকথিত মত আলাপ হওয়ার কয়েক মাস পরে, একদা আমি তাঁহার নিকটে একান্তে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত সোৎসাহে বলিলেন, "আমার গুরুদেব ত আসিবেন, তুই তাঁহার সহিত বিচার করিতে পারিবি ?" আমি এই কথা শুনিয়া চতুর্গুণ উৎসাহে বলিলাম, "হাঁ। অবশ্য পারিব। তাঁহার সহিত যাহাতে দেখা করিতে পারি এমত ব্যবস্থা করিও।" গুরুদেব বলিলেন, "নিশ্চয়।"

ব্রহ্মচারীর গুরুর আগমন হইবে শুনিয়া আমার এত আহ্লাদ হওয়ার অন্য কারণ ছিল। "আমার গুরুদেব ত আসিবেন" এই উৎকর্ষজনক বাক্যে আমি তাঁহাকে জীবিত আছেন বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। ব্রহ্মচারিবাবার বয়স তখন প্রায় ১৫৮ বৎসর হইয়াছিল, তাঁহার গুরুর বয়স দুই শত বৎসরের অনেক অধিক হইবে, সুতরাং তাঁহার নিকট প্রাচীন কালের কথা শুনিবার কৌতূহল জন্মিয়াছিল।

গুরুদেব নিদ্রাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন, এবং কখনও তাঁহার চক্ষে পলক্ দেখা যায় নাই। তিনি আমার বিশেষ জিজ্ঞাসা মতে বলিয়াছিলেন, "আমার নিদ্রা হয় না। যখন তমঃ আমাতে উপস্থিত হইবে তখনই আমার পিণ্ডপাত (মৃত্যু) ঘটিবে।" তিনি নিদ্রা যাইতেন না, অথচ সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় রাত্রিকালে অতি অল্প সময়ের জন্য বিছানাতে যাইতেন। তখন তাঁহার কাছে কাহারও যাওয়ার নিয়ম ছিলনা। তিনি এক ঘরে একাকী থাকিতেন, তিনি রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া কি করেন, এই বিষয় জানিবার জন্য সেখানকার অনেকের বিলক্ষণ কৌতূহল ছিল। এ বিষয়ে যত্ন করিতে অনেকে ক্রটি করে নাই। কিন্তু কেহই বিশেষ কিছু জানিতে পারে নাই।

বারদীর একটি প্রাচীন ব্রাহ্মণ আমার নিকট বলিয়াছেন, "ঐ রহস্য ভেদ করার জন্য একদা রাত্রি দুই প্রহরের পরে একাকী তাঁহার

আশ্রমোদ্দেশ্যে চলিলাম। আশ্রমস্থিত সুবৃহৎ বিল্ব বৃক্ষের তলায় আসিলে দেখিলাম, প্রচণ্ড ঝড়ে যেমন ডাল পালা নড়িয়া থাকে, তেমন ভাবে বৃক্ষের শাখা পত্র নড়িতেছে। আমার বোধ হইল সে গুলি যেন নিম্নদিকে আসিয়া আমাকে চাপিয়া ধরিতে চায়। আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া দৌড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহার বারাণ্ডায় গিয়া আশ্রয় লইলাম। আমার পায়ের সজোড় শব্দে তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ভয় নাই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন। বলিয়া দিলেন আর কখনও এমন ভাবে আসিও না।"

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যেরা বলিত মানস সরোবর হইতে সিদ্ধ পুরুষেরা লঘুদেহ (Astral body) ধারণ করিয়া রাত্রিযোগে ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সহ আলাপ করিয়া থাকেন। আমি ইতি পূর্ব্বে এই সকল কথা শুনিয়া এতদূর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম যে, বাবার মুখে "গুরুদেব আসিবেন" শুনিয়াই মনে মনে ধরিয়া লইলাম, তাঁহার গুরু মানস সরোবর কি হিমালয়ের কোন বরফময় শৃঙ্গ হইতে অন্যান্য মহাত্মাদিগের সমভিব্যাহারে শিষ্যকে দেখিতে আসিবেন; গুরুদেব আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবেন, এরূপ ভাবিয়া আমি আহ্লাদে আটখানা না হইব কেন? যাহা হউক ২।৩ দিন পরে গুরুদেব পুনরায় ঐরূপ বলিলেন অর্থাৎ "আমার গুরুদেব আসিবেন ইত্যাদি।" আমার আহ্লাদের আর সীমা নাই। আমি সানন্দে বলিলাম, "তাঁহার বয়স ত বুঝি দুই শতেরও অধিক হইয়াছে। দাড়ি গোঁফগুলি সবই শুভ্র?"

গুরুদেব বলিলেন, "সে কি? তিনি যে দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া কাহারও গর্ভে জন্ম ধারণ পূর্ব্বক নূতন দেহ লইয়াছেন।" আমি একথা শুনিয়া একেবারে হতাশ হইলাম। ভগবান্ গাঙ্গুলিই যে পুনর্জন্ম ধারণ করিয়া আসিবেন ততটা পাকা বিশ্বাস তখন হইল না।

আবার কয়েক দিন পরে ব্রহ্মচারিবাবা বলিলেন, "স্থির হইয়াছে, গুরুদেব এখানে আসিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার গুরু বলিতে পার ?

আমি তাঁহার কথায় তত প্রীত হইলাম না। ভগবান্ গাঙ্গুলী পূর্ব্বদেহে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, আমি তাহার সহিত আলাপ করিব, আমার এই আশা নষ্ট হওয়াতে আমাদের মধ্য হইতে এক জনকে ভগবান্ গাঙ্গুলী বলিয়া খাড়া করিতে আমার কিছুমাত্র উৎসাহ হইল না।

আমি উপেক্ষা ও তামাসা করিয়া বলিলাম, "আর কে, আমিই তোমার সেই গুরু।"

ব্রহ্মচারীতে এই একটা বিশেষত্ব দেখিয়াছি যে, তিনি কোন কথাই ছোট বলিয়া উড়াইয়া দিতেন না। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যত কোন সামান্য কথা উত্থাপিত হউক না, তিনি উহা হইতে একটা বৃহত্তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতেন।

আমার তামাসার উক্তিটা ও ফেলিলেন না। বলিলেন, "তোর বয়স কত ?" আমি বলিলাম, পঁয়ত্রিশ, ছয়ত্রিশ; তিনি কহিলেন, "তুই আমার গুরু কিরূপে হইবি ? গুরুদেব যে প্রায় ৬০ বৎসর যাবৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন।" আমি কৌতুক করিতে ছাড়িলাম না, বলিলাম, "বাঃ তাতে ক্ষতি কি ? যদি আমার বয়স ৬৫ বৎসর হইত, তবে তোমার গুরুদেবের বর্ত্তমানে আমার জন্ম ধরা যাইত, সুতরাং তোমার গুরুদেব মরিয়া আমিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন মনে করা যাইত না। মনে কর, আমি অন্য এক জন্ম ধারণ করিয়া ২০।২৫ বৎসর কাটাইয়া আসিয়াছি অথবা এই জন্ম ধারণ করিতেই ততটা সময় লাগিয়াছে।

গুরুদেব এবারও আমার তামাসায় উপেক্ষা করিলেন না। বলিলেন, "আচ্ছা, থাক্ আমি ধ্যানস্থ হইয়া দেখিব।"

আমি এই সকল বাজে কথা ভুলিয়া গিয়া নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে

নিরস্ত হইলাম। দিন গেল রজনী সমাগত হইল। আমি পূর্ব্বদিকের কুটীরে শয়ন করিলাম। গুরুদেব উত্তরদিকের গৃহে অন্যান্য রাত্রির ন্যায় নিভৃতে রহিলেন। সেই রাত্রিতে তাঁহার ভাবের কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিতে পারিলাম। আমি তৃতীয় প্রহর রাত্রিকালে জাগরিত হইয়া তাঁহার গান শুনিতে পাইলাম। তিনি এই সময়ে কোনরূপ সাড়াশব্দ করেন না, অথচ এই রাত্রিতে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া গাহিলেন—

"আমার সহায় আছেন ত্রিশূলধারী"।

যামিনী প্রভাত হইল, আশ্রমবাসীরা বহির্গত হইয়া আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। আমি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। গুরুদেবের গৃহমার্জ্জন সর্ব্বাগ্রে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এখন তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলেন। দিবার প্রায় চারি দণ্ড গত হইল, আমি অন্যান্য দিনের ন্যায় তাঁহার পদপ্রান্তে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে ছিলাম, তিনি গম্ভীর অথচ কিঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে আমাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "তুমি আর আমাকে প্রণাম করিও না।" আমি সহসা তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মনে বড় ভয় হইল, ভাবিলাম, হায় ইহার মধ্যে এমন কি দোষ করিলাম যে এই সিদ্ধপুরুষ আমার প্রণাম করার স্বত্ব এককালে রহিত করিলেন। বাহিরে ত জানিয়া শুনিয়া কোন অপকর্ম্ম করি নাই। রাত্রিতে যে সকল কুচিন্তা করিয়াছি, তাহার কোনটা বড় গুরুতর মারাত্মক হইয়াছে। ইনি ধ্যান-বলে উহা জানিতে পারিয়া আমাকে জন্মের মত দূর করিয়া দিতেছেন। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শূন্যনয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কোনরূপ বাঙ্‌-নিষ্পত্তি করিতে ভরসা হইল না। এমন সময়ে তিনি বলিলেন, "আমার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তুমিই আমার সেই গুরু। তুমি আজিও আমার প্রতি সেই অনুগ্রহ খর্ব্ব করিতে পার নাই। আজিও আমার পাছে পাছে আসিয়া আমাকে দেখিতেছ। এস গুরুদেব তোমাকে

প্রণাম করি। এতদিনের পরে পরিচয় হইল।" এই বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। আমি পূর্ব্বের ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম। কোনও কথা বলিতে সমর্থ হইলাম না। বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল। ইহার পরে গুরুদেব কহিলেন, "আমি যখন তোমার এই শরীরের গুরু হইয়াছি, তখন তুমিও আমাকে প্রণাম কর।" আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেছিলাম, তখন কহিলেন, "আর একটু এইভাবে থাক। দেখ গুয়ো। তুমি বলিয়াছিলে, তুমি সহজে আমার কথায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না, আমি বিরক্ত হইয়া তিনবার লাথি মারিলে পর আমার কথা শুনিবে। গুয়ো হে! আমি তোমার উপর ক্রোধ করিয়া যে তিনবার লাথি মারিব, একথা আমার প্রাণে সহ্য হয় না। আমি এখনই সেই লাথি মারিয়া খালাস হইতেছি। "ইহার পর তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিও।" এই বলিয়া তিনবার আস্তে আস্তে আমার পৃষ্ঠদেশে তাঁহার কোমল পাদপদ্ম স্পর্শ করাইলেন। ১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কতক্ষণ পরে কতকটা সংজ্ঞা লাভ করিলাম। অনেক যত্নে আমার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইল। তখন বলিলাম, "গুরুদেব! তুমি যাহা যাহা বলিলে, এগুলি যদি সত্য বলিয়া ধরিয়া নেই, তবে তোমার প্রতি আমার ভক্তির লাঘব ঘটিবে সুতরাং জ্ঞানের ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। আর যদি অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেই, তবে গুরুবাক্যে অবিশ্বাস করা হয়। আজ তুমি আমাকে উভয় সঙ্কটে ফেলিয়াছ।" এইরূপ নানা কথা বার্ত্তাতে সেদিন কাটিয়া গেল।

কএক মাস গত হইলে, গুরুদেব আমাকে বলিলেন, "ওহে তুমি পূর্ব্বদেহে অবস্থিত হইয়া আমাকে যে মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলে আমি পরিচয় না পাইয়াও তোমাকে সেই মন্ত্রই দিয়াছি, তোমার মন্ত্র ফিরিয়া তোমাতেই অর্পিত হইয়াছে। তোমার এ জন্মে আমার সহিত দেখা হওয়া অবধি, তোমার মধ্যে কিছু বিশেষ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম;

তখন তোমাতে 'ডাক্‌রা' আমের ভাব দেখিয়াছিলাম।" 'ডাক্‌রা আম' শব্দটী আমাদের দেশে চলিত থাকা সত্বেও বিশেষ ভাব বুঝিবার জন্য অর্থ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "গাছের মধ্যে আম ধরিলে, পাকিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে যদি আমগুলির প্রতি বিশেষ খেয়াল করা যায়, তবে কোন্ আম সকলের আগে পাকিবে, তাহা বলা যাইতে পারে। সেই আমের রঙটি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হয়। তখন আম 'ডাকরিয়াছে' বলিয়া থাকে।"

ইহার পরে গুরুদেব আমার পিতৃদত্ত নাম তারাকান্ত গাঙ্গুলী স্থলে "ব্রহ্মানন্দ ভারতী" এই নূতন নাম দিলেন।

এখানে পাঠককে ৩১২ পৃষ্ঠার কথা স্মরণ করিতে হইবে। "অজপা" বিদ্যা গ্রহণের পরে আমি কি বুঝিলাম, একথা যখন গুরু-দেবকে কিছু পরিবর্ত্তিত ভাবে বলিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই বিষয়ে তোর পূর্ব্বে খাটা ছিল।" এখানে পাওয়া গেল ভগবান গাঙ্গুলী এই অজপা বিদ্যা লোকনাথকে দিয়াছিলেন। এখন ভগবানের তারাকান্ত জন্মে লোকনাথ আবার সেই বিদ্যা দিয়াই তাঁহাকে শিষ্য করিলেন। ভগবান জন্মে গুরু ভগবান গাঙ্গুলী, এই অজপাকে নিজে সাধন করিয়া শিষ্য লোকনাথ ঘোষালকে তদ্দারা দীক্ষিত করিয়াছিলেন, একথা সহজেই বুঝা যায়। ভগবান্ জন্মে খাটা অজপা বিদ্যা সম্ভবতঃ সেই জন্মেই উক্ত পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাতেই ভগবান্ গাঙ্গুলী এজন্মে তারাকান্ত গাঙ্গুলী হইয়া যখন গুরুর নিকট ঐ বিদ্যার পুনরুক্তি করিলেন, তখন ঐ পরিবর্ত্তিত আকারে অজপা মুখ হইতে বহির্গত হইল। তচ্ছ্রবণে গুরু লোকনাথ বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ইহা তোর পূর্ব্বে খাটা ছিল।"

সে যাহা হউক, তাঁহার সহিত যে আমার জন্মান্তরের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহার নানা লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে। একদিন আমরা গুরু শিষ্য দুইজনে নিভৃতে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া কি আলাপ করিতে

করিতে (স্মরণ নাই) আনন্দে এত মগ্ন হইয়াছিলাম যে, উভয়ের মুখ দিয়া অজস্র হাসির উচ্ছ্বাস এমন বহিয়াছিল যে, তেমন নিরুপম সুখের হাস্য জন্মাবচ্ছিন্নে ও কখন হাসি নাই। আশ্রমের কেহ কেহ এই ব্যাপার দর্শনে নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মধ্যে অন্য সকল অপেক্ষা অধিক প্রণয় থাকার কারণ অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়, তাহাদের পূর্ব্ব জন্ম। জন্মান্তরে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ ও অর্জ্জুন নর নামে ধর্ম্মের দুই পুত্র ছিলেন। এই দুইজন একাশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতেন ও বিশিষ্ট প্রণয়ে আবদ্ধ ছিলেন। সেই নারায়ণ ও নর, কৃষ্ণার্জ্জুন হইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করাতে সেই উভয়ের মধ্যে এত সৌহার্দ্দ ছিল।

গুরুদেবের পরম ভক্ত শ্রীমান পঞ্চানন্দ কর্ম্মকার বলিতেছে গুরুদেব নাকি তাহার নিকট দৃঢ়তা সহকারে বলিয়াছেন, "আমি আমার দলের লোকদিগকে উঠাইয়া লইবার জন্য এখানে অবস্থান করিতেছি।" বর্ত্তমান সময়ে তদীয় শিষ্যও ভক্তদিগের ব্রহ্মচারিবাবার প্রতি অচলা ভক্তি দেখিয়া এই কথা সমর্থন করিতে হয়। বারদীর নাগপরিবারের অনেক মহিলা এখন তাঁহাকে যে ভাবে পূজা করিতেছেন, তাহা এই ধর্ম্ম বিভ্রাটের সময়ে কোনক্রমে সম্ভবপর হইতে পারিত না। এই সকল শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ যে গুরুদেবের দলের লোক, এটী সহজেই বুঝা যাইতেছে।

কাহারা তাঁহার দলের, কাহারা তাঁহার দলের নয়, ইহা ব্রহ্মচারিবাবা সহজেই চিনিতেন। অনেকে ব্রহ্মচারিবাবাকে গুরু করিতে আসিত, তিনি তাহাদিগকে শিষ্য করার অনুপযুক্ত দেখিয়া অন্যের নিকট প্রেরণ করিতেন। অনেককে আমাদের সমক্ষেই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

গুরু লোকনাথ ব্রহ্মচারী আমাদের গত জন্মের ও ইহ জন্মের আচরণ একই জন্মের কার্য্যের ন্যায় হিসাব করিয়া আমাদিগকে চালাইতেন? কোন এক সময়ে তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, আমি

ভগবান্ গাঙ্গুলী জন্মে তাঁহাকে শিষ্য করিয়া তাহার জন্য যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। অবশ্য আমার প্রাক্তন কর্ম্মের ফলেই এরূপ করিতে হইয়াছিল। সেই জন্মের সেবাতেই আমার তাদৃশ প্রাক্তন কর্ম্ম ক্ষয় হইয়াছে, না তারাকান্ত গাঙ্গুলী জন্মে ও সেবার কিছু বাকি রহিয়াছে, একথা পরীক্ষা করার জন্য আমাকে একটা উচ্ছিষ্ট বাটী ধুইয়া আনিতে বলিলেন। আমি তাহার আদেশ প্রতিপালন করিলাম। কিন্তু তিনি তাহাতে তুষ্ট না হইয়া আমার জন্য দুঃখ করিয়া বলিলেন, "তুমি গত জন্মে যে আমার এত সেবা করিয়াছ, তাহাতেও কি তোমার সেবাকরা সমাপ্তি হয় নাই, এ জন্মেও যে সেবা করিতে পারিতেছ? বুঝিলাম আমি যদি উচ্ছিষ্ট বাটীটা ধুইতে না চাহিতাম, তাহা হইলে আমার সেবাকর্ম্ম গত জন্মেই শোধ হইয়াছে ভাবিয়া তিনি তুষ্ট হইতেন।

আমি এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমি যে গত জন্মে তোমার গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলী ছিলাম, এই বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ ও আমার স্মরণ হইতেছে না, কিরূপে তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিব, তাহা বলিয়া দেও। তিনি বলিলেন, "বেহুলার হাটন, বেহুলার খাটন, বেহুলার গঠন, আমি তোমার মধ্যে তাঁহার চাল চল্‌তি সমুদয় দেখিতেছি। তুমি সেবারে গাঙ্গুলী ছিলে, এবারেও গাঙ্গুলী হইয়াছ, তুমি গত জন্মে পুত্র পরিবার বিষয় সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় পরিব্রাট্ হইয়াছিলে, এজন্মেও কাহারও উপদেশ ভিন্ন, সেই সকল এবং ওকালতী পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছ। তোমার শাস্ত্রানুরাগ স্বতঃ উদিত হইয়াছে।"

"পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতং ধনম্।
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতা নারী চাগ্রে ধাবতি ধাবতি॥" ইত্যাদি।

"আমাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া এত লোকে মান্য করে, আর তুই আমাকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিস্ না, কেন এমন হয়?" আমি বলিলাম, যুক্তিদ্বারা মত স্থাপন করাকে আমি বড় মূল্যবান্ মনে করি।

বিচার আদালতে এই বিষয়ের বিশেষ পরীক্ষা অহরহঃ পাইয়া থাকি। অতএব জিজ্ঞাসিত বিষয়ে যুক্তিদ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাই না। তুমি নাকি যোগী, তোমার যোগবল দ্বারা এতৎসম্বন্ধে আমায় কোন দৃঢ়-প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতে পার? তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি এখন যে সকল কার্য্য করিয়া থাক, তাহা তোমার বিবেচনা মতে উচিত কার্য্য কি অনুচিত কার্য্য মনে কর?" আমি বলিলাম, "আমি বুদ্ধি দ্বারা যাহা ঠিক কর্ত্তব্য বুঝি তাহাই সম্পাদন করি। অকর্ত্তব্য বুঝিলে, করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন?" তিনি বলিলেন, "ভাল, ইহার পরে যাহা নিজের কর্ত্তব্য নয় বুঝ, তাহা করিবে কিনা?" আমি কহিলাম, "না; জানিয়া শুনিয়া স্বাধীন ভাবে, অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবনা।" তখব তিনি কহিলেন, "তোমার খাতা বহি আনিয়া লিখ দেখি—" এই বলিয়া আমাকে খাতা বহিতে লিখাইয়া দিলেন যথা—"যখন দেখিব যে আমি গু কাটিতেছি, তখন আমার চক্ষে যে পরদা পড়েছে তাহা তিরোহিত হইবে। অর্থাৎ দিব্য চক্ষুর উদয় হইবে। ইতি ১২৯৫।৭ বৈশাখ বারদী। এই উপদেশ গত শরীরস্থ যখন তৎকালীন শিষ্য, বর্ত্তমানকালের গুরু, সেইখানে এই উপদেশ পাইলাম। যদি আমার অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে তবে এই কথায় আমার বিশ্বাস হইবে নচেৎ নয়।" ইতি ১২৯৫।৭ বৈশাখ বারদী। ব্রহ্মচারীবাবা যে সকল কথা বলিয়াছিলেন আমি খাতাতে তাহা অবিকল লিখিয়া ছিলাম এবং সেই খাতা হইতে এখানে ঠিকভাবে তাহা তুলিয়া দিলাম।

এখানে "যদি আমার অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে, তবে এই কথায় আমার বিশ্বাস হইবে নচেৎ নয়।" এই "অঙ্গীকৃত" কখন হইয়াছিল? এতদুত্তরে আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলিতেছি।

(১১৩ পৃষ্ঠাতে) গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলী লোকনাথের শিষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন, এমন অঙ্গীকার করেন। তখন লোকনাথ বলিলেন, "আগামী জন্মে তোমার এই জন্মের কোন্ লক্ষণদ্বারা তোমাকে চেনা

যাইতে পারিবে?" ভগবান্ উত্তর করিয়াছিলেন, আমি যে গু কাটিতেছি, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিতেছিনা, এই বুঝ আমার আগামী জন্মেও আসিবে। ইহাই আমার বিশেষ লক্ষণ থাকিবে।

সেই আগামী তারাকান্ত গাঙ্গুলী জন্মে, যখন (ভগবান্) কহিলেন আমি যে ভগবান্ গাঙ্গুলী ছিলাম তাহার প্রত্যয় কি? লোকনাথ তখন ধ্যান করিয়া ঐ গু কাটার কথাটি স্মরণ করিয়া উত্তর স্বরূপ দেখাইয়া দিলেন—"যখন দেখিব যে আমি গু কাটিতেছি ইত্যাদি।"

ইহার পরে আমার বিদেশ পর্য্যটনের প্রবল ইচ্ছা হইলে, গুরুদেবের নিকট অনুমতি চাহিলাম। তিনি বলিলেন, "সংসার শত্রু বটে, যাহারা দুর্ব্বল ও ভীরু তাহারাই সংসারের ভয়ে পলাইয়া দুর্গম পর্ব্বত-কাননাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করে; আর যে বীর পুরুষ হয় সে শত্রুর রাজধানীতে নিশান গাড়িয়া বসে। সংসারবিষকে শিব কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম নীলকণ্ঠ।" শিব বলিয়াছেন, "ন বিষং বিষমত্যাহুঃ সংসারোবিষমুচ্যতে।"

গুরুদেব আরও বলিলেন, "দেখ, আমার সংসার ছিল না, তথাপি লোকালয়ের মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছি কেন বুঝিয়া নেও; সংসারকে অতিক্রম করিতে হইলে বনে যাইতে হয় না।" আমি বলিলাম, তোমরা বলবান্ হইয়াও যখন বনে পলায়ন করিয়াছিলে, পশ্চাত্মুখে নিজের বলাবল বুঝিয়া সংসারে প্রবেশ করতঃ তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছ, আমি তেমন না করিয়া সহসা সংসারের সহ যুঝিয়া উঠিতে পারিব কেন?"

তিনি বলিলেন, "পাহাড় পর্ব্বত ভ্রমণের ক্লেশ তোমাকে আর সহিতে হইবে না। আমি এতকাল খাটিয়া যাহা লাভ করিয়াছি, তদ্দারাই তোমার কার্য্য হইতে পারিবে।" পরিশেষে আমার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বলিলেন, "আচ্ছা একবার ঘুরিয়া আবেগটা ক্ষয় করিয়া এস। কিন্তু তোমাকে সংসারের মধ্যে থাকিতে হইবে।" তদনুসারে আমি বাহির হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে উত্তরাখণ্ডে ও অন্যান্য

স্থানে বৎসরাধিককাল পর্য্যটন করিয়াছিলাম, কোথায়ও স্থির থাকিতে পারিয়াছিলাম না; অনধিক কাল পরে আমাকে ফিরিয়া দেশে আসিতে হইয়াছিল।

বাহির হইয়া অন্য কিছু লাভ হউক, আর নাই হউক, আমি যে ঠিক কার্য্য করি না, গু কাটিয়া যাইতেছি, এটা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। আজ ও আমার গু কাটা ক্ষান্ত হয় নাই। গুরু নিষেধ করিলেন, "অসম্ভবং ন বক্তব্যং"। তাঁহার উপদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক গুরুদেবের বিষয়ে লেখনী চালন না করাই উচিত, এ কথা বুঝি, কিন্তু তথাপি এতগুলি লিখিলাম কেন? আমি যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া জানি, তাহা করিব না বলিয়া যে দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলাম, আমার সেই দৃঢ়তা কোথায় রহিল?

আমি একদা কাতরভাবে গুরুদেবকে বলিয়াছিলাম, কিছুতেই যে আমার পূর্ব্ব (ভগবান গাঙ্গুলী) জন্ম স্মরণ হইতেছে না ইহার উপায় কি? তখন গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন, "তোমার এই জন্মেই পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ হইবে; যদি মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বে সেই স্মৃতি না আসে, তবে মৃত্যু সময়ে এক কালে বহু জন্ম স্মরণ হইবে।" আমি তাহার পরে মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছি যে শেষ অংশই ফলপ্রদ হউক। মরণ কালে যেন বহুজন্ম স্মরণ হয়। এখন ইহার কিছু আভাস যে পাইতেছি ইহাও বলিতে পারি। গুরুদেবের লোকান্তর গমনের পরে আমাদের মধ্যে কেহ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া আপন পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া লইতে পারিয়াছে, ইহাও আমার জানা আছে।

উপরি লিখিত মতে আমিই যে পূর্ব্বজন্মে ভগবান্ গাঙ্গুলী ছিলাম, একথা অবগত হইয়া আমার মধ্যে কোন নূতন বল আসিল এবং বিশেষ স্ফূর্ত্তি ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। তদ্দর্শনে গুরুদেব আমার অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য আশঙ্কা করিয়া আমাকে কিছু নরম করার জন্য অনেক দিন পরে বলিয়াছিলেন, "ওহে তুমি যে আমার গুরুদেব

ছিলে বলিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহা ঠিক নয়।” ব্রহ্মচারী-বাবার মধ্যে এরূপ উলটা চাল খেলিবার অভিনয় আমরা অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি এবং এই পুস্তকে তাহার একটা অভিনয় লিপিবদ্ধ করাও হইয়াছে। আমি যে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করার জন্য কৌতুক সহকারে উত্তর করিলাম, ‘আমি তোমার গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলী না হইতেও পারি; কিন্তু আমি যে তাহা হইতে একজন উন্নত ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমিইত বলিয়াছ, বেদ স্মৃতি পুরাণ শাস্ত্র ভিন্ন অন্য মতাবলম্বীদিগের মধ্যে যে যোগ থাকিতে পারে না, যোগ কেন ধর্ম্মও থাকিতে পারে না। একথা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি, এ সম্বন্ধে তোমার গুরু আমা অপেক্ষা কাঁচা ছিলেন স্বীকার করিতেই হইবে। আমার উত্তর শুনিয়া গুরুদেব হাসিয়া ফেলিলেন, আর কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

তাহার পরে আবার পূর্ব্বের মত গল্প কৌতুক চলিতে লাগিল। একদা গুরুদেব আমার প্রতি কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “তোর গুরুর মুখে মুতি।” আমি দেখিলাম যদি সহসা বলিয়া ফেলি যে “আমিও তোমার গুরুর মুখে মুতি,” উনি যেরূপ গুরুভক্ত ও গুরুগত প্রাণ, তাহাতে যদি গুরুই একথা বলিতেছেন এভাব স্মরণ করিতে অবকাশ না পাইয়া হঠাৎ কোন শাপ দিয়া বসেন তবে ত বিলক্ষণ ভুগিতে হইবে। সেজন্য মোলায়েম করিয়া বলিলাম, আমার গুরুর মুখ ত তোমার সঙ্গেই আছে, তুমি যখন ইচ্ছা তখনই প্রস্রাব করিতে পার; ‘কিন্তু নিজের মুখে নিজের প্রস্রাব করাত সহজ কর্ম্ম নহে। আমি তোমার শিষ্য হইয়াছি আমাকে যদি নিজের মুখে প্রস্রাব করিবার বিদ্যাটা শিখাইয়া দেও তবে দেখিব তোমার গুরুর মুখটা কতদূর থাকে। অর্থাৎ আমিও আমার মুখে প্রস্রাব করিব, তবেই তোমার গুরুর মুখে প্রস্রাব করা হইবে।’ গুরুদেব কথায়

উপযুক্ত উত্তর পাইয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। উভয়ে খুব হাসাহাসি চলিল। প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে সেই সুখ-স্মৃতি উদিত হইতেছে। পাঠক ইহার ভাগ পাইবেন কি? জানিনা।

লোকনাথের দেহত্যাগ

বাঙ্গালা ১২৯৬ সালের শেষভাগে আমি দেশভ্রমনান্তে বারদীতে গুরুদেবের আশ্রমে প্রত্যাগত হই; আসিয়া দেখি আশ্রমের সবই পরিবর্তিত হইয়াছে; সকলই নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। আশ্রমের জীর্ণ সংস্কার করা হইয়াছে। অনাথা স্ত্রীলোকদিগের ৫০।৬০৲ টাকা মূল্যের হিসাবে এক এক জনের স্বর্ণালঙ্কার হইয়াছে। আমি অনুসন্ধানে বুঝিলাম, লোকনাথ শীঘ্রই শরীর ছাড়িয়া যাইতে সংকল্প করিয়াছেন; তাঁহার অভাবে আশ্রমটা সহসা নষ্ট হইয়া যায়, কি অনাথেরা নিতান্তই পথের ভিখারী হইয়া পড়ে, এটা তাঁহার ভাল লাগে নাই, তাহাতেই ঐ সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

লোকনাথ যে এত দীর্ঘকাল কি করিয়া বাঁচিয়াছিলেন, সেই বিজ্ঞান বর্তমান সময়ে প্রকাশ নাই, আমাকে তাহার উপায়টী তিনি বলিয়াছেন। তিনি বলিতেন, "আমি মৃত্যুর সময় অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছি। এ অবস্থায় মোহ (নিদ্রা) আসিলেই আমার পিণ্ডপাত ঘটিবে।" তাঁহার নিদ্রা ছিলনা, অথচ রাত্রিতে অতি অল্প সময় বিছানায় যাইয়া পড়িয়া থাকিয়া একটু জাগ্রদ্বিশ্রাম করিতেন।

তিনি শরীর ছাড়ার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া ১২৯৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে আমার নিকট বলিলেন, "আমি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করার জন্য দুই তিন বার উঠিলাম, প্রত্যেক বার অকৃতকার্য্য হইয়া, নামিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম।

যাহাহউক, আমরা দেখিয়াছি তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বলিয়া উঠিতেন—"আমি ঘর হইতে বাহির হইতে জানি, কিন্তু আমি এঘর হইতে কোন্ ঘরে যাইব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।" ইহার অর্থ এই যে, আমি দেহ হইতে বহির্গত হইতে জানি, এখন এই পুরাতন দেহ ছাড়িয়া দেওয়ার সময় হইয়াছে, ইহা ছাড়িয়া কোন্ পিতা মাতা হইতে কেমন নূতন দেহ লইতে হইবে তাহার সিদ্ধান্ত হইতেছে না। কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহার মুখে এই কথা শুনা গিয়াছিল। এতচ্ছ্রবণে তদীয় ভক্তেরা পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল যে আপনি কোন্ বাড়ীতে জন্মিবেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিন্। তিনি এই সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর দেন নাই। না দেওয়ার কারণ আমি এই বুঝি, দেহ ছাড়িয়া তাঁহার কোথায় যাইতে হইবে এটী তখনও স্থির করিতে পারিয়াছিলেন না।

বারদীর একটী জমিদার কফরোগে মরিতে চলিয়াছিল, এমন সময়ে তাহার আত্মীয়েরা ঐ রোগ ব্রহ্মচারীকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে। ব্রহ্মচারী মৃত্যুজনক রোগ বলিয়া উহা লইতে চান না। শেষে বিশেষ সাধ্যসাধনাতে রোগটা তুলিয়া লইলেন। রোগী কফরোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল, কিন্তু বাঁচিল না। ২।১ মাস মধ্যে অন্য রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। এদিকে সেই মৃত্যুজনক কফরোগ ব্রহ্মচারীর শরীরে মরণ পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে লাগিল। লোকনাথের দেহত্যাগের ২।১ মাস পূর্ব্বে ঐ কফরোগ অতিশয় প্রবল হইয়া তাঁহার জীবনসংশয় করিয়াছিল। সাধারণ লোকে এই অবস্থাতে বাঁচিতে পারে না; ইনি যোগী বলিয়া সেই অবস্থা কাটিয়া উঠিয়াছিলেন। তখন তিনি কষ্টের সহিত উঠিয়া হাটিতেন, শরীর অতিশয় দুর্ব্বল ছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, "প্রাচীন কর্ত্তারা ত্রিতাপের মধ্যে মৃত্যু যাতনাটা গণনা করিলেন না কেন বুঝা যায় না। বাক্যবাণ—তীব্রকটূক্তি ও মরণযন্ত্রণা এই দুইটাকে পৃথক্ দুই তাপ ধরিয়া, ত্রিতাপ স্থলে পঞ্চতাপ বলিলে ভাল হইত।"

লোকনাথ এখন নিজের ইচ্ছার বলে দেহ ধারণ করিতেছেন। সেই দেহ দিন দিন শিথিল হইতেছে দেখিয়া, তিনি শীঘ্র শীঘ্র পিণ্ডপাতের দিন ধার্য্য করিতে ব্যস্ত হইলেন। পূর্ব্বোক্তমত কথাবার্ত্তা হওয়ার পরে, জ্যৈষ্ঠের প্রথম ভাগে আমি আশ্রম হইতে স্বস্থানে ফিরিয়া যাই। তাহার ২।১ মাস পরে বারদীতে প্রত্যাগত হইয়া বাবার নিত্যসেবক জানকীনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট শুনিলাম অবশেষে ১২৯৭ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ দেহত্যাগের দিন ধার্য্য হইয়াছিল।

আমি বারদী হইতে প্রস্থান করিলে পর ঐ দিন স্থির করিয়া জানকী প্রভৃতির নিকট বলিয়াছিলেন, "যদি আমার পিণ্ডপাত সময়ে পরিষ্কার দিন থাকে, রৌদ্র হয়, তবে জানিবে আমি সূর্য্য ভেদ করিয়া প্রস্থান করিতে পারিলাম।"

ইহার ভাব এই যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা মর্ত্ত্যদেহ ছাড়িয়া উত্তর-মার্গ বা দেবযান আশ্রয়ে সূর্য্য ভেদ পূর্ব্ব ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রে ঐ পথের বিস্তর বর্ণণা রহিয়াছে। তন্মধ্যে গীতাতে পাওয়া যায়, "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্ম-বিদোজনাঃ ॥ ২৪ ॥ ৮ম অঃ। অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌জনেরা অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিব্য, শুক্ল পক্ষ, ও উত্তরায়ণের ছয় মাস এই পাঁচ পদার্থকে আশ্রয় করিয়া মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

ভীষ্ম কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শরশয্যাগত হইয়াও ঐ উত্তরায়ণের অপেক্ষায় মাঘ মাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস ও সেই উত্তরায়ণ। গুরুদেব উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ ও দিবাভাগ এই তিনটি একত্র করিয়া দেহ ছাড়িবার দিন ধার্য্য করিয়াছিলেন। অবশেষে অগ্নি ও জ্যোতির জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে তিনি অন্তর্দ্দৃষ্টির প্রভাবে দেহমধ্যেই অগ্নি আশ্রয় করিতে পারিবেন; বাহিরে জ্যোতিঃ (রৌদ্র) পাইবেন কিনা সন্দেহ করিয়া ওরূপ বলিয়াছিলেন। পরে

বলা হইবে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ দেহত্যাগ করার সময়ে বাহিরে সেই রৌদ্রও পাইয়াছিলেন। এসকল চিন্তা করিয়া আমি মনে করি গুরুদেব দেবযানাশ্রয়ে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

তাঁহার পরিত্যক্ত শরীরটাকে লইয়া কি করা হইবে, একথা জিজ্ঞাসা করাতে মুক্তপুরুষোচিত উপেক্ষা সহকারে ব্রহ্মচারিবাবা বলিলেন, "দেহটাকে মাঠে ফেলিয়া দিতে পার, তাহাতে শকুন গৃধিনী, শৃগাল, কুকুরের আহার চলিতে পারিবে; জলে ভাসাইয়া দিলে মৎস্য কচ্ছপাদিতে খাইয়া তৃপ্ত হইবে; নাহয় মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখিও, পিপীলিকাদি কীটদিগের প্রচুর ভোজন চলিবে। দেহ-খণ্ড লইয়া শৃগাল কুকুরদিগকে টানাটানি করিতে দেখিলে তোমাদের অনেকের দারুণ দুঃখ হইবে। অতএব অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিও।"

অতঃপর ঐ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ যেরূপ হইল শ্রবণ কর। প্রাতে উঠিয়া গুরুদেব আদেশ করিলেন, "অদ্য আশ্রমবাসিদের ভোজন ব্যাপার বেলা ৯টার মধ্যে শেষ করিতে হইবে।" দিবা ১০টার সময়ে তদন্ত করিয়া দেখিলেন আশ্রমের সকলেরই আহার সমাধা হইয়াছে। তখন বহির্ব্যাপারের চিন্তা ছাড়িয়া দিলেন। দিন বেশ পরিষ্কার ছিল। দিনমণি উজ্জ্বল করজাল বিতরণ করিতেছিলেন। বাবা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আসনে স্থির হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। পৃষ্ঠদেশে ঠেশ দেওয়ার জন্য একখানা তক্তায় বস্ত্রাদি সংযোজিত ছিল। লোকনাথ ধ্যানাবলম্বনে দেহ হইতে আলগ্ রহিলেন। দেহটা কাণ্ডারিবিহীন জীর্ণ-তরণীর-ন্যায় সংসারতরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। আসনের ভাব দেখিয়া সেবকেরা বুঝিল এই দেহের পক্ষে ইহাই শেষ আসন। সকলেই উৎকণ্ঠার সহিত চক্ষুর দিকে চাহিতেছে; যোগী লোকনাথের চক্ষু সর্ব্বদা নির্নিমেষ থাকিত। অন্য মুমূর্ষুদিগের চক্ষু পলকহীন ও বিস্ফারিত দেখিলে মৃত অনুমান করা গিয়া

থাকে ; লোকনাথের চক্ষুর স্বভাবই এরূপ ছিল যে তাঁহার চক্ষে কেহ কোনও দিন পলক দেখে নাই। অন্যান্য দিনের ন্যায় অদ্যও ধ্যানাবলম্বনে রহিয়াছেন স্বভাবতঃ এমনই বুঝা যায়। (পাছে ধ্যান ভঙ্গ করা হয় এই আশঙ্কাতে) কেহই গায়ে হাত দিতে সাহস পাইতেছে না। কেহ বলিল দেহ ছাড়িয়া গিয়াছেন, কেহ বলিল নয়, কেহবা দেহের বিশেষ ব্যত্যয় লক্ষ্য করিতে লাগিল। পরিশেষে বেলা সাড়ে এগারটায় পরে সকলে পরামর্শ করিয়া দেহস্পর্শ করিতে কৃতসংকল্প হইল এবং স্পর্শ করিয়া ১১টা ৫৫মিনিটের সময়ে বুঝিল তিনি কিছু পূর্ব্বেই চির দিনের জন্য দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর মহাসমারোহের সহিত ঘৃত ও চন্দন কাষ্ঠ সহকারে চিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া সেই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের পরিত্যক্ত দেহের দাহক্রিয়া সমাধা করা হইল।

লোকনাথ দেহত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন স্থির করার পূর্ব্বে পুনরায় মর্ত্ত্য-দেহ ধারণ করিতে হইবে কিনা ভাবিয়া যে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে তাঁহার কোন কোন ভক্ত পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন ইহাই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের ওরূপ মনে করা যে সঙ্গত হয় নাই তাহা এখানকার আলোচনাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে।

অন্যেরা মনে করেন ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনাই থাকেনা। তাঁহারা ব্রহ্মচারীর গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলীর পুনর্জন্ম শ্রবণে ঘোর আপত্তি তুলিয়াছেন। তাহার একটী উদাহরণ দিতেছি।

প্রথম সংস্করণ সিদ্ধজীবনীর কোন পাঠক ভাগলপুর জেলাস্থ বলবড্ডা হইতে ১৩১৫ সনের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে প্রকাশককে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার একাংশ এই—"আপনার প্রকাশিত সিদ্ধজীবনী" বই পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। বহিখানা অতিউত্তম হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্রের যেমন কলঙ্ক আছে

ঐ বহিতে তেমন একটী মহাদোষ আছে, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। দোষটী এই—

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলী সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া পুণ্যবান্ (তিনি) অবিমুক্ত বারাণসী ক্ষেত্রে মণিকর্ণিকায় যোগাসনে স্বজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করিয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না কেন? উপনিষৎ কাশীখণ্ড প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি কি প্রকৃতই আরব্য উপন্যাস? ভগবান্ গাঙ্গুলীর মুক্তিলাভত হইলই না; শিবলোক প্রাপ্তিও হইলনা, কিছুকাল স্বর্গবাস ও ঘটিলনা। **"মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জন্ম।"**

এখানে ইহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে :—

১। ব্রহ্মজ্ঞদিগের মরণ মাত্র যে মুক্তি হয় না, বরং অনেক ব্রহ্মবিদের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় একথা এই পুস্তকে লেখা রহিয়াছে, সেখানে পঠিতব্য।

২। কাশীতে মরণমাত্র মুক্তি হইবে এমন কথা উপনিষদে নাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদের জাবালোপনিষদে এইমাত্র পাওয়া যায় যে "অত্র হি জন্তোঃ প্রানেষুৎক্রমমানেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে। যেনাসাবমৃতি-ভূত্বা মোক্ষীভবতী॥" অর্থাৎ অবিমুক্ত বারাণসীতে জন্তুদিগের প্রাণ বাহির হওয়ার সময়ে ভগবান রুদ্র এমন ভাবে তারকব্রহ্ম মন্ত্র বুঝাইয়া দিয়া থাকেন যে তদ্দারা ঐ জীবের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইয়া যায় সুতরাং সে অমর হইয়া মোক্ষ লাভের যোগ্য হয়।

এই শ্রুতিদ্বারা বারাণসীতে মরিলে জ্ঞান হয় মাত্র জানা যাইতেছে। জ্ঞান হইলে মুক্তি অবধারিত এজন্য বারাণসীতে মরিলে জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হয়, এই কথাটী সংক্ষেপ করিয়া মনুষ্যেরা 'কাশীতে মরিলে মুক্তি হয়' বলে। কাশী-মৃত্যুতে জ্ঞান লাভ করিলেও (যথাস্থানে দ্রষ্টব্য) পুনর্জন্ম হইতে পারে।
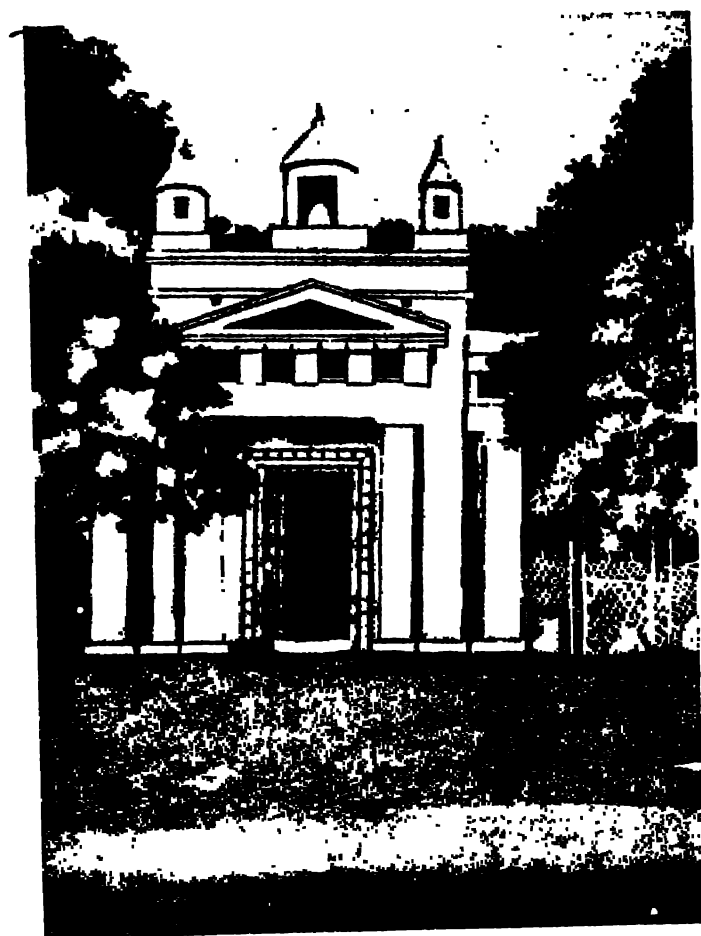
বারদী আশ্রমে শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী
বাবার সমাধি মন্দির

৩। ভগবান্ গাঙ্গুলির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জন্ম হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর ২০।২৫ বৎসর পরে তারাকান্ত গাঙ্গুলির জন্ম হইয়াছে। এই কথা এই বহির যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। ঐ ২০।২৫ বৎসর শিবলোকে বা স্বর্গে বাস করিয়া আসিয়াছেন মনে করিতে বাধা নাই।

ব্রহ্মচারিবাবা জ্ঞান লাভ করিয়াও পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। পুনঃ পুনঃ গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ অতিক্রম করার অভিপ্রায়ে অন্তর্দৃষ্টিরদ্বারা যোগ নাড়ী আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য সূর্য্য ভেদ করিতে চাহিয়াছিলেন। তখন না পারিয়া থাকিলেও দেহত্যাগের সময়ে সূর্য্য ভেদ করিতে পারিয়াছেন মনে করিতে পারি। আমাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে "ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া মরিলে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।" এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক কথা পাওয়া যায়। যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করিয়াও সাধন বলে মৃত্যুকালে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া যায় বা অগ্নি-জ্যোতিঃ প্রভৃতি দেবযান আশ্রয় করিয়া দেহ ত্যাগ করে, তাহারা সূর্য্য পর্য্যন্ত যাইতে পারে, কিন্তু সূর্য্য ভেদ করিতে না পারিয়া স্বর্গ লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্রহ্মবিদ্‌গণ ঐ ভাবে সূর্য্যে পঁহুছিয়া সূর্য্যভেদ পূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মবিৎদিগের মরণান্তে দেবযান পথাশ্রয়ে সূর্য্য পর্য্যন্ত গমন বর্ণনার পরে কথিত আছে—

"প্রপদনং বিদুষাং নিরোধোঽবিদুষাম।" অর্থাৎ এই সূর্য্য বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিৎ) দিগের পক্ষে মুক্তদ্বার ও অবিদ্বান্‌দিগের জন্য রুদ্ধদ্বার হইয়া থাকেন। আমি গুরুদেবকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া জানি সুতরাং দেহপাতের পরে সূর্য্য তাঁহার পক্ষে মুক্তদ্বার হইয়াছিলেন মনে করি।

এখানে লোকনাথের দেহত্যাগ বর্ণনা করিতে সূর্য্য, রৌদ্র ও মেঘাচ্ছন্ন অপরিষ্কৃত দিবার কথা কয়েকবার বলিতে হইল। দেহে থাকা অবস্থায়ও যে এই সূর্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল,

এমন ভাব এই পুস্তকে আরও কয়েকবার উল্লেখ করা গিয়াছে। তন্মধ্যে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে যে কয়েকজন ভদ্রলোক বারদী হইতে হাটিয়া ঢাকাতে রওনা হওয়ার সময়ে সূর্য্যোত্তাপে বড় শঙ্কিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী বাবা দয়া করিয়া বারদী হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত সমস্ত পথে তাহাদের জন্য রৌদ্র বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা ঢাকার দয়াগঞ্জে পঁহুছিলেই সেই সূর্য্য কিরণ পুনঃ খরতর হইয়া উঠিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অদ্য সেই দয়াগঞ্জে, সেই লোকনাথব্রহ্মচারীর "শক্তি আশ্রমে" বসিয়া সেই সব কথার পুনরালোচনা করিতে হইল।

সূর্য্যদেব সেদিন দয়াগঞ্জে পুনঃ প্রকটিত হইয়া এই দয়াগঞ্জে এই লোকনাথাশ্রমে ভাবী সূচনা কি দেখাইয়া ছিলেন ?

উপরি লিখিত মতে সূর্য্যের সহিত ব্রহ্মচারিবাবার সম্বন্ধ থাকার বৃত্তান্তটী আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া বলা যাইতেছে। যোগি-যাজ্ঞবল্ক বলেন, বাহিরের আকাশে যাহা আদিত্যরূপে বিরাজিত দেখা যায়, যোগীদের হৃদয়েও তাঁহাকে সেইরূপে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাক্রিয়াতে "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" বলিয়া সেই সূর্য্যকে অন্তরে উপস্থান করিয়া থাকেন। গুরুদেব যখন আত্মজ্ঞ ছিলেন, তখন আপনাতে ও সূর্য্যেতে অভেদ ভাব স্থাপন করিয়া ছিলেন মনে করিতে হয়।

দয়াগঞ্জে "ব্রহ্মচারিবাবার আশ্রমে" অভাবনীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া সেদিনকার দয়াগঞ্জে সূর্য্যপ্রকট হওয়া এবং এই দয়াগঞ্জে শক্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বের মত ইহা বরাবর ভক্তগণের আশ্রয় স্থান হওয়া, এই উভয়কে অনেকে ব্রহ্মচারিবাবার একই দৈবশক্তির প্রেরণা মনে করেন।

সে যাহাহউক, ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষেরা মুক্তসংকল্প ; গুরুদেব ও আপন মুক্ত-সংকল্পত্ব স্বীকার করিতেন। তথাপি বলিয়াছেন, "হায়রে আমার জাত ভায়ারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইতে

চলিয়াছে। তাহারা স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক, এই সংকল্প আমাতে স্বতঃই পুনঃ পুনঃ উদিত হয়। "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ" হওয়াতে তাঁহার সেই সাধুসংকল্প পূর্ণ হইবে বলা যায়। কার্য্যতঃ ও সেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দিকে লোকের মতি গতি ফিরিতে দেখিতেছি।

উপসংহার

এই পুস্তকে বর্ণিত ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রাহ্মণদিগকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই ইচ্ছার বলে উপসংহারে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কিছু আলোচনা করিতেছি।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও তাহার ব্যবস্থা

এখনকার লোকের কল্পিত কুম্ভকারের ন্যায় নিমিত্তকারণ ঈশ্বর বেদবিরুদ্ধ: আর মৃত্তিকার ন্যায় উপাদানকারণ ঈশ্বর, বেদসঙ্গত, এই দুই কথা প্রতিপন্ন করিতে আমাদের এত মাথা বেদনা কিসের জন্য? উহাতে আমাদের ইষ্টাপত্তির হেতু কি? এখানে তাহা বুঝিতে যত্ন করিব। কুম্ভকার ঘট, কলসী সৃষ্টি করিয়াছে এবং কুম্ভকার ও মৃদ্‌ভাণ্ড পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ; তেমন নিমিত্তকারণ ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা হইলে আমরাও ঈশ্বর সম্যক্ ভিন্ন বস্তু হই। মৃদ্‌ভাণ্ডের যেমন কুম্ভকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই আমাদেরও তেমন ঈশ্বর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, আমরা অনন্তকাল ঈশ্বরের অধীন না থাকিয়া পারি না। পরাধীনতা কোন অবস্থাতেই মুক্তি হইতে পারেনা, নিমিত্তকারণ ঈশ্বরের প্রভুত্ব থাকিতে জীবের মুক্তি কোথায়? এ জন্য যাহারা কেবল নিমিত্তকারণ স্বরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করে

তাহাদের মধ্যে মুক্তির কথা নাই ও থাকিতে পারে না। মৃত্তিকার ন্যায় উপাদান কারণ ঈশ্বর স্বীকার করিলে, ঘট যেমন মৃণ্ময়, আমরা তেমন ঈশ্বরময়; সুতরাং আমাদের ঈশ্বর হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিনা বলিয়া আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জীব বুঝিয়া সংসারে বদ্ধ হইয়াছি। সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করার জন্য সেই উপাদান ঈশ্বরের খোসামোদ করিতে হইবে না; ঈশ্বরেরও আমার স্বরূপ তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই হইল। আত্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীরা তাহা বুঝিয়া মুক্ত হন। তাঁহারা অজ্ঞের ন্যায় খোসামোদ নামক উপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করেন না।

আমাদের লক্ষ্য হইল মুক্তি; ঐ জ্ঞান তাহার উপায়। অতএব জ্ঞান লাভের যোগ্য হওয়া আমরা চাই। শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মদ্বারা জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করা যায়। এজন্য চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রম আমাদের আশ্রম এবং তাহাই আমাদের ধর্ম্ম। অন্যেরা মুক্তি চাহে না, তাহাদের মধ্যে বর্ণাশ্রম বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মও নাই। জন্মান্তরীয় বিভিন্ন প্রকার সংস্কার আমাদের মূল। আমরা সেই সংস্কারের অনুরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতএব ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সংস্কারের শোধন (চিত্তশুদ্ধি) করা আবশ্যক। তাহার জন্যই চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা। ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কথিত হইল, "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।" আপন আপন কর্ম্মে রত থাকিলে মনুষ্য সংসিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানযোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য এই "সংসিদ্ধি" কথাতে জ্ঞানলাভের উপযুক্ত হওয়া বুঝাইয়াছেন।

এইত হইল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের জাত্যুচিত কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তির উপযুক্ত হওয়ার কথা। এখন চতুরাশ্রমের

কথা হউক। ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি, এই চারিটী আশ্রম। ইহাও জ্ঞানলাভের জন্য।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম করিয়া তাহাতে যদি জ্ঞানলাভে কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে তাঁহার আর গৃহস্থাশ্রম করিতে হয় না। তাঁহার নাম হয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারিবাবা এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। যাহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে জ্ঞানলাভ করিতে না পারেন, তাঁহারা জ্ঞানের জন্য গৃহস্থাশ্রমে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে বলা হয় উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী। আমিও আমার ন্যায় অন্যান্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ ঐ উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী ছিলেন। এইরূপ যে সকল গৃহস্থ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন তাঁহারা উদাসীন ও যাহারা জ্ঞানলাভে কৃতকার্য্য নহেন, তাঁহারা সাধক বলিয়া গণ্য। হিন্দু গৃহস্থগণ সকলেই সাধক; তাঁহারা বেদ-স্মৃতির শাসন মানিয়া চলিলেই হিন্দুর ধর্ম্মাচরণ হইয়া থাকে; বিধিমত উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিলেই তাঁহাদের ধর্ম্ম সাধন করা হয়। জনক প্রভৃতি গৃহস্থাশ্রমে জ্ঞানলাভ করাতে তাঁহারা সাধক সংজ্ঞা ছাড়াইয়া উদাসীন সংজ্ঞার অন্তর্গত হইয়াছেন। উদাসীনগণ জ্ঞানী, তাঁহাদের আশ্রমান্তরে যাইতে হয় না; সাধক গৃহস্থেরা জ্ঞানের জন্য বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন। ঐ আশ্রমে যাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হন, তাঁহারা সন্ন্যাসিক ও অপরেরা তাপস বলিয়া কথিত হন। সেই তাপসদিগকে জ্ঞানলাভার্থ চতুর্থাশ্রমে (যত্যাশ্রমে) প্রবেশ করিতে হয়। যতিদিগের মধ্যেও যোগী ও এই সন্ন্যাসী দুই ভাগ রহিয়াছে। (এই সকল বৃত্তান্ত কূর্ম্ম পুরাণের আরম্ভে বিবৃত রহিয়াছে সেখানে দ্রষ্টব্য।) আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মুক্তি আমাদের লক্ষ্য, সেই মুক্তির উপায় জ্ঞান। এখন দেখাইলাম সেই জ্ঞানের জন্য চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা।

কলিযুগের প্রভাবে সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লোপ পাইতে থাকে। বিজ্ঞগণ বলেন, কলির বর্ত্তমান অবস্থাতে চতুর্বর্ণ সঙ্কীর্ণ হইয়া এখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণে পরিণত হইয়াছে, আর চতুরাশ্রম সংক্ষিপ্ত

হইয়া গৃহস্থ ও যতি এই দুই আশ্রমে দাঁড়াইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ পাঠে জানা যায়, মহানন্দিসুত নন্দরাজা দ্বিতীয় পরশুরাম হইয়া পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছেন। এখন আর সূর্য্যচন্দ্র বংশের ক্ষত্রিয় নাই। এইরূপ বৈশ্য বর্ণেরও অভাব কথিত হয়।

তাহার পরে আশ্রমের কথা। শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর পরে কেহ যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়াছেন এমন জানা যায় না। না জানার কারণও আছে; এখন উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন একই দিনে হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মচারীরা সেই একদিনে জ্ঞান লাভ করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হওয়ার সুযোগ পায় না; সকলেই উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীরূপে পৈতার দিনেই গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

এখনকার ব্রাহ্মণ বালকদিগের শিক্ষাবিভ্রাট জনিত উৎশৃঙ্খলতা দর্শনে অনেক সদাশয় ব্যক্তি তাহাদের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা ব্রহ্মচারী পাইবেন কোথায়? ব্রাহ্মণ-কুমার যে উপনয়নের দিনেই গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করে। ব্রহ্মচারীদিগের উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন এখন একই দিনে হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারিবাবার ন্যায় জন্মান্তরীয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের সংস্কার কোন ব্রাহ্মণ কুমারে রহিয়াছে বুঝিতে পারিলে তাহাকে ব্রহ্মচারিবাবার ন্যায় নৈষ্ঠীক ব্রহ্মচারী করা উচিত। তাহাকে গৃহে সমাবর্ত্তন করিতে দেওয়া উচিত নহে; কারণ সমাবর্ত্তন হওয়ার পরে পুনরায় সে আর ব্রহ্মচারী হইতে পারে না। এখন যে সকল ব্রাহ্মণসন্তান সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহারা সকলেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহী হইয়াছিল, তাহারা পুনরায় ব্রহ্মচারী হইতে পারেনা। এজন্য এখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই বলা যায়।

অতঃপর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম শাস্ত্রমতে গঠন করিতে হইলে, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন একদিনে করার যে প্রথা রহিয়াছে তাহা একটুক পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। উপনয়নের ৯ নয় বৎসর পরে সমাবর্ত্তনের

প্রথা প্রবর্ত্তন করা চাই। এই ৯ নয় বৎসরকাল ব্রহ্মচারীকে গুরুকুলের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে রাখিতে হইবে। তবে ত শাস্ত্রসম্মত হইবে। চির প্রচলিত উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন একদিনে হওয়ার নিয়ম কিন্তু শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নয়। ইহা যে সহজে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে, এমন মনে হয় না। এজন্য এখনকার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার নাম বরং ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষাশ্রম রাখা যাইতে পারে। এই "ব্রহ্মচর্য্যাশিক্ষাশ্রমের" সহিত নব্য বেদ-বিদ্যালয়গুলি একত্র করিলে ভাল হয়।

এখনকার বেদ-বিদ্যালয়গুলি যে ভাবে গঠিত তাহাতে তাহার নাম বেদ-বিদ্যালয় রাখিলে বেদের অবমাননা করা হয়। মনুসংহিতাতে পাওয়া যায় 'শ্রুতিঃ বেদোবিজ্ঞেয়ঃ" শ্রুতিই কিন্তু বেদ, লিপি বেদ নহে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে দেখা যায়, যাহারা বেদ লেখে তাহারা নরকগামী হয়। অতএব লিপি করা বেদ, বেদ নহে, তাহা নারকীর কার্য্য। সেই নরকগামীর লিপি-পুঁথিগুলি কোন ক্রমেই বেদ সংজ্ঞার অন্তর্গত হইতে পারেনা। এখনকার বেদ-বিদ্যালয় তাহাই পড়াইবার জন্য স্থাপিত হইতেছে।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মন্ত্রগুলি এখনকার সাহিত্য পুস্তকের ন্যায় মানে করিয়া পড়ানের কোনই ফল নাই। সাপের মন্ত্র, মাথা ধরার মন্ত্র প্রভৃতি ঝাড়ন মন্ত্র সকলের অনুবাদ বা অন্বয় না করিলে ও যেমন তদ্দারা বিষ নামিয়া থাকে ও মাথাধরা সারিয়া যায়, বেদমন্ত্র সকলও তেমন বিধিমত উচ্চারিত হইলে বিনিয়োগ অনুসারে ফল দিয়া থাকে। এজন্য কর্ম্মকাণ্ডে বেদের ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। প্রাচীনকালে আচার্য্যগুরুও মুখে মুখে শিষ্যকে কেবল বেদ মুখস্থ করাইয়া দিতেন জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মনিরূপণের জন্য বেদের ব্যাখ্যা না করিলে চলেনা। বেদের উপনিষদগুলি জ্ঞানকাণ্ড মধ্যে গণ্য। মোক্ষার্থী সন্ন্যাসীদিগের তাহা আলোচনা করিতে হয়। বেদবিদ্যালয়ে কেবা মোক্ষ জানে, কেবা মোক্ষ বুঝিতে আসে? ফলতঃ স্কুল কলেজের ন্যায় বিদ্যালয়

করিয়া মোক্ষালোচনা হইতে পারে না। কর্ম্মকাণ্ডবেদ ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। তেমন জ্ঞানকাণ্ড বেদের ব্রহ্মনিরূপণ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্রের উপযুক্ত নহে। তাহাতেই বলি, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বেদবিদ্যালয়গুলিকে একত্র করিয়া তথায় বেদকে শ্রুতিরূপে শিক্ষা যতদূর সম্ভব হইতে পারে হউক। এখন বিলুপ্ত-প্রায় বেদ লইয়া অধিক বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে। তাহার পরিবর্ত্তে স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্র পাঠ করাও পুরুষ পরম্পরাগত সদাচারের সহিত ঐক্য করিয়া ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদিগকে শাস্ত্রের পথে পরিচালিত করিতে যত্ন করা হউক। তদ্দ্বারা গৃহস্থাশ্রমের উপকার সাধিত হইবে। শাস্ত্রে চতুরাশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠাশ্রম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে গৃহস্থ হওয়ার যত্ন করিতে হইবে। অজ্ঞলোকেরা গৃহস্থের এই শ্রেষ্ঠতা অবগত নহে। এখানে শাস্ত্রবচন দেখান যাইতেছে।

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্থপ্রভবা শ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ ॥ ৮৭
সর্ব্বেঽপি ক্রমশস্ত্বেতে যথাশাস্ত্রং নিষেবিতাঃ।
যথোক্তকারিণং বিপ্রং নয়ন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৮৮
সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ সত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি ॥" ৮৯

মনুসংহিতার ষষ্ঠাধ্যায়।

অনুবাদ ঃ—

"ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি এই চারিটী পৃথক আশ্রমই গৃহস্থ হইতে উৎপন্ন হয়। এই সকল আশ্রমকে শাস্ত্রানুসারে পরে পরে অনুষ্ঠান করা উচিত। প্রত্যেক বিপ্রেরই যে চারি আশ্রম করিতে হইবে এমন নহে। কেহ তিনটী কেহ দুইটী, কেহ বা একটীমাত্র আশ্রম বিধিমত অনুষ্ঠান করিয়াও পরমগতিরূপ মোক্ষলাভ করিতে পারেন। এই সমস্ত আশ্রমের মধ্যে কেবল গৃহস্থই

শ্রীমদ্ পূর্ণানন্দ স্বামী

(শ্রীশ্রীব্রহ্মচারীবাবার শিষ্য)
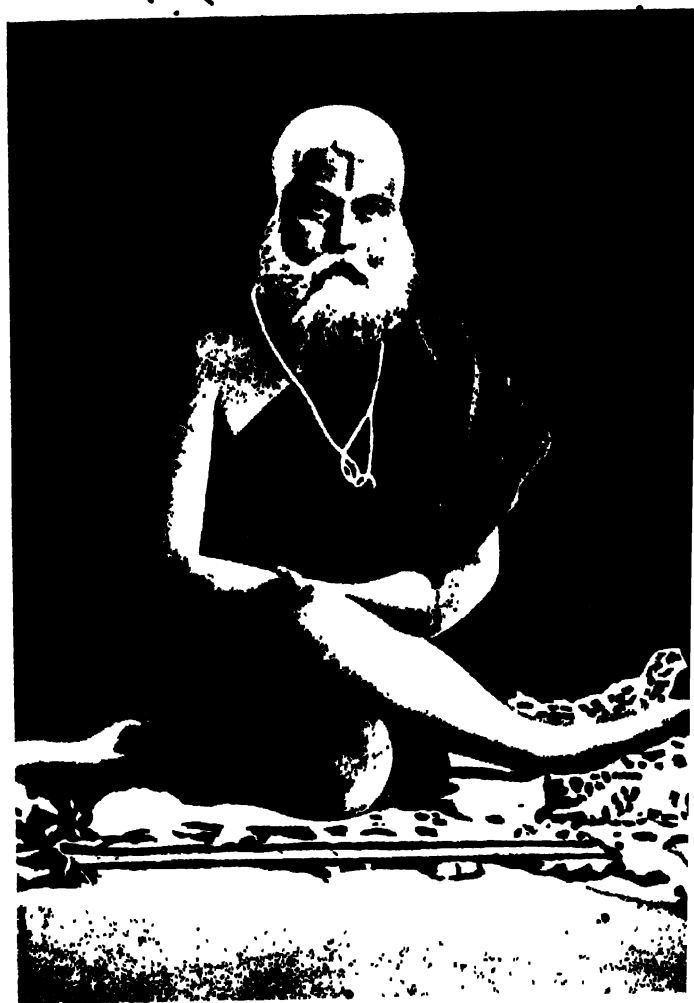
অবশিষ্ট তিনটী আশ্রমকে পোষণ করিতেছে ও ধারণ করিয়া রহিয়াছে; এজন্য বেদ-স্মৃতির বিধানমতে গৃহস্থকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠাশ্রম বলা হয়।" লোকে কিন্তু উল্টা বুঝিতেছে।

ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন দিয়া ব্রহ্মচারী করা যেমন অভিভাবকের কর্ত্তব্য তেমন গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রেরণ করা অভিভাবকের কর্ত্তব্য নহে; উহা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের নিজের কর্ম্ম। একালে কোন ব্রাহ্মণ গৃহস্থাশ্রমে জ্ঞান হইলনা বলিয়া জ্ঞানলাভার্থ যে বিধিমত বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কথা আমার এই বৃদ্ধ বয়সের মধ্যে জানা শুনা নাই। এজন্য বানপ্রস্থাশ্রম বিলুপ্ত হইয়াছে ধরা যাইতে পারে। তাহার পরে যত্যাশ্রম। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের এই আশ্রম নহে। এই দেখিতেছি ব্রাহ্মণেতর বর্ণের লোক সকল, সাধু, সন্ন্যাসী নাম ধারণ করিয়া যতি সাজিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের সংখ্যাই সন্ন্যাসীর দলে অধিকাংশ।

এই সকল মনুষ্য যে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমের নহে, একথা আপনারাই স্বীকার করে অথবা স্বীকার করিতে বাধ্য। এখানে দেখিলাম তাহারা চতুর্থাশ্রমেরও অনধিকারী। অতএব তাহারা ভ্রষ্ট ও পতিত; তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, চতুর্থাশ্রমের যথার্থ ব্রাহ্মণ দুই চারি জন পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।

চারিটী আশ্রমের মধ্যে শূদ্রের জন্য একমাত্র গৃহস্থাশ্রম। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজ-সংজ্ঞার অন্তর্গত হওয়াতে তাহাদের জন্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রম রহিয়াছে। ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ ঐ তিন আশ্রমের যে কোন আশ্রমে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। শূদ্র গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া জ্ঞানী হইতে পারেন। ব্রাহ্মণও ঐ তিন আশ্রমের যে কোন আশ্রমে জ্ঞান লাভ করুন না কেন, জ্ঞানের পরে বিজ্ঞানও ব্রাহ্মণের একটী স্ববর্ণোচিত কর্ম্ম। বিজ্ঞান অর্থাৎ মোক্ষের প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য চতুর্থাশ্রম বিহিত হইয়াছে। এই

আশ্রমের অন্য কোন কর্ত্তব্যতা থাকে না, অন্যের সহায়তা লইতে হয় না, কেবল ভোজনের জন্য লোকালয়ে যাইতে হয়, একাকী বৃক্ষমূলাদিতে থাকারই কথা, তাহাতেই মোক্ষ চিন্তার সুবিধা হইয়া থাকে।

এই সন্ন্যাসাশ্রমের কাঠিন্য যদি লোকে বুঝিতে অথবা কৃত্রিম সন্ন্যাসী সাজিয়া লোক ঠকাইবার বুদ্ধি যদি অন্তরে না থাকিত, কিম্বা ধর্ম্মভয় বলিয়া একটা শাসন যদি এখনকার লোকের থাকিত, তাহা হইলে এত স্বামী সন্ন্যাসীর ছড়াছড়ি আর সমাজে দেখা যাইত না। আমাদের মধ্যে অনেক মনুষ্য আপন গ্রাম্য সমাজে থাকিতে না পারিয়া যেমন তীর্থবাসী হয় ও তীর্থ স্থলে গিয়া স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুবিধা করিয়া নেয়, সেইরূপ আশ্রমভ্রষ্ট নীচাশয়দিগের স্বার্থ সিদ্ধির আশ্রম হইয়াছে কলির সন্ন্যাস।

এখনকার সন্ন্যাস ও শাস্ত্রের সন্ন্যাসের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য এখানে মনুসংহিতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ৪২ শ্লোকটী দেখান যাইতেছে—

"এক এবরন্নিত সিদ্ধার্থমসহায়বান্।
সিদ্ধিমেকস্য সংপশ্যন্ ন জহাতি ন হীয়তে॥"

মোক্ষরূপ ফল যে উপার্জ্জন করে সেই ভোগ করে, অন্যে তাহার ভাগী নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমে এই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ একাকী থাকার অভিলাষী হইতে পারেন।

তাদৃশ ব্রাহ্মণদিকের জন্য এই শ্লোকে বলা হইল, সিদ্ধির জন্য একক বিচরণ করিবে, কাহারও সহায়তার যেন অপেক্ষা করিতে না হয়। একাকী জন্মগ্রহণ ও একাকী মরণ ঘটে, অতএব একক থাকাতে প্রকৃত প্রস্তাবে স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ ত্যাগ করা হয় না ও নিজেকে ক্ষীণ হইতে হয় না।

শ্রুতিতে রহিয়াছে, পুত্রের হিত, বিত্তের হিত ও লোকের হিত এই ত্রিবিধ এষণা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতে হয়।

এখনকার স্বামী সন্ন্যাসীরা ইহার ঠিক বিপরীত কি না? কেহ কি কলির কোন সন্ন্যাসীকে নির্জ্জনে একক থাকিতে দেখিতে পান?

কদাচিৎ কাহাকে তেমন দেখিতে পাইলে, ঐরূপ থাকার অভিসন্ধি বুঝা যায় যে আমার ভাব দেখিয়া আমার নিকট লোক জুটিতে থাকুক। যদি নির্জ্জনতাই তাহার লক্ষ্য হইত তবে লোক জুটিলে তিনি পলায়ন করেন না কেন ?

শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাসাশ্রমে অবারিতদ্বারের মধ্যে দণ্ডীর আশ্রম নামে এক শাখাশ্রম সৃষ্টি করিয়াছেন। দণ্ডীরা আপনাদের আশ্রমকে "বিবিদিষাশ্রম" অর্থাৎ বিদ্যালাভের আশ্রম বলিয়া থাকেন। সেই দণ্ডীদিগের কঠোর নিয়ম অবগত হইলে আসল সন্ন্যাসাশ্রমের অসাধ্যতা বুঝা যাইবে।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি দণ্ডী হইতে পারেনা। সন্ন্যাসীর লোকালয়ে থাকিতে নাই। এই নিয়মের পরিবর্ত্তে দণ্ডীরা কাশীতে থাকেন। শাস্ত্র-দৃষ্টিতে কাশী লোকালয় নহে, উহা মহাশ্মশান। দণ্ডিগণ দিবা ভাগে মাত্র একবার খাইতে পারেন, রাত্রিতে আহার করেন না। তাহাও নিজে অগ্নি স্পর্শ করিয়া ইচ্ছামত পাক করিয়া খাওয়ার নিয়ম নাই। ব্রাহ্মণ-গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্ন ভিক্ষা চাহেন। সেই গৃহী ব্রাহ্মণ, বিধবাদের খাওয়ার যোগ্য পবিত্র অন্ন প্রস্তুত করিয়া দণ্ডীকে আহার দেন। ব্রাহ্মণের গৃহে দণ্ডী ভিক্ষার্থী হইয়া তিনবার "নারায়ণ" শব্দ উচ্চারণ করেন, তাহাতে যদি গৃহস্থ তাঁহাকে ঐরূপ আহার না দেন, তবে অন্য ব্রাহ্মণ-গৃহে যাইতে হয়। এইরূপে তিন গৃহে ভিক্ষা না পাইলে সেই দিন দণ্ডীকে উপবাসী থাকিতে হয়। দণ্ডী সঞ্চয় করিতে বা ধাতু দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহাকে মৃন্ময় জলপাত্র গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের স্বামী সন্ন্যাসীরা দণ্ডী হন না কেন ? একথার উত্তর কে দেয় ?

যে সকল ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র প্রথম তিন আশ্রম ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগকে আশ্রম-ভ্রষ্ট পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগকে পতিত বুঝিতে হয়।

তাহাদের জন্য চতুর্থ আশ্রম নহে, উহা কেবল ব্রাহ্মণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কথা বুঝাইতে শাস্ত্রীয় বচন দেখান আবশ্যক।

মনু সংহিতার ষষ্ঠাধ্যায়ে পরিব্রাট্ (সন্ন্যাসী) হওয়ার বিধান এইরূপ—

বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষোভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ

বানপ্রস্থাশ্রম পর্য্যন্ত আয়ুষ্কালের বার আনা সময় অতিবাহন করিয়া অবশিষ্ট চারি আনা সময়ের জন্য লোকসংসর্গ ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী হইতে হয়। এতদ্দ্বারা স্বামী সাজিয়া মঠে বা লোকজনের মধ্যে থাকিলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না বুঝা গেল। কেবল ব্রাহ্মই যে এই চতুর্থাশ্রমে যাইতে পারেন তাহার প্রমাণ—

"প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ॥" ৩৮

এখানে একমাত্র "ব্রাহ্মণ" শব্দের নির্দ্দেশ থাকাতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের এই আশ্রম নহে। ষষ্ঠাধ্যায় সমাপ্তিতে এই কথাটী বিশদভাবে কথিত আছে।

"এষোবোঽভিহিতোধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য চতুর্ব্বিধঃ।
পুণ্যোঽক্ষয়ফলং প্রেত্য রাজ্ঞাং ধর্ম্মংনিবোধত॥ ৯৭

এই তোমাদের নিকট ব্রাহ্মণের চারি প্রকার আশ্রম ধর্ম্ম ঘলা হইল। এই পবিত্র চতুর্থাশ্রম মরণান্তে অক্ষয় ফল প্রদান করে। অতঃপর রাজা (ক্ষত্রিয়) দিগের ধর্ম্ম শ্রবণ কর। এখানে ক্ষত্রিয়ের কথা পরবর্ত্তী সপ্তমাধ্যায়ে বলিবার প্রতিজ্ঞা করাতে ষষ্ঠাধ্যায়ের এই শেষ বিধান যে কেবল ব্রাহ্মণের জন্য এটী পরিষ্কার বুঝা যায়।

ব্রাহ্মণেতর, বর্ণের সন্ন্যাসাশ্রম না থাকাতে অন্যবর্ণের স্বামী ও সন্ন্যাসীদিগকে ভ্রষ্ট বা পতিত বুঝিতে হয়। ব্রাহ্মণের মধ্যেও সে সকল ব্রাহ্মণ সন্তানোৎপাদনাদি বিহিত ক্রিয়া না করিয়া সন্ন্যাসী

হন তাহাদের অধোগতি (নরক) হওয়ার শ্লোক ঐ ষষ্ঠাধ্যায় হইতে দেখান যাইতেছে।

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥ ৩৫
অনধীত্য দ্বিজোবেদানমুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বাচৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥ ৩৭

ব্রাহ্মণ যাগ করার জন্য দেবতাদের নিকট, বেদ পাঠের জন্য ঋষিদের নিকট ও সন্তানোৎপাদনের জন্য পিতৃলোকের নিকট স্বভাবতঃ ঋণী থাকেন; সেই তিন ঋণ শোধ না করিয়া সন্ন্যাসী হইলে তাহাকে নরকগামী হইতে হয়। যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন ও সন্তানোৎপাদন ও যজ্ঞ ক্রিয়া সম্পাদন করেন নাই, তিনি মোক্ষ ইচ্ছা করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন।

এইরূপে অনধিকারী সুতরাং নরকযাত্রী সন্ন্যাসীর দল দ্বারা এখনকার চতুর্থাশ্রম পূর্ণ রহিয়াছে। সন্ন্যাসগ্রহণের যোগ্য কয়জন ব্রাহ্মণ যে চতুর্থাশ্রমে পাওয়া যাইতে পারে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

প্রাচীনদিগের মধ্যে জড়ভরত, বশিষ্ঠ, ব্যাস, শুক, যাজ্ঞবল্ক্য জনক প্রভৃতিকে ব্রহ্মবিৎ জানা যায়। ইঁহাদের কেহই সন্ন্যাসী নহেন, কেবল যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়ণী নামক দুই পত্নীকে বিত্ত বণ্টন করিয়া দিয়া নিজে পরিব্রাট্ হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন কিনা প্রকাশ নাই। বর্ত্তমান যুগে যে এত অধিক লোককে গৈরিক বসন পরিয়া মুক্তকচ্ছ সন্ন্যাসী হইতে দেখা যায় এসকল কলির লক্ষণ। শাস্ত্রে "নাস্তিকা ব্রহ্মভক্তা বা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।" প্রভৃতি কলিযুগধর্ম্মের বর্ণনাতে এ সকল সন্ন্যাসী-দলের পরিচয় বিশেষভাবে উল্লেখ রহিয়াছে।

অতএব স্থূল হিসাবে চতুর্থাশ্রমও এখন না থাকার মধ্যেই ধরিতে হয়। অতঃপর আমাদের আলোচ্য বিষয় চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এবং চতুরাশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম অবশিষ্ট রহিল। এখানে ইহাদের কর্ত্তব্য ধর্ম্মের আলোচনা করিতে চাই।

দারগ্রহণ ও সন্তানোৎপাদন ইহাদের ধর্ম্মকার্য্য। প্রথমে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাউক, পরে শূদ্রের কথা হইবে। গীতাতে ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে। "শমোদমস্তপঃ শৌচংক্ষান্তিরাজ্জবমেবচ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥" ইহাই ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ও যতি এই চারি আশ্রমের ব্রাহ্মণগণের সাধারণ নিত্যকর্ম্ম। তন্মধ্যে ভগবান্ মনু গৃহস্থ ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণদিগের নিতাই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তাহা এই—"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিভোজনম্॥" অর্থাৎ বেদ নিজে পাঠ করাও অন্যকে পড়ান এবং মন্ত্র জপকরা ব্রহ্মযজ্ঞ। পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধ তর্পণ পিতৃযজ্ঞ। অগ্নিতে দেবোদ্দেশে আহুতি দেওয়ার নাম হোম, তাহা দেবযজ্ঞ। অন্নাদি ও পশ্বাদি বলি দেওয়া ভূতযজ্ঞ। অতিথিকে ভোজন করান মনুষ্যযজ্ঞ। অতিথি কাহাকে বলে? যাহার দ্বিতীয় তিথি থাকা নাই অর্থাৎ যিনি একদিন থাকিয়াই চলিয়া যান এমন ব্রাহ্মণই অতিথি শব্দের বাচ্য। মনু বলিয়াছেন, "একরাত্রন্তু নিবসন্নতিথি ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।" একগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ কিংবা বিত্তোপার্জ্জনার্থ আগত ব্রাহ্মণও অতিথি সংজ্ঞার অন্তর্গত নহে।

আমরা যে যাহাকে তাহাকে ভিক্ষা দেওয়াই ধর্ম্ম মনে করি, মনুসংহিতায় ভাব তেমন নহে। তাহার তৃতীয় অধ্যায়ের ৯৫ শ্লোক এই—ভিক্ষাং চ ভিক্ষবে দদ্যাদ্ বিধিবদ্‌ব্রহ্মচারিণে।" যে

সকল ভিক্ষুক বিধি অনুসারে ব্রহ্মচারী করেন তেমন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দেওয়া উচিত। অন্ধ আতুর প্রভৃতিকে খাদ্য দেওয়া, ভিক্ষা দান বা অতিথি সেবা নহে, তাহা ভূত বলির অন্তর্গত।

শুণাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্।
বায়সানাং কৃমীণাঞ্চ শনকৈর্নির্ব্বিপেদ্ ভুবি ॥ ৯২।৩

কুক্কুরদিগকে, পতিত মনুষ্যকে (ব্যাধ, হাড়ী, ডোম প্রভৃতিকে) কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্তকে এবং কাক কৃমিগণকে ধীরে ধীরে মৃত্তিকাতে অন্ন প্রদান করিবে।

আমাদের সর্ব্বপ্রধান স্মৃতিশাস্ত্র মনুসংহিতা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। দ্বাপরাদি যুগে ইহা বিস্তৃত ভাবে অনুষ্ঠিত হইত, কলির প্রভাবে বর্ত্তমানে যেমন বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের সঙ্কোচ ঘটিয়াছে, এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মেরও তেমন সংক্ষেপ ঘটিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে এখন আমাদের আপৎকাল। এই সময়ে আমাদের আপদ্ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে হইতেছে। তাহাতেই যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ নামক শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট জীবনবৃত্তিদ্বারা এখন আর ব্রাহ্মণের জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারিতেছে না। এজন্য ব্রাহ্মণগণ বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিত্যকর্ত্তব্যকর্ম্মাদিও সংক্ষেপে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধাসহকৃত সন্ধ্যা ও গায়ত্রীজপদ্বারা আমাদের ব্রহ্মযজ্ঞ রক্ষিত হয়। প্রাতঃকালে সূর্য্যের অর্দ্ধেক উদয় হওয়ার পূর্ব্ব দুই দণ্ড মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করাই উত্তম কল্প। দিবার মধ্যভাগে বিস্তৃত সময় রহিয়াছে, সেই সময়ে ভোজনের পূর্ব্বে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিতে হইবে। সূর্য্যের অর্দ্ধাস্ত হওয়া অবধি পরবর্ত্তী দুইদণ্ড কাল সায়ং সন্ধ্যার মুখ্যকাল। আমরা নিয়মিতরূপে এই তিন সন্ধ্যা, করিলেই আমাদের ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়।

নিত্যশ্রাদ্ধ আমাদের হইয়া উঠেনা, তাহার পরিবর্ত্তে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময় পিতৃতর্পণ করিয়া পিতৃযজ্ঞ করিয়া থাকি।

যথাবিহিত অগ্নি রক্ষা করিয়া নিত্য হোম করা আমাদের অনেক কাল যাবৎ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শরীরের মধ্যে যে প্রাণাগ্নি রহিয়াছেন, ভোজনারম্ভের প্রাক্কালে আমরা পঞ্চগ্রাস অন্নদ্বারা সেই প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানাগ্নিতে পঞ্চাহুতি প্রদান করিতেছি। ব্রাহ্মণমাত্রেই ইহা কর্ত্তব্য। ইহাই এখন আমাদের নিত্য হোম ও দৈব-যজ্ঞ।

এখনকার অনেক গৃহস্থের গৃহে কিছু অন্ন লইয়া যে ভোজনের পূর্ব্বে কাক ও শৃগালকে দেওয়া হয় তাহা কাকবলি ও শিবাবলি নামে কথিত হয়। এতদ্ভিন্ন পশ্চিমাঞ্চলে পিপড়ার গর্ত্তের মুখে ছাতু আটা প্রভৃতি বলি দিয়া থাকে। যদিও প্রত্যেক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ তেমন ভাবে বলি দিতেছেন না, তথাপি আমাদের ভুত-বলি লোপ পায় নাই। আমারা ভোজনের সময়ে কিছু অন্ন লইয়া মৃত্তিকাতে পাঁচভাগ করিয়া যে ভূঃপতি ভুবপতি ও স্বঃপতি প্রভৃতিকে উৎসর্গ করিয়া দেই, তদ্দারা আমাদের ভূতবলি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভূতযজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণদিগের অন্ততঃ ঐরূপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অতিথি-ভোজন নামক নৃযজ্ঞ সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে না, পূর্ব্বপুরুষের সদাচার মতে অতিথি সেবার কর্ত্তব্যতা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই মনুষ্যযজ্ঞ পর্য্যন্ত পঞ্চ-মহাযজ্ঞ এখনও চলিতেছে এবং অতঃপরও যাহাতে চলিতে পারে তজ্জন্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মাত্রেই অবহিত থাকা উচিত।

ব্রাহ্মণের এই পঞ্চমহাযজ্ঞের সমস্তই যে জ্ঞান-যোগ্যতা লাভের জন্য নিত্যকর্ত্তব্য হইয়াছে এমন নহে; এগুলির মধ্যে নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত এবং উপাসনাও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই সমস্তের নিত্য-অনুষ্ঠান করিলে আমরা অল্পে অল্পে জ্ঞান লাভের উপযুক্ত চিত্তশুদ্ধি সংঘটন করিতে পারি। তদ্ভিন্ন এতদ্দারা ঐহিক সুখ সুবিধা ও

ঢাকা লোকনাথ আশ্রম (শক্তি ব্রহ্মাশ্রম)

পারত্রিক স্বর্গ লাভেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রকারের কতকগুলি নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনার বিধান রহিয়াছে। সেগুলির কথা বলিবার পূর্ব্বে শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলা যাইতেছে।

মনু বলিয়াছেন—

শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্ম্মোনৈঃশ্রেয়সঃ পরঃ। ৩৩৪।৯ অঃ।

দ্বিজাতির একমাত্র সেবা করাই শূদ্রের জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হওয়ার পক্ষে চিত্তশুদ্ধি-কারক।

বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।

যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্॥ ১২৩।১০ অঃ।

বিপ্র সেবাই শূদ্রের বিশিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; এতদ্ভিন্ন তাহারা যে সকল ধর্ম্মকর্ম্ম করে তাহা শূদ্রের নিষ্ফল হইয়া থাকে।

এই অবস্থামতে শূদ্রদিগের সেবা ভিন্ন অন্য সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মই যে এককালে নিষ্ফল এমনও মনে করিতে হইবে না। এজন্য পরবর্ত্তী শ্লোক দেখাইতেছি।

ধর্ম্মেপসবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতাঃ।

মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তিচ॥ ১২৭।১০ অঃ।

যে সকল শূদ্র ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া ধর্ম্ম লাভ করিতে চাহে ও সৎদিগের পথে চলিয়া থাকে, তাহারা মন্ত্রহীন ভাবে উপরোক্ত পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারে। মন্ত্রের মধ্যে "নমঃ" মন্ত্র মাত্র তাহাদের ব্যবহার্য্য জানা যায়। এইভাবে ব্রাহ্মণদিগের ঐ সকল কর্ম্ম শূদ্রেরা করিলে দোষ হয় না, বরং তদ্দারা প্রশংসাভাজন হইয়া থাকে। শাস্ত্রে শূদ্রদিগের জন্য কেমন সুগম ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে এখন পরের মুখে ঝাল খাইয়া শাস্ত্রকে অতিক্রমকরতঃ উচ্চতর বর্ণে প্রমোশন লাভ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে। ইহারই নাম কলির ধর্ম্ম।

'তদা নন্দ-প্রভৃত্যেষঃ কলির্ব্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।"

পাটলীপুত্রের শূদ্র রাজা নন্দের সময়াবধি কলি বিশেষ প্রকারে

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। অধুনা সেই বৃদ্ধি এত প্রবল হইয়াছে যে তৎপ্রভাবে চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণকে অবশিষ্ট দেখা যায়। চতুরাশ্রমের মধ্যে যে গার্হস্থ ও সন্ন্যাস দুই আশ্রমের অস্তিত্ব জানা যায়, তাহার সন্ন্যাস আশ্রমকে ও আমরা একরূপ ছাড়িয়া দিয়া কেবল গৃহস্থকেই অবশিষ্ট বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্যাদির সময়ে কলির সেই অতিবৃদ্ধিকে বিশেষরূপে খর্ব্ব হইতে দেখি। তাহাতেই অতঃপর ও কলির প্রভাব পুনরায় খর্ব হইবে বলিয়া আশা করিতেছি। তেমন হইলে চতুর্ব্বর্ণের এবং চতুরাশ্রমেরও পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে।

প্রবাদ আছে যে ঐ নন্দরাজাকর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে কোন সময়ে ক্ষত্রিয় প্রাপ্তির জন্য ব্রাহ্মণেরা হোম করিতে ছিলেন, তাহার ফলস্বরূপ হোমের অগ্নিকুণ্ড হইতে চারিজন ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা প্রমার চৌহান, পুরহর ও রাঠোর এই চারি প্রসিদ্ধ কুলের ক্ষত্রিয় বলিয়া রাজপুতানাতে খ্যাত আছেন এবং এই চারি কুলই আপনাদিগকে সেই অগ্নি-কুলজাত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বোম্বাই প্রদেশের বৈশ্যগণকে জৈনমতাবলম্বী দেখা যায়। অনুসন্ধান করিলে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ যথার্থ বৈশ্য এখনও পাওয়া যাইতে পারে। অগ্নিকূলের ক্ষত্রিয়দিগকে ও জৈনাদি মতাবলম্বী ভিন্ন অবশিষ্ট যথার্থ বৈশ্যগণকে একত্র করিয়া এখণকার ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ যদি স্ব স্ব বর্ণের ধর্ম্মানুষ্ঠানে মনোযোগী হন, তাহা হইলে পুনরায় বিশুদ্ধ চতুর্ব্বর্ণ প্রবল হইতে পারে। তদ্দ্বারা লুপ্ত-প্রায় ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও যত্যাশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহা হইলেই চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমাত্মক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ফলতঃ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষিত হইলেই জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। তখন আর

অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতি দৈব-উপদ্রব-সমূহ দেশে আধিপত্য করিতে পারিবে না।

অতঃপর নৈমিত্তিক ও উপাসনা কর্ম্মের ব্যাখ্যা করা যাউক। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, জ্ঞানযোগ্যতা লাভ করার জন্য নিত্যকর্ম্মের ব্যবস্থা, তবে নৈমিত্তিকাদি কিসের জন্য? তদুত্তরে বক্তব্য, ইহ কালের সুখ সুবিধা ও মরণান্তে স্বর্গভোগের জন্য নৈমিত্তিক ও উপাসনার আবশ্যক হয়, এবং নিত্য, নৈমিত্তিক, ও উপাসনা কর্ম্মে বাধা বা ত্রুটী ঘটিলে তাহার সংশোধন করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

পুত্রজননাদি নিমিত্ত উপলক্ষে গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কার-সকলের অনুষ্ঠানকে সাধারণতঃ নৈমিত্তিক কর্ম্ম কহে, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলার্থে যে দেবতাদির উপাসনা করা যায়, তাহার নাম উপাসনা। উপাসনাও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অন্তর্গত। তথাপি তাহার বিশেষ সংজ্ঞা রহিয়াছে।

দেবতা কি ও কেন তাঁহার উপাসনা করিতে হয়, বর্ত্তমান সময়ে একথা বিশেষ করিয়া না বলিলে চলে না।

ঈশ্বর যদি কুম্ভকারের ন্যায় জগদতিরিক্ত নিমিত্তকারণ মাত্র হইতেন, তবে ঈশ্বরকে সর্বপ্রধান উপাস্য করিতে হইত। ঈশ্বর আমাদের উপাদান হওয়াতে আমরা সকলেই ঈশ্বরময়;—অতএব ঈশ্বরের পৃথক্ উপাসনা চলে না। আমি উপাসক ও ঈশ্বরাংশের ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গেলে আমি ভিন্ন অবশিষ্ট ঈশ্বরাংশের উপাসনা করিতে হয়, ষোল আনা ঈশ্বরের উপাসনা কিরূপে হইবে? যদি বল, ঈশ্বরের অবশিষ্টাংশের উপাসনা করা যাউক তাহাও হইতে পারে না। সেই অসীম অনন্ত ঈশ্বরের কতটুকুই বা তুমি জানিতে পার, কতটুকেরই বা উপাসনা করিবে? অবশিষ্টাংশের সমস্ত ভাগ জানিবার যখন তোমার কোনই সম্ভাবনা নাই, তখন অংশবিশেষের উপাসনাকরা ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। এমতাবস্থায়

ঈশ্বরের বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন অংশ দেবতাদিগের উপাসনা করাই সঙ্গত হইতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের হাত দিয়া যেমন রাজশক্তি পরিচালিত হয়, দেবতাদিগেরদ্বারা তেমন ঐশীশক্তি পরিচালিত হইতেছে। দেবতারা ও জীব বিশেষ; তাঁহারা বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাদের ন্যায় দেবতাদিগের হস্তপদ-মস্তকাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে। তাঁহাদের পিতা, মাতা ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্যাদি পরিজন রহিয়াছে। দেবতাদের অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি আয়ত্ত থাকাতে তাঁহারা অদৃশ্য থাকিয়াও আমাদের সহিত স্বপদোচিত কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে দেবতারা আমাদের নিকট মুর্ত্তিমান হইয়াও দেখা দিতে পারেন। আমিও এবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি। এই বহির যথাস্থান পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

এতভিন্ন প্রধান প্রধান দেবতাগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। এজন্যও দেবতার উপাসনা করিতে হয়। কোন্ দেবতা কোন্ কোন্ শক্তি পরিচালন করেন, কে কিসে তুষ্ট হন, এবং কুকুর যেমন তু শব্দ (স্বর বিশেষ) উচ্চারিত হইলে আকৃষ্ট হয়, তেমন কোন্ দেবতা কোন্ মন্ত্রদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, এ সকল বেদাদি শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। শাস্ত্র হইতে সেই উপাসনা বিধি জানিয়া বিশেষ-বিশেষ দেবতারাধনা করিতে হয়। দেবার্চ্চনারম্ভ করিতে হইলে আবার সর্ব্বাগ্রে বিশেষ কতিপয় দেবতার পূজা করিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে দেবোপাসনাতে ফল পাওয়া যায়, নতুবা নিস্ফল।

বিদেশী রাজার রাজত্বকাল হইতে হিন্দুগণ শাস্ত্রপ্রবণতার পরিবর্ত্তে ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছেন। সেই জন্য বিধিমত ক্রিয়া হইতেছেনা। আপন আপন সুবিধা ও রুচি অনুসারে কেহ শক্তি, কেহ শিব বা বিষ্ণু ভজনাই সার করিয়াছেন। কেহ কেহ গণপতি বা সূর্য্য ভজনা করিয়া থাকেন। তাহাদের অনেকেই অন্য দেবতার পূজা

করিতে প্রস্তুত নয়। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সকল আপনাদের সম্প্রদায়-নির্দ্দিষ্ট দেবতা ভজিয়াই পার পাইতে চাহেন। তদ্দ্বারা যে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, তাহা স্থির করার জন্য কোনরূপ শাস্ত্র বা যুক্তির সহিত সম্পর্ক রাখে না এবং পূজা করিতেও বেদাদি শাস্ত্র বা নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র বা প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন না। সর্ব্বত্রেই কেবল গোড়ামি করিয়া চলেন। এজন্য শাস্ত্রদৃষ্টিতে ঐ সকল পূজার্চ্চনা, ভোগ, রাগ প্রভৃতিকে নিস্ফল ক্রিয়া বলিতে হয়।

শিব, শক্তি, বিষ্ণু প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত দেবতাগণ আত্মজ্ঞান সম্পন্ন। ঐ সকল দেবতারা আপনাদের ব্রহ্মজ্ঞত্ব বিদিত থাকাতে তাঁহাদের উপলক্ষে "তুমি নির্গুণ নিরাকার বিশ্বরূপ" প্রভৃতি শব্দ স্তবাদিতে পাওয়া যায়। তাহাতেই উপাসক সম্প্রদায় তাঁহারা জীব কি পরম, ইহার কিছুই বুঝিতে পারেন না, কেবল ইচ্ছামত ডাকিলেই চলিবে মনে করিয়া থাকেন। অতএব বলিতেছি যদি ঐ সকল দেবতা পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে বেদ, স্মৃতি, (অগত্যা) পুরাণ শাস্ত্রের বিধিমতে অর্চ্চনা করিতে হইবে।

মধ্যযুগে নব্য সভ্যেরা দেবোপাসনার স্থলে একেশ্বর উপাসনার প্রচার করিতে যত্ন করাতে লোকগুলি অস্তিত্ববিহীন নিমিত্তকারণ ঈশ্বর ভজিতে ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। এখন আবার হিন্দু হওয়ার ফ্যাসন জারি হইয়াছে; তাহাতে শাস্ত্র, দেবতা, ঈশ্বর প্রভৃতির পরিবর্ত্তে মনুষ্য-পূজা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। মনুষ্য-পূজা প্রচলন হওয়া এখনকার দিনে কতকটা সহজ ব্যাপার। আমরা ব্রাহ্মণ, বেদস্মৃতি আমাদের দুইটী চক্ষুঃ। সেই শাস্ত্র-দৃষ্টিতে মনুষ্য আপনা হইতে গুণবান্ মনুষ্যের সম্মান করুক; আপত্তি নাই; কিন্তু যে যাহাকে ভাল বাসিবে বা ভক্তি করিবে, লোক সমাজে যে তাহার পূজা ও প্রচলিত করিতে হইবে, এমন কোন বিধান দেখা যায় না। তবে কোন মনুষ্যেরই যে পূজা হইতে পারে না, আমরা এমন বলিতেও প্রস্তুত নহি। শাস্ত্রে পাওয়া যায় ব্রহ্মজ্ঞদিগের সত্ত্বশুদ্ধি

হইয়া থাকে; তাঁহারা সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে যদি কোন কামনা করেন, তাহা হইলে জগতে ঐ সকল কাম্যবস্তু বা স্বর্গলোকাদি তাঁহাদের ভক্তদের ভোগের জন্য আগত হয়। এজন্য উন্নতি-কামিদিগের পক্ষে আত্মজ্ঞ পুরুষের অর্চ্চনা করিতে শাস্ত্রে বিধি দৃষ্ট হয়। অথর্ব্ববেদের মুণ্ডকোপনিষদে তৃতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ড সমাপ্তিতে পাওয়া যায়ঃ—

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈ র্দেবৈ স্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥ ৮
যংযং লোকং মনসা সংবিভার্তি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞংহ্যর্চ্চয়েদ্
ভূতিকামঃ॥ ১০

(অষ্টমশ্লোকে জ্ঞান প্রসাদে বিশুদ্ধ সত্ত্ব হওয়ার প্রসঙ্গ আছে।) বিশুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞানবান্ পুরুষ, মনে মনে ভক্তের জন্য যে যে লোক প্রাপ্তি হউক বলিয়া সঙ্কল্প করেন, ও যে যে ভোগ্য বিষয় সংঘটিত হউক বলিয়া কামনা করিয়া থাকেন, তদীয় ভক্ত সেই সেই লোকও কাম্যবস্তুসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এজন্য ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আত্মজ্ঞের পূজা করিবে। এবম্প্রকারে উপাসনাদ্বারা জ্ঞানী পুরুষের সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিলে, সেই আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ স্বতঃই পূজকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাতেই মঙ্গল এমন কি মুক্তিও লাভ হয়।

এই পুস্তকে ব্রহ্মচারিবাবা যে একজন আত্মজ্ঞপুরুষ ছিলেন, এই বিষয় প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। আমরা তাঁহাকে ব্রহ্মবিৎ বলিয়া জানিয়াছি। ব্রহ্মচারিবাবার পূজা করিয়া তদীয় ভক্তেরা যে অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন এবিষয় আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে। আমাদের সমক্ষে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিলেই তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা রোগমুক্তি প্রভৃতি লাভ ঘটিয়া থাকে।
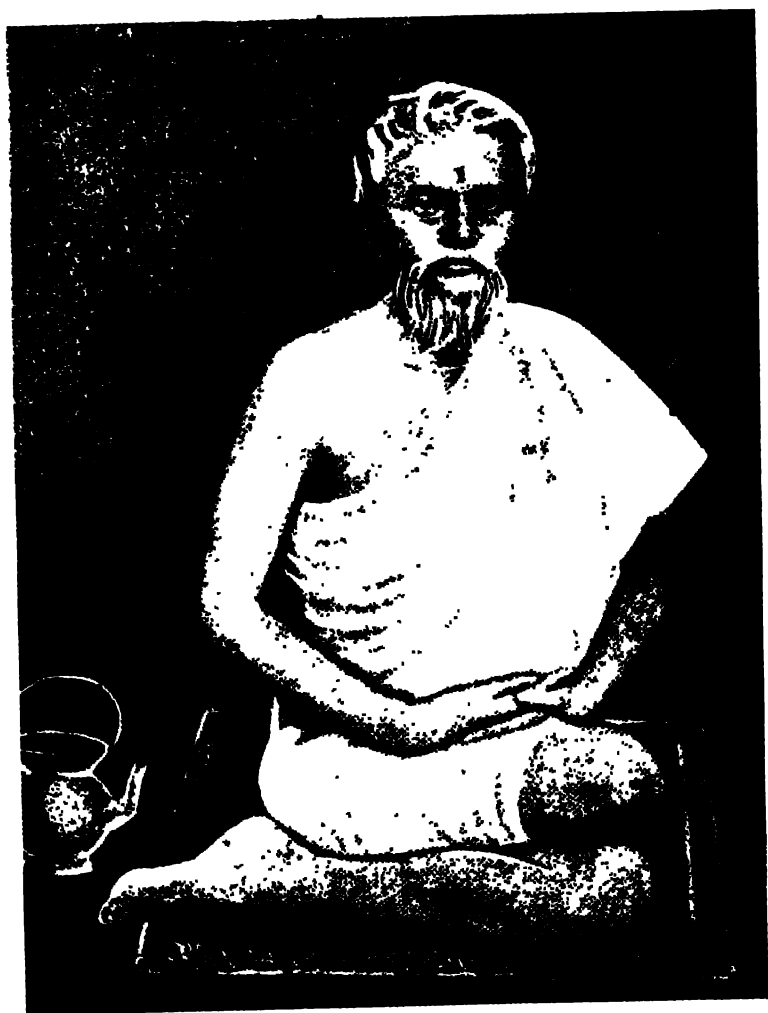
ব্রহ্মচারীবাবার শিষ্য
৺সুরথনাথ ব্রহ্মচারী

বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথব্রহ্মচারিতে যেমন ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; তেমনই ব্রহ্মজ্ঞের পূজাজনিত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ফল তাঁহা হইতে লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন অন্য মনুষ্য পাওয়া গেলে, তাঁহারও পূজা হওয়া শাস্ত্রসঙ্গত দেখান গেল। আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ ব্যতীত অপর মনুষ্যের পূজা মনুষ্যপূজামাত্র, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। এতদুপলক্ষে ব্রহ্মচারিবাবা তন্ত্রের এই শ্লোকটী শুনাইতেন :—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দ্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

শিষ্যের অর্থনাশকারী গুরু বহু পাওয়া যায় কিন্তু শিষ্যের ভব দুঃখ নাশক গুরু অতীব দুর্লভ।

ব্রহ্মজ্ঞ (আত্মজ্ঞ) গুরু ভিন্ন অন্য কোন গুরুই শিষ্যসন্তাপ হরণ করিতে পারেনা। মুক্তি ভিন্ন সন্তাপনাশ হয় না, সেই মুক্তি জ্ঞানসাপেক্ষ। জ্ঞানিগুরু ভিন্ন জ্ঞান দান করে কে? জ্ঞানী ব্রহ্মচারী ঐরূপে জ্ঞানের প্রাধান্য বুঝাইতেন। ব্রহ্মচারিবাবাকে পূজা করিয়া মনুষ্যগণের যে মনস্কাম সিদ্ধি হইত, সেই ভজন বা পূজনের বল, তাঁহার বিশুদ্ধ সত্বে (নির্ম্মলান্তঃকরণে) প্রবেশ করিয়া (উপরিবর্ণিত মুণ্ডক শ্রুতির বাক্যানুরূপ) ব্রহ্মচারীর অন্তরে ইচ্ছা, কামনা বা দয়া উৎপাদন করিত সুতরাং তদ্দ্বারা ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া যাইত। বিশেষ উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

বিক্রমপুর নিবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর তদীয় পত্নীকে লইয়া বারদীতে ব্রহ্মচারি-বাবার শরণাগত হইয়াছিলেন। তখন চন্দ্রকুমার বাবুর পত্নীর ব্যাধিবশতঃ আহার নিদ্রা ছিল না অধিকন্তু বাগ্‌রোধ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। চন্দ্রকুমার বাবু সপরিবারে আশ্রমের ঘাটে নৌকাতে থাকিতেন। বাবার কৃপায় কিয়দ্দিন পরেই রোগিনীর বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল। চন্দ্রকুমার বাবু বলিয়াছেন, "এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ

করার জন্য নৌকার ভিতরে ও বাহিরে প্রায় দুইশত লোক জমিয়া গিয়াছিল।" চন্দ্রকুমার বাবুর সহিত ঐ আরোগ্য লাভের পূর্ব্বে ব্রহ্মচারিবাবার এইরূপ কথা হইয়াছিল—

ব্রহ্মচারী আমি ব্রাহ্মণ হইয়াছি কিনা তাহা পরীক্ষা করার জন্য ৯৪ চৌরনব্বইটী মৃতপ্রায় রোগীকে কেবল বাক্যদ্বারা আরোগ্য করিয়াছি। এখন আর আমার সেই স্পৃহা নাই। তবে যদি কেহ আমার সেই ইচ্ছা করাইয়া নিতে পারে তবে এখনও আরোগ্য হয়।

চন্দ্রকুমার—ইচ্ছা করাইয়া নেয় কি প্রকারে ?

ব্রহ্মচারী—"ক্ষুন্নিবারণের জন্য দেহের যেরূপ প্রয়োজন বোধ, মলমূত্র ত্যাগ করিবার জন্য দেহের যেমন প্রয়োজন বোধ, ঠিক সেইরূপ প্রয়োজন বোধ যাহার আমার জন্য থাকে, সে'ই আমার ইচ্ছা জন্মাইয়া নিতে পারে।"

পাঠক এই পুস্তকে দেখিবেন, অন্য রোগীদের সম্বন্ধে ও এইভাবে ব্রহ্মচারীর অন্তরে কামনা উদ্রেক করাই রোগ মুক্তির হেতু বুঝা যায়। লোকনাথ জ্ঞানপ্রসাদে "বিশুদ্ধ সত্ত্ব", হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহা হইতে এমন ঘটনার সম্ভব হইয়াছে। বাবা লোকনাথ যদি ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন না হইয়া বাজে সিদ্ধির বলে লোকের রোগদূরীকরণ প্রভৃতি দ্বারা যশস্বী হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার পূজা হওয়ার ব্যবস্থা আমরা দিতে পারিতাম না। তিনি ব্রহ্মবিৎ ছিলেন বলিয়াই ব্রহ্মজ্ঞের পূজা করিয়া লোকে অভীষ্ট লাভ করুক, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার মত ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের পূজার সমর্থন করা হইল।

ব্রহ্মচারিবাবা! তুমি ব্রহ্মেতে বিচরণ করিয়া আনন্দ স্বরূপ হও; এজন্য তোমার নাম ব্রহ্মানন্দ। তোমার সেই আনন্দের মাত্রা হইতে জগতে যে কিছু পরম সুখ উৎপন্ন হইতেছে, এজন্য তুমি পরম সুখদ। তুমি যে "আমি একা থাকি" বলিতে, সেই একত্বই তোমার জ্ঞানমূর্ত্তি। তাহা সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বের অতীত এবং

ত্রিগুণ রহিত। সেই তুমি বাক্য. মনের অতীত হইলেও কেবল "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মাহাবাক্যের বিচারে লক্ষ্য হও।

হে গুরুদেব! এই উপায়েইগুরুতে ও আপনাতে অভেদ ধরা যায়। লোকনাথ! তুমি যদি তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বারদীতে না আসিতে, তাহা হইলে এখনকার শিক্ষিত সমাজ কি তোমার মত সিদ্ধিপ্রাপ্ত মাহাপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারিত? শাস্ত্রবাক্যসকল যে কবি-কল্পনা হইতে চলিয়াছিল, কিসে এই স্রোতের রোধ হইত? আমারই বা কি গতি হইত? অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আমার অভ্যন্তর হইতে পরলোক পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত পথ দেখিতেছি, এই পথ আমায় কে খুলিয়া দিত? এই সুষুম্নামার্গ সম্বন্ধে আমি অজ্ঞান তিমিরান্ধ ছিলাম, তুমি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা এই তৃতীয় চক্ষুকে উন্মিলিত করিয়া দিয়াছ। তাই বারংবার তোমায় নমস্কার।

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

সমাপ্ত

শ্রীশ্রী লোকনাথঃ জয়তী

শ্রীশ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্যের সাধন প্রণালী

শঙ্করের মতে নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানের গৌন সাধন ॥

নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামুত্র-ফলভোগ, বিরাগ, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব—ইহারা প্রধান সাধন ॥

ব্রহ্মবস্তুই নিত্য ও অন্যান্য সকলই অনিত্য—এই বোধই নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক ॥

ইহলৌকিক যাবতীয় ভোগ ও পারলৌকিক যাবতীয় ভোগে বিরক্তই ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ।

অন্তরিন্দ্রিয় মনের সংযমই-শম,-"স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্তা মনঃ শম উচ্যতে" ॥

জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়ের সংযমই-দম।

প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া, চিন্তা ও বিলাপ না করিয়া দুঃখ সহ্য করাই তিতিক্ষা ॥

কর্ম্ম হইতে উপরমই উপরতি—অথবা বিষয় হইতে নিগৃহীত মন পুনরায় বিষয়াভিমুখী হইলে তাহাকে প্রত্যাহৃত করাই উপরতি ॥

গুরু ও বেদান্ত বাক্যে প্রমারূপ আস্তিক্য বুদ্ধিই শ্রদ্ধা॥ এবং পরমগুরু পরমেশ্বরে একান্ত অনুরক্তিই সমাধান।

এই ছয়টি সাধন সম্পদ, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ, এবং তীব্র মমুক্ষত্ব না হইলে জ্ঞানের অধিকার জন্মে না।

জ্ঞানের মুখ্য সাধন এই চতুষ্টয় ॥ আসনাদি যোগের সাধন সম্বন্ধে যথাভিমত সুখাসনকেই প্রশস্ত বলিয়াছেন। যাহাতে একাগ্রতা জন্মে তাহাই করণীয়। আসীন ব্যক্তিরই ধ্যান উপাসনাদি সম্ভব। ৺শঙ্করের মতে রাজযোগে দেশকাল ও বায়ুরোধ প্রভৃতির আবশ্যক নাই। রাজযোগ বলিতে তিনি ব্রহ্মৈক্যকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃকস্থিতি, প্রাণসংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান প্রভৃতি রাজযোগের অঙ্গ।

৺শঙ্করের মতে ব্রহ্মরূপে স্থিতিই নিয়ম। তিনি বলেন সকলই 'ব্রহ্ম' ইহা জানিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত হইলে যাহা হয় তাহাই যম ॥ বিজাতীয় প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া সজাতীয় প্রবাহরূপে আনন্দস্রোত চলিলে তাহাই নিয়ম ॥

চিদাত্মার সাক্ষাৎকারে প্রপঞ্চত্যাগই ত্যাগ ॥

বাক্যমন যাহাকে না পাইয়া নিবর্ত্তিত হয় তাহাই মৌন। এই মৌনই সহজ। মৌনবাক্‌ হওয়া কেবল অল্পজ্ঞের লক্ষণ।

আদি-অন্ত-মধ্যে যে স্থানে জন বা লোক নাই, যাহার দ্বারা সকল পরিব্যাপ্ত তাহাই দেশ ॥

নিমেষে যিনি ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূতের কল্পনা করেন সেই অখণ্ডানন্দ অদ্বৈত ব্রহ্মই কাল ॥

যে অবস্থায় সুখে অজস্র ব্রহ্মচিন্তন হয় তাহাই আসন ॥

যিনি সর্ব্বভূত বস্তুর অধিষ্ঠান, যিনি নিত্যসিদ্ধ তাঁহাতে অবস্থানই সিদ্ধাসন ॥

যিনি সর্ব্বভূত গ্রামের মূল, যিনি চিত্তবন্ধনের মূল—তাঁহাতে স্থিরভাবে অবস্থানই মূলবন্ধ ॥

সমষ্য়ণ ব্রহ্মাতে লীন হওয়াই অঙ্গ সকলের সমতা ॥

নাসাগ্র দৃষ্টিই প্রকৃত, যৌগিক দৃষ্টি নহে। জ্ঞানময় দৃষ্টিতে সকলই ব্রহ্মময় সন্দর্শনই পরম উদার দৃষ্টি ॥

যে স্থানে দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্যের নিবৃত্তি হয় তাহাই দৃকস্থিতি।

চিত্তাদি সর্ব্বভাবকে ব্রহ্মরূপে ভাবনার যে সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ হয় তাহারই নাম "প্রণায়াম্"-প্রপঞ্চের নিষেধই রেচক প্রণায়ম্—"আমিই ব্রহ্ম" এই বৃত্তিই পূরক, ইহার ফলে যে বৃত্তির নিস্পন্দন হয় তাহাই কুম্ভক ॥

বিষয়সকল আত্মরূপে দর্শন করিয়া মন যখন চৈতন্যে নিমজ্জিত হয় তখনই প্রত্যাহার সাধিত হয় ॥

যেখানে যেখানে মনের গতি বা প্রচার সেই সেই স্থানেই ব্রহ্মদর্শনই ধারণা ॥

"ব্রহ্মই আমি"—এই জ্ঞানে যে নিরালম্বন স্থিতিলাভ হয় তাহাই ধ্যান ॥

নির্ব্বিকার ব্রহ্মরূপে অবস্থানে চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তিই সমাধি ॥